উ প ন্যা স

ধ্রুবচন্দ্রিমা

সূর্যনাথ ভট্টাচার্য

কথামুখ

কতকাল আগের কথা, তা রয়েছে গবেষকের পুঁথিতে। আর্যাবর্তের ইতিহাসে তখন এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে এক রাজবংশের উত্থানে। এই বংশের প্রথম পুরুষ শ্রীগুপ্ত ছিলেন মধ্যভারতের মানুষ। সামান্য যুদ্ধজীবী থেকে রাজা হয়েছিলেন তিনি। উজ্জয়িনী নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর রাজধানী। তিনি প্রগতিশীল উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, আপন নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। তাঁর পুত্র ঘটোৎকোচগুপ্ত ও তস্য পুত্র চন্দ্রগুপ্তের হাতে সে সাম্রাজ্য শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির এক অনন্য উচ্চতা লাভ করেছিল।

গুপ্তরাজত্বকালের সেই শুরুর দিকের কোনও সময়। আলোকবৃত্তের মাঝে দেখা যাচ্ছে একটা লোক ধীরে চলেছে অশ্বেতরের পিঠে। দেখে মনে হয় মানুষটি কঠিন অসুস্থ। কোনক্রমে বাহনের কণ্ঠবেষ্টন করে পথ চলেছে। মাঝে মাঝেই তার দুর্বল হাত থেকে বল্গা স্খলিত হচ্ছে, অতি আয়াসে কোনমতে যেন ধীরগতি বাহনটির উপর নিজেকে সে সংলগ্ন করে রেখেছে। সংঘর্ষ দেখে বোঝাই যাচ্ছে আর তার দেহে শক্তি নেই। জীবনপ্রদীপের ইন্ধনও বুঝি সমাপ্তপ্রায়। অন্তিম প্রাণশক্তিটুকু দ্বারা অতি কষ্টে শ্বাস-প্রশ্বাস চলছিল বটে কিন্তু সন্দেহ হয় সংজ্ঞালোপ হতে বিশেষ বিলম্ব নেই, যে কোনও মুহূর্তে আসতে পারে পতন ও মৃত্যু।

গ্রামের অপেক্ষাকৃত জনসঙ্কুল অঞ্চলে প্রবেশ করলে তার প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। উপস্থিত বেশ কিছু উৎসাহী জনতা তার কাছে এগিয়ে গেল সাহায্যের জন্য। লোকটির বোধহয় এইটুকুরই অপেক্ষা ছিল। সংজ্ঞাহীন হয়ে এবার সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

সংজ্ঞাহীন হলেও সে জীবিত ছিল। অনেকে তাকে ধরে ফেলায় সে সরাসরি ভূমিষ্ঠ হল না। প্রথমটা কেউই তাকে চিনতে পারেনি। অবশেষে এক বর্ষীয়ান ব্যক্তি বিস্ময় ব্যক্ত করল—আরে, এ তো দেখছি আমাদের কুণ্ডক!

কুণ্ডকের কথা প্রায় সকলেই বিস্মৃত হয়েছিল। বহুকাল আগে সে গ্রাম থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। সেকালে নানা কারণে মানুষ দেশত্যাগ করে চলে যেতো। উন্নত জীবনের সন্ধানে, জীবিকার প্রয়োজনে, অপরাধ করে দণ্ড এড়াতে কিংবা নির্বাসিত হয়ে। কুণ্ডক কেন গিয়েছিল তা আর কারওর মনে নেই। সে এই গ্রাম থেকে অদৃশ্য হয়েছিল বছর পঁচিশ আগে। তারপর আর তার কোনও সংবাদ পাওয়া যায়নি, এমনকি মৃত্যুসংবাদও নয়। তার আত্মীয়স্বজন কিছুকাল উদ্বিগ্ন অনুসন্ধান করেছিল। কয়েকবছরের মধ্যে নিরুদ্দিষ্ট কুণ্ডককে লোকে ভুলে যায়।

অশ্বারূঢ় অগন্তুককে দেখে অনেকেই স্বীকার করল, এ কুণ্ডকই বটে। কারুর নিরুদ্দেশ হওয়ার চেয়ে বহুকাল পরে তার পুনরাবির্ভাবের সংবাদ সাধারণত বেশি চাঞ্চল্যকর। সকলেরই দারুণ উৎকণ্ঠিত কৌতূহল। কোথায় ছিল সে, কী করছিল, এতদিন পরে স্বগ্রামের কথা কি করে মনে এল? সকলে এ ওর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। কারও কাছে সেসব প্রশ্নের উত্তর নেই।

কুণ্ডক ত্রিশ বছর বয়সে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। তার নিজের সংসার ছিল না, উপপত্নী ছিল কিনা কেউ জানে না। পরিবারবর্গে তার প্রজন্মের আর কেউ তখন জীবিতও নেই। অবশেষে দূর-সম্পর্কিত এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাকে গৃহে নিয়ে গেল।

কিছু শুশ্রূষার পরে কুণ্ডকের চৈতন্যোদয় হল। হয়তো পুরাতন কিছু পরিচিতকে সে চিনতেও পারলো। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। বরং চক্ষু বিস্ফারিত করে কি যেন বর্ণনা করার চেষ্টায় সে এতো উত্তেজিত হয়ে পড়লো যে অচিরেই আবার মূর্ছিত হয়ে গেল।

সংজ্ঞাহীন হবার আগে তার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল, দৃষ্টিতে দারুণ আতঙ্ক। বুঝি বা সাংঘাতিক কোনও অভিজ্ঞতার কথা সে বলতে চেয়েছিল।

ভেষজবিদ পরীক্ষা করে নিদান দিলেন, কুণ্ডকের স্বরযন্ত্র বিকল। মস্তিষ্কেও গভীর আঘাতের লক্ষণ বিদ্যমান। হয়তো সে উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। অবস্থা অতি সংকটজনক, সূর্যালোক সেবনে অবস্থার কিছু উন্নতি হতে পারে বলে তিনি বিধান দিলেন। তবে তাতে যে খুব সুরাহা হবে এমন আশ্বাস পাওয়া গেল না।

কিন্তু কুণ্ডকের জীবনে সূর্যোদয় আর হল না। রাতের দিকে তার আরও একবার সংজ্ঞা ফিরে এসেছিল। তখন সে অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়েই ছিল। একবার নিজের কণ্ঠের দিকে ইঙ্গিত করে জড়িত ক্ষীণস্বরে কিছু উচ্চারণ করবার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই বোধগম্য হল না। তারপর সে দুর্বল হাতে পরিধানের কোমরবন্ধে রাখা দুটি গোলাকৃতি বস্তু বার করে ভ্রাতুষ্পুত্রকে দিল। দেখা গেল তা মহারাজ শ্রীগুপ্তের প্রচলিত মহার্ঘ স্বর্ণমুদ্রা! বড় ব্যবসায়ী অথবা উচ্চপদ রাজপুরুষ ব্যতীত সাধারণের এ মুদ্রা ব্যবহারের প্রয়োজন হোতো না। কুণ্ডক এ বস্তু কোথায় পেল?

সে কথা জিজ্ঞেস করতেই পুনরায় সে ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়ল। বারংবার নিজের কণ্ঠদেশ নির্দেশ করে কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু কিছুই বলা হল না। কুণ্ডকের দুর্বল স্নায়ুতন্ত্রের সহনসীমা বোধহয় অতিক্রান্ত হয়েছিল। তার হৃদযন্ত্র স্তব্ধ হল।

স্বর্ণমুদ্রার রহস্যভেদ হল না। কুণ্ডকের মতো এক অকিঞ্চিৎকর মানুষের কথা মহাকালের গর্ভে অচিরেই হারিয়ে গেল। মুদ্রা দুটি রয়ে গেল তাদের পরিবারের এক রাজকীয় উত্তরাধিকার হয়ে।

তারপর অতিক্রান্ত হয়ে গেল একটা শতাব্দী। —

॥ ১ ॥

সমুদ্রগুপ্ত প্রয়াত হলেন। আর্যাবর্তের এক গরিমাময় অধ্যায় ইতিহাস হয়ে গেল। এ জগতে আলো আর অন্ধকার আবর্তিত হয় ক্রমান্বয়ে। গুপ্তরাজবংশের সবচেয়ে তমসাচ্ছন্ন একটি বছর আসে মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের অত্যুজ্জ্বল জীবনালোক নির্বাপিত হবার অব্যবহিত পরেই।

সমুদ্রগুপ্তের শাসনে রাজ্যে অখণ্ড শান্তি স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু তা চিরস্থায়ী হয়নি। মহানায়ক প্রয়াত হওয়ার অব্যবহিত পরেই দেশ অশান্ত হল। শত্রু সময়ের প্রতীক্ষা করছিল। বিঘ্নশক্তি মাথা তুলতে বিলম্ব করেনি। কিন্তু প্রয়াত মহারাজের প্রভাবে রাজ্যের সুরক্ষাব্যবস্থা ও সামরিক প্রতিরক্ষাপ্রণালী এতো দুর্বল ছিল না, যে ম্লেচ্ছশক্তির পরাক্রমে শীঘ্রই তা বিপর্যস্ত হবে। আসল সমস্যা ছিল অন্যত্র।

সমস্যা হল শকারির জ্যেষ্ঠপুত্র রামগুপ্ত। সিংহাসনের নৈসর্গিক উত্তরাধিকারী। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে ক্রমশ প্রকট হতে থাকে কুমারের উচ্ছৃঙ্খলতা, সুরাসক্তি ও হঠকারিতা। অস্ত্রবিদ্যায় যুবরাজ রামগুপ্ত নিপুণতালাভ করেননি আলস্য ও অনভ্যাসে। কূটনীতিজ্ঞের ধৈর্য ও মেধাও তাঁর নেই। ভাবী রাষ্ট্রনায়করূপে জ্যেষ্ঠপুত্রকে কল্পনা করে হতাশ হতেন সমুদ্রগুপ্ত।

মহারাজ আশাহত হয়ে স্বপ্ন দেখতেন কনিষ্ঠপুত্র চন্দ্রগুপ্তকে ঘিরে। কিন্তু আজীবন সংগ্রামরত সমুদ্রগুপ্ত তাঁর জীবদ্দশায় সমর্থ হননি রাজ্যের উত্তরাধিকারের যথার্থ বণ্টনে।

সম্রাটের জীবনের শেষভাগে বিশাল সাম্রাজ্যের কিছু কিছু প্রান্তে বিজাতীয় শত্রু পুনরায় শক্তিসংগ্রহ করতে থাকে। উজ্জয়িনীর সীমান্তে উপদ্রবের শুরু হয়েছিল এক অতি তুচ্ছ বিবাদ নিয়ে।

রাজধানীর সীমার পরেই কালানের দুর্গ। কালিঙ্গড়। সেই দুর্গ পেরিয়ে পার্বত্য বনভূমিতে মধু সংগ্রহে গিয়েছিল মধুমোক্ষকের একটি দল। কিছু অনার্য সৈনিক তাদের বাধা দিয়ে জানায়, সে এলাকা এক শক সত্রাপের অধীন। সেখানকার বনসম্পদ কেউ অন্যত্র নিয়ে যেতে পারবে না।

এলাকাটি পার্বত্য, নাগরিক জনপদের অনুপযুক্ত। তাই সংশ্লিষ্ট রাজপুরুষদের দৃষ্টিবহির্ভূতই ছিল। মধুমোক্ষকেরা বিতাড়িত হয়ে কালানের জয়স্কন্ধাবারে অভিযোগ না করলে কেউ জানতেই পারত না এই নিঃশব্দ অধিগ্রহণের সংবাদ। এরপর একদল সেনাচর পাঠানো হয় ঐ অঞ্চলের অধিকার নিতে। ধরে নেওয়া হয়েছিল অনার্য আদিবাসীদের সহজেই দূর করে দেওয়া যাবে।

কার্যক্ষেত্রে তা হল না। একটা ছোটখাটো সংগ্রামই হয়ে গেল। সৈন্য হতাহতও হল। বন্য প্রজাতির অশিক্ষিত শক বলে যাদের মনে করা হয়েছিল, দেখা গেল তারা আদৌ দুর্বল নয়। রীতিমত প্রশিক্ষিত অস্ত্রচালনায় তারা নিজেদের ভালরকম রক্ষা করতে সক্ষম। প্রয়োজনে তারা শক্তিমান প্রতিপক্ষেরও উদ্বেগের কারণ হতে পারে। অপ্রত্যাশিত খণ্ডযুদ্ধে সম্রাটের সৈন্যদল পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে আসে।

এরপর তো আর নীরব থাকা চলে না। সম্রাটের পক্ষ থেকে বড় সেনাদল গিয়ে আঘাত হানে। সে আঘাতও প্রতিহত হয়। শকেরা যে ইতিমধ্যে এতটাই সংগঠিত হয়েছিল, তা বোঝা যায়নি। তারপর আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ চলতেই থাকে এবং শীঘ্রই অবস্থা আয়ত্তের অতীত হয়। তুচ্ছ ভূমিদখলের লড়াই বলে যা মনে হয়েছিল, অনাবশ্যকভাবে তা পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের আকার নেয় অচিরেই।

বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল সমুদ্রগুপ্তের জীবৎকালেই। রণক্লান্ত সম্রাটের শরীর তখনবিশ্রাম চাইছিল। তিনি অবসর নিয়ে জ্যেষ্ঠপুত্রকে করেছিলেন দ্বিতীয় রাজধানী উজ্জয়িনীর শাসক। হয়তো কিছুটা অনিচ্ছাতেই। স্বাধীনভাবে রাজ্যের কর্তৃত্ব যুবরাজকে উদ্বুদ্ধ করবে—এ দুরাশাও বোধহয় ছিল। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

মূলত এই বিদ্রোহ দমনেই জ্যেষ্ঠকুমার মালবে প্রেরিত হয়েছিলেন। সুন্দরী পত্নী ধ্রুবাদেবী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রগুপ্ত সমভিব্যাহারে রামগুপ্ত পাটলিপুত্র ত্যাগ করে মালব প্রদেশের উজ্জয়িনীতে আসেন। রাজধানীর নিকটস্থ কালান দুর্গের জয়স্কন্ধাবারকে কেন্দ্র করে রামগুপ্ত শকের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের জীবদ্দশায় এ যুদ্ধের নিষ্পত্তি হয়নি। জ্যেষ্ঠকুমারের বিচার-বৈদগ্ধ ও যুদ্ধসাফল্যের সংবাদ পাটলিপুত্রে যা এসে পৌঁছত, তাতে উৎসাহব্যঞ্জক বিশেষ কিছু থাকত না। ক্রমশই মহারাজের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে। অবশেষে এল মহাগুরু নিপাতের ক্ষণ। রামগুপ্ত নেতৃত্বগ্রহণের তিন মাসের মধ্যে, রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একরাশ নিরাশা নিয়েই সমুদ্রগুপ্ত প্রয়াত হলেন।

হূণকেশরী অস্তমিত। কিন্তু মহাকালচক্রের আবর্তন থেমে থাকেনি। শত্রুদমনে যিনি শর্তহীন, যাঁর নামেই হূণেদের মনে সৃষ্টি হত আতঙ্ক, সেই গুপ্তকুলতিলক সমুদ্রগুপ্তের প্রস্থানের অল্প পরেই রাজ্যের নানা প্রান্তে শুরু হয় প্রবল অরাজকতা। লোকান্তরিত সম্রাটের রাজসিংহাসনে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রামগুপ্ত অভিষিক্ত হলেন। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনিও শত্রুদমনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু পিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সমর্থ হননি। প্রদীপের নীচেই থাকে অন্ধকার!

রামগুপ্তের উচ্চাশা ছিল মাত্রাতিরিক্ত ও যশাকাঙ্ক্ষা, অপর্যাপ্ত। পরিতাপের বিষয়, যা তাঁর সামর্থ্যের অনুরূপ ছিল না। তদপেক্ষাও বিপদজনক ছিল তাঁর প্রমাদ, অহমিকায় আচ্ছন্ন হয়ে আপন পরাক্রমের হীনতাকে অস্বীকার করা। স্বার্থবুদ্ধিতে দেশ ও দশের হিত দেখতে পাননি, একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি নিজের অমঙ্গলের পথ প্রশস্ত করেছিলেন।

কালিঙ্গড়ের প্রান্তে যুদ্ধ ছয় মাস পরেও অব্যাহত। সম্রাট রামগুপ্তের প্রতিভূ হয়ে সে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর চন্দ্রগুপ্ত।

এই হল কাহিনীর পটভূমিকা।

সেদিন গোধূলির শেষে অস্তাচলগামী সূর্য দিগন্তের পারে অদৃশ্য হয়েছিল। কিন্তু আগতপ্রায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে পশ্চিমাকাশের অরুণাভা তখনও সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। ইতিমধ্যেই অন্যপ্রান্তের নভোনীলে শুক্লা ত্রয়োদশীর চন্দ্রোদয় হয়েছে। প্রাসাদ সংলগ্ন বীথিকার সরোবরে তার প্রতিবিম্ব অল্প অল্প হিন্দোলিত হচ্ছে। দ্বিতলের অলিন্দে নিশ্চল হয়ে তা নিরীক্ষণ করছেন রূপমতী রানি ধ্রুবাদেবী।

আকাশে নবোত্থিত চন্দ্রালোকের ম্লান আভায় তখনও আসেনি জ্যোৎস্নার প্লাবন। রানির অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডলেও যেন বিষাদের ছায়া।

তিনি অপলকে জলের দিকে চেয়ে ছিলেন বটে, কিন্তু তা আন্দোলিত চন্দ্রমার প্রতিবিম্বে মুগ্ধ হয়ে নয়। গরিমাময় রাজবংশের বরবর্ণিনী রাজমহিষী, বর্তমান আর্যাবর্তের একছত্র অধীশ্বরী ও মগধের খ্যাতকীর্তি মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের পুত্রবধূর মনে আজ সুখ নেই।

রমণীর মনের গহনে কি কথা লুকিয়ে থাকে, তা কেউ জানে না। কিন্তু অকিঞ্চিৎকর প্রাকৃতিক ঘটনায় মগধেশ্বরীর বিচলিত হওয়া কি শোভা পায়? তাঁর মনোবেদনারকারণ হয়তো অন্য।

স্কন্ধে কারওর করস্পর্শে সচকিত হয়ে ধ্রুবাদেবী দেখেন মহারাজ রামগুপ্ত এসেছেন। সুমিষ্টস্বরে মহারাজ বললেন, এমন চাঁদনি তিথিতে তুমি বিষণ্ণ কেন রানি?

উত্তরীয়টি মাথার উপর একটু টেনে নিলেন ধ্রুবাদেবী। মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, যুদ্ধের কথা মনে পড়লে মন বড় উতলা হয়, আর্য।

—আশ্চর্য, তুমি রমণী হয়ে যুদ্ধের দুশ্চিন্তায় উতলা হচ্ছ? যুদ্ধের ফলে মহাদেবীর প্রমোদে কোনও বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে কি?

মহারানি সচকিত হলেন। একটু আহতস্বরে বললেন, আমোদপ্রমোদই কি মহারানির একমাত্র কাজ? প্রজাদের হিতচিন্তা করার কি কোনও অধিকার আমার নেই?

—এই কাজের যোগ্যতর ব্যক্তিটি কিন্তু তোমার সম্মুখেই উপস্থিত দেবি। আশা রাখি, তুমি তার উপর এখনও ভরসা হারাওনি। সুতরাং এই নিয়ে তোমাকে আমি অসুখী দেখতে চাই না। এসো ছাদে যাই।

মহারাজ সোপানশ্রেণীর দিকে অগ্রসর হলেন, রানি অনিচ্ছাসত্বেও তাঁর অনুবর্তী হলেন। এই সময়ে অলিন্দের আলো আঁধারিতে মহারাজ রামগুপ্তের মুখের ভাব স্পষ্ট দেখা গেল না। গেলে তাঁকে ঠিক প্রণয়াতুর বলে হয়তো মনে হত না।

অতিতুচ্ছ নামগোত্রহীন এক শকনায়কের সঙ্গে মগধরাজের যুদ্ধ চলেছে আজ ছয় মাস অতিক্রান্তপ্রায়। রানি ধ্রুবাদেবীর মন তাই পড়ে আছে বারো যোজন দূরে সেই কালিঙ্গড়ের যুদ্ধক্ষেত্রে। যেখানে মগধের এক বীর রাজকুমার জীবনপণ করে এখনও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। দাসদাসীপূর্ণ মহার্ঘ রাজপুরীতেও তাই সম্রাজ্ঞীর একমাত্র সম্বল তাঁর নিঃসঙ্গ একাকিত্ব।

ছাদে এসে দুজনেই দিগন্তের পানে চাইলেন, বহুদূরে যেদিকে যুদ্ধ চলছে। ক্ষণিক পরে মহারাজ বললেন, যুদ্ধ বহু দূরে দেবি। তুমি বরং একটা গান শোনাও।

মহারাজের সঙ্গীতপ্রীতি খুব সুপরিচিত নয়। ইতিপূর্বে মহারানির সঙ্গীত বা কাব্যচর্চা কখনই মহারাজের প্রসন্নতার প্রসাদ লাভ করেনি। ব্যথিতস্বরে ধ্রুবাদেবী বললেন, আমায় মার্জনা করুন মহারাজ, সুর এখন আমার গলায় আসবে না।

—বটে? আমি তো জানতাম তুমি সঙ্গীতপ্রিয়? তোমার বিষাদের কারণ আমাকে খুলে বলবে কি?

মহারানি আনতনয়নে নিরুত্তর রইলেন। মহারাজ মধুরবচনে আরও কয়েকবার মহারানির শিল্পীসত্তাকে জাগ্রত করার প্রয়াস করলেন। সে প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ায় ক্রমশ তাঁর কণ্ঠস্বরে আগ্রহের অভিব্যক্তি শীতল হয়ে এলো।

—তোমার মৌনতা আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে রানি। তুমি কি মনে কর তোমার অসংলগ্ন আচরণ আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে?

মহারানি তাঁর সশঙ্ক চক্ষু তুলে চাইলেন। সংবদ্ধ অধরোষ্ঠে মনের মাঝে উত্থিত দুর্বিনীত আবেগকে বশে আনতে চাইলেন। অতঃপর মহারাজ যখন কথা বললেন, তাঁর কণ্ঠস্বরের কোমলতা অদৃশ্য হয়েছে। রূঢ় কর্কশতায় তিনি বলে উঠলেন, যার বিরহে তুমি আজ তোমার স্বামীকে অবজ্ঞা কর, তার কী গতি হবে জান না হয়তো। জানবে সে উৎসন্নে যাবে। কালগ্রাসে নাশ হবে সে। অতিশীঘ্র তার স্থান হবে যমালয়ে।

মহারানি সভয়ে দুই কানে হাত চাপা দিলেন। এমন কথা শুনলেও যে অনর্থ!

মহারাজের কণ্ঠে তখন ঝরে পড়ছে গরলভরা বাক্যের অগ্ন্যুৎপাত, পাপিষ্ঠা তুমি, তাই কোন কুলকে আজ কলঙ্কিত করবার স্পর্ধা দেখাচ্ছ জান না। শুনে রাখো, দিগ্বিজয়ী পিতামহের পৌত্র আমি, মহাবীর সমুদ্রগুপ্ত আমার পিতা। এই সুমহান বংশে কালিমালেপন করে তুমি কি পার পাবে মনে করো? নরকেও তোমার গতি হবে না। নীচ রমণী, তোমার ঐ পাপমুখ দর্শনেও মহাপাপ। নিপাত যাও, তুমি নিপাত যাও—।

নীচ রমণী, নষ্টা, কুলটা, এধরনের অশিষ্ট সম্বোধনে অভ্যস্থ ছিলেন না লিচ্ছবিদুহিতা ধ্রুবা। গুপ্তকুলবধূ হয়ে এসে আজ তাঁর এই বিড়ম্বনা। যদিও ধীমতী সুশীলা ধ্রুবাদেবীর জন্য এসব বিশেষণ আদৌ উপযুক্ত নয়। বংশকৌলীন্যের মর্যাদা তাঁর পিতৃকুলেও কিছু কম নয়। লিচ্ছবিদের সহায়তাতেই গুপ্তবংশের প্রাণপুরুষ মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যলাভ। এ ভাগ্যের পরিহাস ব্যতীত আর কিছু নয়, বিবাহসূত্রে ধ্রুবাদেবী এমন এক গুপ্তনৃপতির মহিষী হয়েছিলেন, যাঁর আপন রাজবংশের দম্ভটুকু মাত্র ছিল। কিন্তু ছিল না তার শালীনতারক্ষার দায়বদ্ধতা।

সমুদ্রগুপ্ত প্রয়াত হলে নৈসর্গিক উত্তরাধিকারবলে রামগুপ্ত রাজা হয়েছিলেন বটে কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বে রাজসিক গরিমার অভাব ছিল। সহধর্মিণীর প্রেম অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি। বঞ্চিত হয়েছেন সন্তানসুখে। অপরদিকে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন আদর্শ ক্ষত্রিয়, অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ, মেধা ও চরিত্রে যশস্বী, শৌর্যে মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের যোগ্য উত্তরসুরি। ফলে রামগুপ্তের প্রশাসনিক অদূরদৃষ্টি ও রাজনৈতিক অশিষ্টাচারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল হীনমন্যতা। এমতাবস্থায় তাঁর আচরণে ভারসাম্যের অভাব ঘটেছিল। নিজের সামর্থ্যের ন্যূনতা তিনি গোপন করতেন স্বভাবের রুক্ষতায়। ধর্মপত্নীরূপে ধ্রুবাদেবী সহজেই তার শিকার হয়েছিলেন।

বিকৃত ভাষায় আরও কিছুক্ষণ যাবত অন্তরের উষ্মা প্রকাশ করে মহারাজ সবেগে প্রস্থান করলেন। জানিয়ে গেলেন, অনাচার তিনি আর সহ্য করবেন না। উচিত দণ্ডের জন্য মহারানি প্রস্তুত হোন। মহারানির অন্তর্লোকে যে তুমুল ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ হয়েছিল, তা মুক্তোর মতো দু'ফোঁটা অশ্রুর আকারে তাঁর আয়তচক্ষু থেকে ঝরে পড়ল।

এই ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন একটি দিনের কথা নয়। মহারাজ ও তাঁর মহিষী মানসিক ভাবে আজ এতোটাই দূরত্বে বিরাজ করছেন, তাঁদের সম্পর্কের সকল সরসতা যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। মাঝেমধ্যেই অগ্নিগর্ভ বারুদে বিস্ফোরণ ঘটতে নিমিত্তের অভাব হয় না।

কিন্তু আজ মহারাজের কঠোর বাক্যে কি যেন এক অশুভ বার্তা ছিল। যা এর আগে অনেক রুক্ষতায়ও কোনদিন দেখা যায়নি। এক আজানা আশঙ্কায় ধ্রুবাদেবীর বুক দুরুদুরু করে উঠল।

ছায়ার মতো নিঃশব্দে একটি রমণীমূর্তি এসে মহারানির হাতে হাত রাখল। ধ্রুবাদেবী চমকিত হয়ে দেখলেন, রঙ্গিণী। মহারানির প্রধানা পরিচারিকা, কিন্তু এই নিঃসঙ্গ রাজপুরীতে তাঁর অন্তরঙ্গতম সখিও বটে। সে যে কখন অলক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে কারওর দৃষ্টিগোচর হয়নি। সবকথা না শুনলেও সত্য অনুমান করে নেওয়ার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিমতী সে। দেখা গেল রঙ্গিণীর চক্ষুও ছলছল করছে।

মহারানি নিজের সুখদুঃখের সব কথাই রঙ্গিণীর কাছে অকপটে বলে থাকেন। কেবল মহারাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের যে অবনতি ঘটেছিল সেই একান্ত পারিবারিক দুর্ভাগ্যটুকু তিনি কোনমতে সখীর অগোচরে রেখেছিলেন। আজ তাও আর গোপন রইল না। একদিকে সযত্নে রক্ষিত বেদনার প্রসঙ্গটি প্রিয়সখীর নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ার লজ্জা ও অপরদিকে নিরুপায় অসহায়তার মাঝে একমাত্র অবলম্বনের আশ্বাস, এই দুই দ্বন্দ্বের মাঝে মহারানির সুকুমার হৃদয় আর বাধা মানল না। রঙ্গিণীর স্কন্ধে মাথা রেখে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন তিনি।

দাসী তখন অগ্রজার ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। অশ্রু মুছিয়ে রানিকে সান্ত্বনা দিল রঙ্গিণী, কেঁদো না রানি। আমি তো আছি, আমাকে বলো সব কথা। দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর দুই সখির অনেক কথা হল। মৌননিথর আকাশে চন্দ্রমা ও নক্ষত্ররাশিও বোধহয় উৎকর্ণ হয়ে শুনেছিল সেই কথা। কথোপকথন মূলত একমুখী। রানি তাঁর মর্মস্থল উদ্ঘাটন করে বললেন সেই সব কথা যা রঙ্গিণী আগে কখনও শোনেনি, নারীহৃদয়ের সহানুভূতি দিয়ে কিছু অনুভব করেছিল মাত্র।

আলাপনে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এমন সময়ে কিঙ্করী এসে এক

পত্র দিয়ে জানালো, মহারানির জন্য মহারাজের বার্তা আছে।

মহারাজের লিখিত বার্তা? এই অসময়ে!

পত্র খুলে মহারানি বার্তা পাঠ করলেন। তারপর স্তব্ধ হয়ে সরোবরের দিকে নির্বাক হয়ে বহুক্ষণ চেয়ে রইলেন। রঙ্গিণী কিছুই বুঝতে না পেরে বলল, কি সংবাদ গো রানি?

রানি নিরুত্তর। রঙ্গিণী আরও বারকয়েক প্রশ্ন করেও কোন উত্তর পেল না। তারপর অকস্মাৎই শুনতে পেল মহারানি শূন্যদৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে বলছেন, আমায় একটু বিষ এনে দিতে পারিস, রঙ্গিণী?

পত্রখানি মহারানির স্খলিত হাত থেকে নীচে পড়ে গেল। তিনিও মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন, রঙ্গিণী তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে নিল। কিঙ্করীদের সাহায্যে ত্বরিতে তাঁকে এনে শয্যায় শোয়ানো হল। মূর্ছা খুব কঠিন ছিল না, অল্প শুশ্রূষাতেই রানি চোখ মেললেন। কিন্তু আর কোন বাঙনিষ্পত্তি করলেন না। নিরুপায় হয়ে রঙ্গিণী রাজবৈদ্যকে সংবাদ পাঠাল। মহারাজের মহলেও সংবাদ গেল।

রাজবৈদ্য প্রভাকর মিশ্র অচিরেই এসে যাবতীয় লক্ষণ পরীক্ষা করে কিছু বলবর্ধক ওষধি প্রয়োগ করলেন। কিন্তু কেন এমন হল, কি ছিল সেই বার্তায় তা জানা গেল না। সে পত্র মহারানি কোথাও লুকিয়ে নিয়েছেন।

বারংবার অনুরুদ্ধ হয়ে অবশেষে মহারানি কথা বললেন। অনুচ্চ কিন্তু স্পষ্ট স্বর, আমার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই। আর মহারাজের বার্তা গোপনীয়, সেও আপনারা জানতে চাইবেন না। কিন্তু রাজবৈদ্য, আপনার সহায়তা আমার চাই।

রাজবৈদ্য প্রভাকর মিশ্র বয়সে প্রবীণ, মহারানিকে কন্যাসম স্নেহ করেন। শশব্যস্ত হয়ে বললেন, সেকি? তুমি আদেশ করো রানিমা। যেমন বলবে তাই হবে।

মহারানি রঙ্গিণীকে ইঙ্গিত করে কক্ষের বাইরে যেতে নির্দেশ দিলেন। সে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে বাইরে এলো। এটুকু বুঝতে অসুবিধে নেই, রানিকে কোন শক্ত আঘাত দিয়েছেন মহারাজ। রঙ্গিণী এখন জানে রাজা-রানির দাম্পত্যের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। দু'জনার পৃথক মহলে অশন-বসন। কদাচিৎ সাক্ষাৎ, তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। আজ কি সেই তিক্ততা মাত্রা ছাড়াল?

কক্ষের বাইরেই চমূকে পাওয়া গেল। কিম্পুরুষ চমূ অঙ্গরক্ষক, প্রাসাদের সর্বত্রই তার অবাধ গতি। মহারানির কুশলপ্রশ্ন করল চমূ। রঙ্গিণী শুধাল, মহারাজ আসবেন না? তুই গিয়েছিলি সেখানে?

—ওরে ব্বাবা, তিনি এখন আসতে পারবেন না, চমূ হাত নেড়ে অঙ্গভঙ্গি করে বলে, মহামাত্যের সঙ্গে মন্ত্রণা চলছে। সেখানে তো শুনে এলাম, খুব বচসা হচ্ছে গো!

—কি শুনলি বল দেখি?

—কথা কি আর শুনতে পাই? রাজামশাই খুব জোরে জোরে বিশঙ্কঠাকুরকে কিছু বলছেন, বন্ধ দরজার বাইরে থেকে যা বুঝলাম।— তা তুমি এখানে ঘরের বাইরে কেন গো?

—তোর তাতে কি রে? রানিমার অসুখ জানিস না? বদ্যিরাজ চিকিৎসা করছেন। তুই এখন যা দিকিনি।

রঙ্গিণী ধমক দিয়ে চমূকে বিদায় করল। যাবার আগে সে বলে গেল, আমি আবার কাল এসে রানিমার সংবাদ নিয়ে যাবো।

মহারাজ রামগুপ্তকে কৃচিৎ দেখতে পায় রঙ্গিণী। আজ তাঁর মুখমণ্ডল দেখে ভয় পেয়েছে সে। মহারানির সম্মুখে কোন ঘোর বিপদ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু উপায় কি?

বৈদ্যরাজ বিদায় নিতেই কক্ষে প্রবেশ করে রঙ্গিণী দেখে রানিমা যেন অনেকটা সুস্থ। রঙ্গিণীকে দেখে তিনি বললেন, যা যা দেখলি বা শুনলি স—ব গোপন রাখবি, বুঝলি? আর শোন, কিচ্ছু এখন আর জানতে চাস না। তোরা বরং এখন যা, আমাকে একটু একলা থাকতে দে। আমি এখন সেলাই করব, যাবার আগে আমাকে সীবন দ্রব্য সব দিয়ে যাস।

উদ্বিগ্ন হয়ে রঙ্গিণী বলে, তুমি ভাল আছ তো রানিমা?

—হ্যাঁ, কিন্তু এখন আর কিছু জিজ্ঞেস করিস না রঙ্গিনী। সামনে আমার অনেক কাজ রে—

রঙ্গিণী সীবনকার্যের প্রয়োজনীয় কূর্চিকা, পট্টসূত্রতন্তু, সুচিক, সীবনী ও নানাবর্ণের কৌষেয় চিনাংশুক মহারানির শয্যায় রেখে দুয়ারের পাল্লা টেনে দিল।

॥ ২ ॥

হেমন্তের এক অলস অপরাহ্নে নিভৃত নদীতীরে দুই মিত্র বিশ্রম্ভালাপে নিরত। নির্জন নদীর তীর। পুন্যসলিলা রেবার বুকে ছোট ছোট তরঙ্গগুলি একাদিক্রমে তীরে বয়ে এসে ছলছল শব্দে তটরেখাকে ধৌত করে চলেছে। তারই মাঝে নদীতীরে এক গাছের ছায়ায় বসে জল্পনারত দুই বন্ধু—কামোদক ও অকম্পন।

দুই মিত্র কিন্তু অভিন্নহৃদয় বলা সঙ্গত নয়। তাদের পরিচিতি দীর্ঘদিনের সত্য, কিন্তু অকম্পন কোনদিনই কামোদককে মন থেকে গ্রহণ করতে পারেনি। কামোদক লঘুচিত্ত, অমিতব্যয়ী, মদমত্ত। স্বভাবে অকম্পনের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। কিন্তু একসময়ের সহপাঠি সে, এখনও সঙ্গ ছাড়ে না। তাছাড়া তাদের মাঝে সামাজিক ব্যবধানও দুস্তর। সম্প্রতি কিছু সম্পন্নতা এলেও অকম্পন দরিদ্র ব্রাহ্মনসন্তান। আর কামোদক অর্থবান শ্রেষ্ঠীর একমাত্র উত্তরাধিকারী। এ কাহিনীতে কামোদকের ভূমিকা খুব বেশি নয়, তার অধিক পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। শুধু বলে রাখা যায়, দু'জনে অধ্যয়ন শুরু করেছিল একসঙ্গে একই গুরুগৃহে, সেই থেকেই পরিচয়। কিন্তু শীঘ্রই তাদের পথ আলাদা হয়ে যায়। তখন বণিকগৃহে ছেলেদের অনেক পড়াশোনা করার প্রচলন ছিল না, তার প্রয়োজনও হত না। কামোদক অল্পদিনেই গুরুগৃহ ত্যাগ করেছিল, তাদের পারিবারিক ব্যবসায়ে তাকে মনোনিবেশ করতে হয়। অকম্পন কিন্তু মনোযোগের সঙ্গে প্রাথমিক অধ্যয়ন শেষ করে। সে ভাল ছাত্র ছিল, শাস্ত্রাদির উচ্চশিক্ষাও সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করে বর্তমানে সে রাজবৈদ্য প্রভাকর মিশ্রের আশ্রমে চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যয়নে রত।

বর্তমান কাহিনীর কালে দূর সমরাঙ্গণে যুদ্ধের গতি ছিল অব্যহত। গৃহস্থ সাধারণের কিন্তু যুদ্ধে উৎসাহ ছিল না। তবে যুদ্ধের পরিণাম নিয়ে প্রজাবর্গের মনে ছিল সন্দেহের দোলাচল। একে মহারাজ রামগুপ্তের যুদ্ধকুশলতা খুব সুবিদিত নয়। তায় মীমাংসার লক্ষণরহিত যুদ্ধদশার ক্রমবর্ধমান জটিলতায় অনেকেই দেখেছিল এক অশুভ সংকেত।

আশঙ্কা অমূলকও ছিল না। সত্যই সার্থকভাবে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া রামগুপ্তের পক্ষে সম্ভব হয়নি। শক দ্বারা পর্যুদস্ত হয়ে যুদ্ধ সমাপ্ত করতে তিনি কূটবুদ্ধির আশ্রয় নিয়েছিলেন। শোনা যায়, যুদ্ধের ফল তাঁর অনুকূলে যাওয়ার সম্ভাবনা কমই ছিল। অবশেষে এই যুদ্ধে তিনি কুলশত্রুর সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন।

দিনটি ছিল উপরোক্ত সমরসন্ধিপত্র হস্তান্তরের পরদিবস। কিন্তু যুদ্ধপরিণতির এই সংবাদ তখনও কোনও নাগরিকের কর্ণগোচর হয়নি। রাজনীতিতে উপরোক্ত দুই মিত্রের রুচি নেই, যুদ্ধ সম্বন্ধেও তাঁরা বিশেষ উৎসাহী নয়। তাই তাদের আলোচনার দূরদূরান্তরেও ছিল না যুদ্ধের কথা। তবে এক অর্বাচীন শকপ্রধান দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মহারাজ সঙ্কটে ছিলেন এবং অবস্থার গুরুত্বে মহারাজের প্রতিনিধি হয়ে স্বয়ং কুমার চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধ পরিচালনা করছেন, এটুকু দুজনেই শুনেছিল।

কামোদকের পিতা পুত্রের বিবাহ স্থির করেছেন। গজানন শ্রেষ্ঠী শর্করা ও গুড়ের ব্যবসায়ে নগরীতে প্রভূত প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাঁকে বৈবাহিকের সম্পর্কে আবদ্ধ করতে চলেছেন কামোদকের পিতা। গজাননের একমাত্র কন্যার সঙ্গেই কামোদক আজ উদ্বাহবন্ধনে বাঁধা পড়ছে। তাই এই ভর দুপুরবেলায় অকম্পনকে আসতে হয়েছে শিপ্রার নির্জন তীরে। আমন্ত্রণ সে আগেই পেয়েছিলো। কিন্তু কোন অজুহাতেই সে যেন বিবাহবাসরে অনুপস্থিত না হয়, সেই অঙ্গীকার করাতে বিবাহ অনুষ্ঠানের এক ফাঁকে কামোদক স্বয়ং আজ বন্ধুকে একান্তে ডেকে এনেছে।

বন্ধুর প্রতি অকম্পনের মনে খুব প্রীতি ছিল না। ছিল না বিয়েতে সম্মিলিত হবার ঐকান্তিক ইচ্ছাও। একটু অনিচ্ছুক উষ্ণতা দেখিয়েই অকম্পন বলল, বিয়ে করার আর সময় পেলি না? তোর বয়স তো বাইশও পার হয়নি?

কামোদক যেন একটু অপ্রস্তুত হয়েই বলে, কি করব ভাই, পিতৃদেব

আর দেরি করতে রাজি হলেন না। বললেন, কন্যা সুলক্ষণা কিন্তু সতেরয় পদার্পণ করেছে। আর দেরি হয়ে গেলে —

—তা কন্যা তো শুধুই সুলক্ষণা বলে মনে হচ্ছে না। আমার সন্দেহ তিনি অতীব সুন্দরী। তাই দেখেই তুই একেবারে পিতৃভক্ত শ্রবণকুমার হয়ে গেলি।

—না না, তুই বিশ্বাস কর কম্পন, আমি কন্যা দেখিইনি।

—তাই নাকি? তাহলে এতো ত্বরা কেন ভাই? অন্তত যুদ্ধটা বন্ধ হওয়ার অপেক্ষা করলেও তো পারতিস। সন্ধ্যার পর পথে বেরোতেও ভয় হয়, কি জানি কি বিভ্রাট ঘটে—

—তা যা বলেছিস, কামোদক বিরক্তির সঙ্গে বলে, শ্যালকপুত্র শকটা যুদ্ধ চালিয়েই যাচ্ছে। কিন্তু সে তুই কিচ্ছু ভাবিস না, আমি লোক পাঠিয়ে দেব তোকে নিয়ে যেতে। কিন্তু আসতে তোকে হবেই।

অকম্পনের এ বিয়েতে যোগদান করার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। অনর্থক হুল্লোড়ে সে কোনকালেই স্বস্তিবোধ করে না। যথাসাধ্য এসব পরিহার করে চলতে চায়। এক্ষেত্রেও সে চেষ্টা করলো নিমন্ত্রণরক্ষা এড়াতে, কিন্তু কামোদকও হার মানবে না। প্রথমে দীর্ঘ বন্ধুত্বের ভাবপ্রবণ অধিকারবোধ, তারপর অনুরোধ-উপরোধ, শেষে অনুনয়-বিনয়। এসবের পরেও যখন বন্ধু নিমন্ত্রণ স্বীকার করছে না তখন কামোদক ভীতিপ্রদর্শনের পথ ধরল। বলল, দেখ, এমন যদি করিস তাহলে তোর যখন বিয়ে হবে, দেখিস আমিও কিন্তু আসব না।

এবার হেসে ফেলল অকম্পন। নিজের জীবনের এক বিশেষ মুহূর্তে বন্ধুকে কাছে পাওয়ার আন্তরিকতায় কামোদকের কোনও খাদ ছিল না। অকম্পনের মন ভিজে এসেছিল। কপট শ্লেষভরে সে বলল, কী রে— বিয়ে করতে যেতে ভয় করছে বুঝি?

—ভয়? বিয়ে করতে ভয় পাব আমি? বৌ কি বাঘ নাকি? সকৌতুকে আস্ফালন করে কামোদক, কি যে বলিস? বিয়ের মতো তুচ্ছ ব্যাপারে ভয় আমি করি না। আসলে মা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন তোকে নিয়ে আসার কথা। তাই তখন থেকে এতো করে সাধছি— বল আসবি?

এবার অকম্পনের দুর্বল জায়গায় ঘা দিয়েছে কামোদক। আর ওজর দেখানো শোভন হয় না। তাই সেরকম ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও অবশেষে অকম্পনকে হার মানতে হলো।

—আচ্ছা আচ্ছা যাব'খন। থাকব না হয় তোর পাশে, তোর এই বিপদের দিনে। রসিকতা করে বলল সে।

কামোদকের গৃহসেবকেরা এসেছিল তাকে নিয়ে যেতে, বিবাহ অনুষ্ঠানের সান্ধ্য আচার শুরু করার সময় উপস্থিত। অকম্পনের দু'কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে কামোদক বিদায় নিল। অকম্পন খানিকক্ষণ চেয়ে রইলো বন্ধুর যাত্রাপথের দিকে। কামোদকের ঐশ্বর্যের অহংকার এবং প্রগলভতা অকম্পন পছন্দ করত না ঠিকই, কিন্তু আজকের সরল বন্ধুবাৎসল্য তার হৃদয় ছুঁয়েছিল। বিয়েতে অংশগ্রহণ করবে স্থির করে অকম্পন নিজ গৃহের পথ ধরলো।

অর্ধদণ্ডের পথ অতিক্রম করে অকম্পন যখন রাজপথে এসে উপস্থিত হল তখন অপরাহ্ন অতিক্রান্তপ্রায়। উজ্জয়িনী নগরীর মাঝ বরাবর উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত প্রধান রাজপথটি হল নগরীর প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্র। প্রশস্ত রাজপথ চতুষ্কোণ প্রস্তরফলকে বাঁধানো। পথের দু'ধারে বিপণির সারি, সেখানে নানা পণ্যদ্রব্যের সমাহার। ক্রেতা-বিক্রেতার কোলাহলে সর্বদাই এই স্থান পূর্ণ থাকে। দিনের মধ্যে অপরাহ্নের এই সময়টা শুধু নাগরিকগণের ব্যস্ততা একটু স্তিমিত হয়। দোকানিরা আপন আবাসে মধ্যাহ্ন ভোজন ও বিশ্রাম সমাধা করে।

আজকে অকম্পন তার কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ করল। দ্বিপ্রহরের নিয়মমাফিক স্তিমিত গুঞ্জন ছাপিয়ে আজ সেখানে যেন এক অজানা উদ্দীপনা। নাগরিকগণ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে কোন নতুন ঘটনার সম্ভাবনায় মুখর হয়ে আলোচনায় মগ্ন।

যেতে যেতে কয়েকজন নাগরিকের একটি ছোট গোষ্ঠীর মাঝে অকম্পন একটি খর্বাকৃতি লোককে আস্ফালন করে বলতে শুনল... সব বাজে কথা! রাজাদের চক্রান্ত। তোমরা মূর্খের মতো মনে করছো, রাজা আমাদের পালন করছেন। সে ছিল মহারাজাধিরাজের সময়ে। রামরাজত্ব। সে কাল আর নেই হে। তোমরা যে যাই বল, আমি এই ভ্রান্তিতে নেই ভাই...

প্রত্যুত্তরে এক বৃদ্ধ বললেন, তোমার আস্ফালন বড় বেড়েছে কুঞ্জ। এমনভাবে বলছ, যেন যুদ্ধের সকল সংবাদ তোমার নখদর্পণে।

বোঝা গেল যুদ্ধের আসন্ন পরিণতি নিয়েই বাদানুবাদ চলছে। দীর্ঘসূত্রী যুদ্ধ সম্বন্ধে নাগরিকদের আগ্রহ স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পেয়েছিল। আবার কোন নতুন রটনায় তারা উৎসাহিত হয়েছে তা সহজে ধরা গেল না।

দূরাগত এক কোলাহলের শব্দে অকম্পন উচ্চকিত হল। দেখা গেল রাজঘোষকের দল হাতির পিঠে ধীরে ধীরে এদিকেই এগিয়ে আসছে, বিশাল এক জনতা তাদের ঘিরে মধুভাণ্ডের পাশে মক্ষিকাপুঞ্জের মতো একই সঙ্গে চলেছে। ঢাকের তুমুল শব্দ ক্রমবর্ধমান তীব্রতায় আবার একবার বেজে উঠল, দ্রিমি দ্রিমি দ্রিমি দ্রিমি—।

ক্রমশ জনারণ্যে প্রশস্ত রাজপথও পরিপূর্ণ হয়ে অকম্পনের পথরোধ হয়ে এল। সে যেখানে ছিল তার থেকে কিছু দূরে এসে শোভাযাত্রা থেমে গেল। ঢাকের বাদ্য বন্ধ হলে এক ঘোষক হস্তিপৃষ্ঠ থেকে উল্লম্ফনযোগে একটি প্রস্তরখণ্ডে আরোহণ করলো। তারপর শঙ্কু আকৃতির ধাতব নলযন্ত্রে মুখ লাগিয়ে তার ঘোষণা শুরু করল, শুনুন শুনুন শুনুন, অত্যন্ত হর্ষের সঙ্গে আমাদের পরমারাধ্য শ্রীমন্মহারাজ রামগুপ্তের পক্ষ হতে রাজধানীর নাগরিকগণের উদ্দেশ্যে এই সুসংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। আপনারা সবাই এই কথা জেনে সুখী হবেন যে আজ বহুকাল যাবৎ যে যুদ্ধের করাল ছায়া আমাদের রাজ্যকে গ্রাস করেছিল, আমাদের মহারাজের অলৌকিক বীরত্ব ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তার আশু অবসান হতে চলেছে। এ যুদ্ধে শত্রুর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ছিল, কিন্তু দীর্ঘসূত্রী যুদ্ধের পরিণামস্বরূপ অনাবশ্যক লোকক্ষয় ও অর্থহানি রোধ করার নিমিত্ত আমাদের ধীমান মহারাজা যুদ্ধসমাপ্তির প্রস্তাব দিয়েছেন। এ অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের বিষয় যে পরাজয়ভীত শত্রু সে প্রস্তাব স্বীকার করে আপন মঙ্গলের পথ বেছে নেওয়ার বুদ্ধিমত্তা দেখিয়েছে। মহারাজ রামগুপ্ত এই সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে তাঁর প্রজাবাৎসল্য ও দূরদর্শিতার যে পরিচয় দিয়েছেন তা ইতিহাসে বিরল। আগামী পক্ষকালের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তির সকল শর্তাবলী পালিত হতে চলেছে। প্রজাগণ পুনরায় তাঁদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবেন, জনসাধারণের গমনাগমন ও ব্যবসা-বৃত্তির উপর প্রযুক্ত যুদ্ধকালীন প্রতিবন্ধের অবসান ঘোষিত করা হচ্ছে। শুনুন শুনুন শুনুন—আপনারা যুদ্ধক্ষেত্র ব্যতীত রাজধানীর অন্য সর্বত্র বিচরণের জন্য পুনরায় স্বতন্ত্র হলেন—ইত্যাদি ইত্যাদি।

অকম্পন জনতার অবরোধ ভেদ করে নিজস্ব যাত্রাপথে এগিয়ে গিয়েছিল, ধীরে ধীরে ঘোষকের বাণী ক্ষীণ হয়ে এলো।

যুদ্ধ সত্যই শেষ হতে চলেছে। রাজ্য যখন যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকে, নাগরিকদের কিছু হেনস্থা স্বীকার করতেই হয়। অতিরিক্ত করভার, বিভিন্ন স্থানে গমনাগমনের বিধিনিষেধ ইত্যাদি ছাড়াও, রাজ্যে সৈন্যদলের উপস্থিতি প্রজাগণের সুখের কারণ ছিল না। এখন সেসব উৎপীড়নের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে জেনে অকম্পন স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল। তাছাড়া আরও অনেকের মতোই মহারাজ রামগুপ্তের শাসন প্রণালীতেও সে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিল না। তাই যুদ্ধ স্থগিত হওয়ায় মহারাজের পাটলিপুত্রে ফিরে যাবার যে সম্ভাবনা দেখা দিল, তাতেও খানিক স্বস্তিবোধ না করে পারল না।

কিন্তু রাজসত্তার পক্ষ থেকে যে কৃতিত্বের দাবি করা হল, সে ব্যাপারে অকম্পন নিঃসন্দেহ হতে পারল না। জনশ্রুতিতে শুনেছিল, মহারাজ রামগুপ্তের যুদ্ধকুশলতা খুব প্রশংসনীয় নয়। তাই শত্রুর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সন্ধিপ্রস্তাব মহারাজ স্বেচ্ছায় দিয়েছিলেন, এ কথা বোধহয় সত্য নয়। আর বাধ্য হয়ে সন্ধি করা যে পরাজয়েরই নামান্তর, এটুকু বুঝতে যুদ্ধবিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। মনে মনেই অকম্পনের এক অম্লমধুর হাসির উদ্রেক হল।

যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে অবশ্য অকম্পনের কোন শিরঃপীড়া ছিল না। ঘোষণা প্রহসন সমাপ্তির পর আপন উদ্দেশ্যে সে আবার পা বাড়িয়েছে, এমন সময়ে তার নাম ধরে কারুর আহ্বানে থমকে দাঁড়ালো। পিছন ফিরে দেখে আচার্যের আশ্রমের এক কর্মচারী।

রাজবৈদ্য প্রভাকর মিশ্রের এই সেবকটিকে অকম্পন চেনে। নিকটে এসে সে বলল, ভদ্র অকম্পন, বৈদ্যরাজ অবিলম্বে আপনাকে স্মরণ করেছেন। আসুন।

তাকে অনুসরণ করে নিকটস্থ একটি অশ্ব-শকটের কাছে এলো অকম্পন। আরোহীর আসন থেকে আচার্য প্রভাকর মিশ্র তাঁকে দ্রুত হাতের ইশারায় বললেন, উঠে এসো অকম্পন, বিশেষ প্রয়োজন।

আচার্য আজ আশ্রমে অনুপস্থিত ছিলেন। নিশ্চই গুরুত্বপূর্ণ কোনও কথা হবে ভেবে বিনা বাক্যব্যয়ে অকম্পন আদেশ পালন করলো। অশ্ব প্রস্তুতই ছিল, সারথি পুনরায় রথচালনায় বিলম্ব করলো না।

চলন্ত রথে প্রভাকর মিশ্র গম্ভীরমুখে যা জানালেন তার মর্মার্থ এই। গত সন্ধ্যায় রাজমহিষী ধ্রুবাদেবী হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। অপরাহ্ন অবধি তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। অসুখটা যে ঠিক, কি তা এখনও নির্ধারণ করা যায়নি, তবে বর্তমানে তিনি অত্যন্ত দুর্বল এবং শয্যাশায়ী। যদিও রাজবৈদ্য কোন বিশেষ আশংকার সঙ্কেত পাননি, কিন্তু তিনি মনে করেন অবিলম্বে অকম্পন যেন একবার গিয়ে মহারানিকে পরীক্ষা করে দেখে।

অকম্পন সহসা গুরুদেবের বক্তব্য অনুধাবন করতে পারল না। রাজপ্রাসাদে গিয়ে স্বয়ং মহারানির চিকিৎসা করবে অকম্পন, আচার্য কি এই কথাই তাকে বলছেন? নিজের চিকিৎসায় কি তাঁর আস্থা নেই? অপারগ হয়ে অকম্পনের সহায়তা প্রার্থনা করছেন? না না, এ অসম্ভব। তাহলে কি এ সর্বৈব অভিনয়? অকল্পনীয় সব সম্ভাবনায় বিভ্রান্ত হয়ে সে ভাবল, আচার্য নিশ্চই রসিকতা করছেন। অথচ তাঁর ভঙ্গিমায় রসিকতার কোন চিহ্ন নেই!

পথের দুই ধারে হর্ম্যগুলি পেরিয়ে রাজবৈদ্যের অশ্বশকট দ্রুতবেগে রাজপুরীর দিকে ছুটে চলেছিল। কিন্তু অকম্পনের মন পথের দিকে ছিল না। তার মনে দ্বন্দ গুরুদেবের অদ্ভুত আদেশ এবং তা পালনে নিজের সামর্থের প্রতুলতা নিয়ে।

রাজবৈদ্য প্রভাকর মিশ্র এ রাজ্যের সবচেয়ে প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের অন্যতম। তিনি যেখানে দায়িত্বে আছেন সেখানে তাঁরই শিক্ষানবীশ অকম্পন নতুন করে রোগীর পরীক্ষা করবে? এই ভাবনাতেই সে বিভ্রান্ত। অবশেষে অকম্পন সকুণ্ঠায় তার দ্বন্দ্বের কারণ ব্যক্ত করলে আচার্য বললেন, এ স্বয়ং মহারানির আদেশ। তাঁর ইচ্ছা রাজবৈদ্যের কোনো নবীন এবং কর্মঠ শিষ্যের হাতেই তিনি আরো শীঘ্র আরোগ্যলাভ করবেন।

এ কথা শুনে অকম্পন গুরুদেবের সামনে লজ্জায় যেন মাটিতে মিশে গেল। অকম্পন জানে প্রভাকর মিশ্র তাকে স্নেহ করেন, তার গুণপনা নিশ্চই বর্ধিত আকারে মহারানির কাছে ব্যক্তও করে থাকবেন। কিন্তু এ যে নিতান্তই বিড়ম্বনা। গুরুকে অতিক্রম করার স্পর্ধা সে কিভাবে দেখাবে? মহারানির আদেশ যদি আচার্যের মনে আঘাত করে থাকে—!

তার অবস্থা বুঝে গুরুদেব তাকে অভয় দিয়ে বললেন, তুমি মিছেই কুণ্ঠিত হচ্ছ অকম্পন। মহারানি আমার পরম স্নেহের পাত্রী, তাঁর ইচ্ছায় আমি কিছুমাত্র আহত হইনি। বরং তোমাকে আমি আমার শিষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। আমারও একান্ত ইচ্ছা তুমি মহারানির সঙ্গে একবার দেখা কর।

এরপর আর কথা চলে না। প্রায় নীরবেই বাকি পথটুকু অতিক্রম করে অনতিবিলম্বে অকম্পন রাজপ্রাসাদে আনীত হলো। ইতিপূর্বে রাজপ্রাসাদে আগমনের সৌভাগ্য হয়নি তার। আগমন দুরস্থান, এ সম্ভাবনার কথাই সে কখনও কল্পনা করেনি। রাজপ্রাসাদের পরিসরে প্রবেশ করে বিস্ময়ে তার চক্ষু ধাঁধিয়ে গেল। বহু প্রাকার-অলিন্দ পার হয়ে সে অন্দরমহলে উপস্থিত হল। রাজবৈদ্য সঙ্গে থাকায় সরাসরি রানিমার মহলে প্রবেশের কোনো অন্তরায় হলো না।

অকম্পন রাজপরিবারের শিষ্টাচারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তার ওপর স্বয়ং সম্রাজ্ঞীর সম্মুখীন হতে চলেছে। হেমন্তের প্রাক্কালেই কঠোর শীতের অনুভূতি হচ্ছিল তার। প্রাসাদে প্রবেশ করার পর থেকে রাজবাড়ির শালীনতারক্ষায় সন্ত্রস্ত সে অধোবদন হয়েই রইলো।

মহারানির কক্ষে উপনীত হয়ে গুরুদেব যেন অনুগত শিষ্যের মত বলে গেলেন তিনি কিভাবে চিকিৎসা করেছেন, কি কি লক্ষণ পরীক্ষা করেছেন, কি কি নিদান দিয়েছেন। অকম্পন মরমে মরে গিয়ে শুনলো আচার্য বলছেন, এখন অকম্পন যেন বিবেচনা করে দেখে আর কি করা যেতে পারে।

কম্পিত হাতে রোগিনীর নাড়ী পরীক্ষা করলো অকম্পন, গুরুদেবেরই দেওয়া বিদ্যায় তাঁরই উপচার যাচাই করে দেখল, নতুন কিছুই আর করার নেই। সব নিদানই নির্ভুল, চিকিৎসা ত্রুটিহীন।

—আমি তো অকুশল কিছু অনুমান করছি না, গুরুদেব, এইটুকু বলে হতাশ ভাবে অকম্পন যখন ভেবে পাচ্ছে না কি করবে, তখনই শুনতে পেল এক অপূর্ব স্বর, রাজবৈদ্য, আমি আপনার নবীন শিষ্যের সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই। আপনি আমার অশেষ উপকার করেছেন, আর আপনাকে বিব্রত করব না।

॥ ৩ ॥

নিদ্রাভঙ্গে প্রভাতের সূর্য আজকাল মহারাজ রামগুপ্তের মনে আলোক সঞ্চার করে না, মুখমণ্ডলে তাঁর সর্বদাই বিরাজ করছে রাতের আঁধার। চক্ষু রক্তবর্ণ, কেশ রুক্ষ ও অবিন্যস্ত। যেন রাত্রে তিনি নিদ্রা যাননি। সুস্থির নিদ্রা অবশ্য অনেকদিন আর তাঁর হয় না। প্রতাপান্বিত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারের ভার বড় কম নয়, মহারাজ রামগুপ্ত অস্থিমজ্জায় তা টের পাচ্ছেন।

কালিঙ্গড় সমস্যাটা একটা অনাবশ্যক বোঝার মত মহারাজের নিদ্রাকণ্টক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ যুদ্ধের শুরুতেই চন্দ্রগুপ্ত হাল ধরলে ফলাফল হয়তো অন্য হত। কিন্তু মহারাজ তা হতে দেননি। যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে দূরে থেকে নিজেই যুদ্ধের পরিচালনা করেছেন যাতে চন্দ্রগুপ্ত পাদপ্রদীপের আলোয় না আসেন। অবশেষে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও যখন শত্রুর অবরোধ ভঙ্গ হল না, রাজধানীতে প্রয়োজনীয় সরবরাহের আশঙ্কা দেখা দিল এবং সমরাঙ্গণে দৈনিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ ক্রমশ বল্গাছাড়া হবার উপক্রম হল, তখন চন্দ্রগুপ্ত জয়স্কন্ধাবারে প্রেরিত হলেন। কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল তখন প্রায় নিশ্চিত হয়ে এসেছে।

অসম্মানজনক পরাজয়ের সম্ভাবনা মহারাজকে বিক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। তিনি তাঁর অনুগত সভাসদগণকে বুঝিয়েছেন, শত্রু ও প্রজাগণের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তিনি সন্ধি করেছেন। চাটুকারেরা দ্বিরুক্তি না করে সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু অন্তর্চেতনায় বিবেকের দংশন কমেনি। প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের এই দিক থেকে যে আক্রমণের সম্ভাবনা আছে তা তিনি কখনো আশঙ্কা করেননি, এ তো তাঁরই ব্যর্থতা।

এ কথা সত্য যে কালান দুর্গ যুদ্ধের প্রয়োজনে দীর্ঘকাল ব্যবহার করতে হয়নি, মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেকের পরে এ তাঁর অবসরের দুর্গনিবাসেই পর্যবসিত হয়েছিল। বর্তমান মহারাজও সেখানে কদাচিৎ গেছেন। সেটির স্বত্বত্যাগ হয়তো বিশেষ বড় ক্ষতি নয়। শত্রুপক্ষও দুর্গটির অধিকার ব্যতীত আর কিছু দাবি করেনি। প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তারা রাজধানী উজ্জয়িনীর দিকে আর ক্ষমতার বিস্তার করবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রশ্ন থেকে যায়। আপাতকালীন সন্ধির প্রতিশ্রুতি শত্রু যে রাখবে, তারই স্থিরতা কী? যুদ্ধ না করেও শত্রুসৈন্য যে অন্য উপদ্রব করবে না, তারও কি নিশ্চয়তা আছে? রাজধানীর সুরক্ষায় অবিলম্বে আর একটি জয়স্কন্ধাবার নির্মাণ করা প্রয়োজন। উজ্জয়িনী হাতছাড়া হয়ে গেলে তা যে বড় অসম্মানের কথা।

প্রকৃতকথা এই যে মুখে যাই বলুন, নিজের ব্যক্তিত্বের অভাব বোধহয় মহারাজ মর্মে মর্মে অনুভব করতেন। সেই কারণেই হয়তো আত্মীয়, বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের অযথা হীন প্রতিপন্ন করে আপন আধিপত্য বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। নিজের সুযোগ্য ভ্রাতাকে স্নেহ দিতে ভুলেছিলেন, বিচক্ষণ মহামাত্যের সুপরামর্শ গ্রহণ করেননি, হারিয়েছিলেন প্রধান সেনাপতির আনুগত্য। ফল যা হবার তাই হয়েছিল। কতিপয় স্বার্থান্বেষী অযোগ্য চাটুকারের উপর আস্থা স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাদের সহায়তার ভঙ্গুর আশ্বাসে আর মূলত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সুবিশাল নামমাহাত্ম্য সম্বল করে মহারাজ রামগুপ্ত সিংহাসন অধিকার তো করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে গৌরবের মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

ব্যর্থতার জ্বালায় সম্রাট নিজেকে বুঝিয়েছেন, এ চন্দ্রগুপ্তের ব্যর্থতা।

সহোদরের নিমিত্তই তিনি আজ লাঞ্ছিত। তাঁর অন্তরাত্মা কিন্তু বারবার জানিয়েছে, মিথ্যা রামগুপ্ত, তুমি পরাজিত তোমারই অবগুণে। চন্দ্রগুপ্তের সাফল্য তুমি কামনা করনি।

পরাজয়ের অতি নিকটে এসেও চন্দ্রগুপ্ত নিশ্চেষ্ট হননি। কিন্তু নিত্য বাদ সেধেছেন মহারাজ রামগুপ্ত। গুরুতর সংবাদ রাজধানীতে পৌঁছয়নি, সময়মত সৈন্য ও অস্ত্রাদি পাওয়া যায়নি। মহারাজের দুর্বোধ্য মানসিকতায় আর কোনও অভিসন্ধি লুকিয়ে ছিল কিনা তা কে বলতে পারবে? একেই বুঝি বলে বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধি।

অন্তর্দ্বন্দ্বে মহারাজ রামগুপ্তের নিদ্রাসংকট উপস্থিত হয়েছিল। কালিঙ্গড় যুদ্ধের একটা আশু নিষ্পত্তির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাই তার একটা সহজ পন্থাও মহারাজ আবিষ্কার করে ফেলেছেন। সন্ধি। হ্যাঁ, গুপ্তকুলের আজন্ম শত্রুর সঙ্গে আপোষ করে যুদ্ধ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। তার জন্য মূর্খ শকটা যে কতিপয় শর্ত দিয়েছে, তা গ্রহণ করায় তাঁর কোনও আপত্তি নেই। বরং এতে একটা বড় সুবিধেই হয়েছে।

তাঁর বিবেক বলেছে, সন্ধিপ্রস্তাবের যে শর্তাবলীতে তুমি সম্মত হয়েছ, তাতে পুরুষানুক্রমে তোমার নাম কলঙ্কিত হবে রাজন। ক্ষিপ্ত হয়ে মহারাজ আপন বিবেকের কণ্ঠরোধ করেছেন, আদৌ তা নয়। তিনি তাঁর ন্যায্য অভিলাষ পূরণ করেছেন মাত্র।

রাজা ও রানির মাঝে সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান উত্তাপে প্রায়শই বিস্ফোরণ হচ্ছিল। গতসন্ধ্যার ঘটনায় তা অগ্ন্যুৎপাতের আকার নেয়। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার আর স্থান ছিল না। মহারাজ সুযোগের প্রতীক্ষাতেই ছিলেন। যুদ্ধসংকটের এই পরিস্থিতি যে নতুন সুযোগ বহন করে এনেছে, মহারাজ অবিলম্বে তার সদ্ব্যবহার করলেন। মহামাত্য বিশঙ্কদেবের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও আর কাল বিলম্ব না করে তিনি সন্ধিপ্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে শত্রুশিবিরে দূত প্রেরণ করে দিয়েছিলেন।

এরপর তাঁর প্রতিহিংসার কেন্দ্রে শুধু চন্দ্রগুপ্ত! তার দণ্ডবিধান এখনও বাকি। সকল ব্যর্থতার লজ্জা তিনি উজ্জয়িনীর ভূমিতে শেষ করে পাটলিপুত্র ফিরে যেতে চান। আজ একরকম মনস্থির করেই তিনি নিজের বিশ্বস্ত অনুচর দত্তসেনকে আহ্বান করেছেন।

কিন্তু দুষ্কর পরিস্থিতিতে বিশঙ্কদেব বড় দুর্বিষহ হয়ে উঠেছেন। বর্তমান যুদ্ধসন্ধির শর্তাবলী নিয়ে তিনি মহারাজ রামগুপ্তের বিশেষ শিরঃপীড়ার কারণ ঘটাচ্ছেন। বারংবার অনাবশ্যক বিতর্ক সৃষ্টি করছেন। মহারাজের সঙ্গে মহামাত্যের মতের ঐক্য ক্রমশ বিরল থেকে বিরলতর হতে চলেছে।

মহারাজ রামগুপ্ত সবিশেষ অসন্তুষ্ট। বিশঙ্কদেব এ রাজ্যের মহামাত্য। তিনি বিচক্ষণ হতে পারেন কিন্তু তাই বলে রাজাদেশ লঙ্ঘন করার অধিকার তো তাঁর নেই। কিন্তু বিশঙ্কদেব তাই করছেন। কঠোর আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও সন্ধিপ্রক্রিয়ায় যতদূর সম্ভব বাধা সৃষ্টি করে চলেছেন হ্রাসবুদ্ধি এই প্রবীণ দুষ্কটা। অযথা কালক্ষেপ হয়েছে। অবশেষে গতকাল সায়াহ্নে মাত্র এই শুভকাজটি সম্পন্ন করা গেছে।

পূর্বসন্ধ্যাতেই এই নিয়ে একপ্রস্থ তিক্ত বাদানুবাদ হয়ে গেছে। মহারাজের যুদ্ধসন্ধির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছিলেন বিশঙ্কদেব। বিতর্ক উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ে পর্যবসিত হয়েছিল। বিশঙ্কদেব উচ্চকণ্ঠে তর্ক দিলেন, রাজার রোষ বহ্নিমান হল। কিন্তু সবইব্যর্থ,তর্কের সদর্থক কোনও পরিণতি হয়নি। মহামাত্য আরও কিছু বলতেন, তার আগেই তাঁকে একপ্রকার বিদায় হবারই আদেশ দিয়েছিলেন মহারাজ।

আজ বিনম্র হয়ে তিনি পুনরায় এসেছেন একটি শর্তের পুনর্বিবেচনার আর্জি নিয়ে।

—এ অধর্ম মহারাজ, আমার অন্তঃকরণ কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। আজ আপনার পিতা জীবিত থাকলে বড় দুঃখিত হতেন।

পাষণ্ডটাকে নিয়ে এই এক বিপত্তি। পিতার সময়ের বয়োজ্যেষ্ঠ রাজপুরুষ। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং ঘোর আদর্শবাদী। তদুপরি পরলোকগত মন্মহারাজের স্নেহধন্য প্রিয়পাত্র ছিল। কথায় কথায় তাই পিতার প্রসঙ্গ এনে তাঁকে ন্যূন প্রতিপন্ন করার প্রয়াস থাকে জড়মুকটার।

এমন লোককে দিয়ে রাজ্য শাসন বড় দুরূহ। উপায় থাকলে কবে তাকে অর্ধচন্দ্র দেওয়া যেত। কিন্তু মুশকিল হল লোকটার অবিমিশ্র সততা এবং বিপুল প্রশাসনিক প্রজ্ঞা। এই দীর্ঘকালীন যুদ্ধের মাঝেও সমূহ প্রজাবিরোধ এড়িয়ে এখনও যে রাজ্যের অর্থনৈতিক সাম্য বজায় আছে, তা মহামাত্য বিশঙ্কদেবের অবদান ব্যতীত সম্ভব হত না। এই তিক্ত সত্যটা মহারাজের অপ্রিয় হলেও তাকে অস্বীকার করতে পারেন না। তাই ইচ্ছা থাকলেও তিনি বিশঙ্কদেবকে অপসারণের দুঃসাহস করেননি।

কিন্তু লোকটার স্পর্ধায় আজ বিচলিত হলেন রামগুপ্ত। সামান্য কর্মচারী এসেছে রাজাকে ধর্মের শিক্ষা দিতে? যুদ্ধসন্ধির শর্তের ব্যাপারে আর বিশঙ্কদেবকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। একটু দৃঢ়স্বরেই মহারাজ রামগুপ্ত জানালেন, আর্য বিশঙ্কদেব, আপনাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আমি এই রাজ্যের রাজা। যুদ্ধের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্যতা ও সামর্থ রাজারই আছে, বেতনভুক রাজকর্মচারীর নয়। যথেষ্ট বিচার করেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বারংবার সে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার কথা বলে আপনি কিন্তু রাজাদেশের অবমাননা করছেন।

—অবমাননা নয় মহারাজ। আপনাকে শিশুকাল থেকে বড় হতে দেখেছি। একসময়ে আপনাকে সদুপদেশ দেওয়ার অধিকার আমার ছিল। অন্তত সেই অধিকারে বলে শুধু একটিবারের মতো আমার কথা রাখুন আর্যপুত্র,মহামাত্যের কণ্ঠস্বরে মিনতির সুর, আর এ জীবনে আপনাকে পরামর্শ দানের ধৃষ্টতা করবো না।

—অন্তিমবারের মতো আপনিও শুনে নিন, শর্ত পুনর্বিবেচনার সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। দূত প্রেরিত হয়ে গেছে সন্ধিবার্তাসহ। সুতরাং এই নিয়ে অযথা আর সময় ব্যর্থ না করে আপনার অন্যান্য কর্তব্যে মনোনিবেশ করুন মহামাত্য।

রামগুপ্তের উদ্ধত ভাষায় বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি অনুবৃত্তির লেশ নেই। রাজ্যের বর্তমান রাজকর্মচারীদের এ ধরণের অপমান সহ্য করবার অভ্যাস আছে। বিশঙ্কদেবের মুখমণ্ডল একটু রক্তিমাভ হল, চোয়াল স্বল্প দৃঢ়তা এল। তদ্ভিন্ন আর কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। একটু পরে স্বাভাবিক স্বরেই তিনি বললেন, বেশ। তাহলে আপনিও জেনে রাখুন মহারাজ, এই শর্তপালনের অনুষ্ঠানে আমাকে আপনি পাবেন না।

রামগুপ্তের সমক্ষে এ ধরনের কথা এক বিশঙ্কদেবই বলতে পারেন। মহারাজের রোষকশায়িত নেত্র দেখে বোঝা যায় যে পারলে মহামাত্যের বিরলকেশ মুণ্ডটি এই মুহূর্তে তিনি চিবিয়ে খান অথবা রোষানলে বৃদ্ধকে ভস্ম করে ফেলেন। কিন্তু সে সব কিছু না করে হিমশীতল কণ্ঠে শুধু বললেন, সে অনুষ্ঠানে আপনি আমার কোনও কাজে আসবেন না তা জানি। তাই আপনি আবেদন না করলেও আমি আপনাকে হয়তো সঙ্গে নিতাম না। কিন্তু আপনি আমার ইচ্ছাকে প্রভাবিত করবার স্পর্ধা দেখাচ্ছেন। তাই আপনার যা অনভিপ্রেত, তা আপনার দ্বারাই সম্পন্ন করাতে ইচ্ছা হচ্ছে।

বিশঙ্কদেবের মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা অগ্রাহ্য করে মহারাজ এরপর বললেন, যাই হোক, আমার আদেশ আপনাকে যথাসময়ে অবগত করাব। আপাতত আপনি মহারানির অন্দরমহলে যারা আসছে তাদের উপর দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করুন।

—সে ব্যবস্থায় ত্রুটি নেই মহারাজ। কোনও গুপ্তচরের পক্ষে—

—গুপ্তচর শুধু নয়, অন্দরে যে কেউ আসবে তাদের পিছনে চর লাগান। যে কোনও অপরিচিত ব্যক্তি, বুঝেছেন তো?

—যথা আজ্ঞা মহারাজ।

রুক্ষস্বরে পুনরায় মহারাজ বিশঙ্কদেবের উদ্দেশ্যে বললেন, আর শুনুন, অপরাহ্নে দত্তসেন আসবে। সে এলেই যেন আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

রাজাদেশ গ্রহণ করে বিশঙ্কদেব প্রস্থান করলেন।

***

অকম্পন যখন সম্বিত ফিরে পেল, ততক্ষণে দ্বারের প্রান্তে দুই প্রতিহারিণী ভিন্ন আর সকলেই কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন, এমনকি আচার্য প্রভাকর মিশ্রও। যাবার আগে অকম্পনের স্কন্ধে হাত রেখে মৃদুস্বরে তিনি বলে গেছেন, চিন্তিত হোয়ো না অকম্পন। দেবীরানির অনুগ্রহ লাভ করেছো তুমি, সকুশলে প্রাসাদ পরিত্যাগ কোরো। প্রয়োজনে মহামাত্য বিশঙ্কদেবের শরণ নিও।

মহারানি ধ্রুবাদেবীর কণ্ঠস্বর কর্ণকুহরে যেতে কিছুক্ষণের জন্য

অকম্পন যেন বাকরহিত দারুমূর্তিতে পরিণত হয়েছিল। এই স্বর প্রথমবার শুনল অকম্পন! কিন্তু এ কী শুনল সে? সম্রাজ্ঞী বার্তালাপ করতে আগ্রহী অকম্পনের সঙ্গে! তাও একান্তে? স্বকর্ণে শোনা কথাও যেন বিশ্বাস হতে চায় না।

আর নারীকণ্ঠ কি জলতরঙ্গের চেয়েও মধুর হয়?

মহাদেবীর প্রস্তাবে আচার্য বললেন, অবশ্য। আমার অন্যত্র কিছু প্রয়োজনও ছিল। আমাকে বিদায় দিন দেবীরানি।

প্রভাকর মিশ্র গাত্রোত্থান করে বিদায় নিতে এবার সত্যই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো অকম্পন। সম্রাজ্ঞীর আদেশের অপেক্ষায় সরাসরি তাঁর সম্মুখে সে একাকী। অকম্পনের হৃদযন্ত্রের গতি দ্রুত হল। মাত্র কয়েক পল, তারপরই...

—ভাই, তোমারই নাম অকম্পন?

চমকিত হয়ে অকম্পন চোখ তুলে ফেলল, অকস্মাৎ ভ্রাতৃসম্বোধনের জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। তারপর বেশ কিছুক্ষণ দৃষ্টি অপসারণ করতে তার ভুল হয়ে গেল। আগাগোড়া আনতনয়নে থাকায় সে খেয়াল করেনি, মহারানির পালঙ্ক ও তার মাঝে একটা সূক্ষ্ম কার্পাসের ব্যবধান ছিল। এখন দেখল মহারানি ধ্রুবাদেবী সেই সূক্ষ্ম বস্ত্রান্তরাল সরিয়ে পূর্ণদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছেন।

কাব্যশাস্ত্রে 'থির বিজুরি' কথাটা অকম্পনের শোনা ছিলো, হঠাৎই মনে পড়ে গেল। আকাশের সৌদামিনী স্থির হলে কত নয়নমনোহর হয় জানা নেই। তবে যে রূপ সে দেখল, একমাত্র সেই আগুনের সঙ্গেই তার তুলনা করা চলে। পার্থক্য শুধু এই আগুন দহন করে না, দেয় শুধু আলো আর উষ্ণতা। কোনও কারণে যদিও সে আগুনের দীপ্তি খানিক নিষ্প্রভ।

সেই অলৌকিক অঙ্গশোভা সমগ্র নারীজাতি সম্পর্কে অকম্পনের এতাবৎ ধারণার আমূল পরিবর্তন করে দিল। যুবতী নারী শুধু কামনার বস্তু নয়, অকম্পন প্রত্যক্ষ করল সে পূজার বিগ্রহও হতে পারে। তদুপরি এই অকল্পনীয় ভ্রাতৃসম্বন্ধ। কৃতজ্ঞতায় ধন্য হয়ে অকম্পন নীরবে সম্মতি জানাল।

—তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি তো? মহারানি আবার প্রশ্ন করলেন।

—একথা কেন মনে করছেন মহারানি, অকম্পন শশব্যস্ত হয়ে বলল, আপনার স্বাস্থ্যে সত্যই চিন্তাজনক কিছু নেই।

—আমার স্বাস্থ্যের জন্য আমি আদৌ চিন্তিত নই। বৈদ্যরাজ ও তাঁর সামর্থ্যে আমার পূর্ণ আস্থা আছে, তোমাকে সে উদ্দেশ্যে ডেকে আনাইনি। ধ্রুবাদেবী একইভাবে গভীর দৃষ্টিতে অকম্পনকে জরিপ করে বললেন, শুধু সত্য বল, তুমি আমার বিশ্বাসভঙ্গ করবে না তো?

অকম্পন ঠিক করতে পারছিল না এ প্রশ্নের কি উত্তর দেওয়া শোভন হবে। অতি আয়াসে কুণ্ঠিত স্বরে শুধু বলতে পারল, আমাতে আপনি ভরসাস্থাপন করলে সে আমার সৌভাগ্য। জীবন দিয়েও তার মর্যাদা রাখব দেবি।

—আশ্বস্ত হলাম। তোমায় দেখে আমারও ধারণা হয়েছে, তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি। তারপর খানিক আত্মগত স্বরে ধ্রুবাদেবী বললেন, অবশ্য আমার আর কোনও উপায়ও নেই। আমার একটা কাজ করে দেবে, ভাই?

ধ্রুবাদেবী প্রশ্ন করে একটু থামলেন। তারপর আবার বললেন, একটা ভীষণ প্রয়োজনীয় কাজ, বলতে পারো, আমার জীবন আর মরণ নির্ভর করছে তার উপর।

অকম্পনের সামনে পৃথিবীটা যেন দুলে উঠল। এ কি শুনছে সে? এও কি সম্ভব, অকিঞ্চিৎকর এক নাগরিকের হাতে নির্ভর করছে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বরীর জীবন-মরণ? সে যোগ্যতা তার আছে নাকি? হঠাৎই মনে পড়ে গেল তার নিজের জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর কথা, দশ বৎসরাধিক কাল পূর্বেই যে অকম্পনের মায়া কাটিয়ে চলে গেছে অনেক দূরে।

—তুমি পারবে। অন্তর্যামিনী যেন অকম্পনের মনের অবদমিত প্রশ্নের উত্তর দিলেন, তোমাকে দেখেই বুঝেছি, তুমি পারবে। তোমার ঘোড়ায় চড়ার অভ্যেস আছে তো?

—আছে। আপনি আজ্ঞা করুন দেবি, অকম্পন কোনমতে বলল।

—সব কথা তোমায় এখন খুলে বলতে পারব না, যথাসময়ে তা জানতে পারবে। আপাতত একটা চিঠি গোপনে কুমার চন্দ্রকে পৌঁছে দিতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এখান থেকে বারো যোজন দূরে, মালবের কালান দুর্গে আছেন তিনি। কালিঙ্গড়ের নাম শুনেছ কি?

কালিঙ্গড়! নামটা অকম্পনের মনে একটা শিহরণ আনে। শিশুকাল থেকে এই জায়গার অনেক গল্প শুনেছে সে। কখনো সেই স্থান দর্শনের সুযোগ হয়নি। শোনা যায় গুপ্তরাজকুলের আদিপুরুষ শ্রীগুপ্ত এই দুর্গের পত্তন করেছিলেন। সে আজ শতাব্দীকাল আগের কথা।

একবার একদল উপজাতীয় দস্যুদল ঐ দুর্গ লুঠ করতে এসে ধরা পড়ে। সম্রাটের আদেশে সম্পূর্ণ দলটিকে এখানেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে নিকটবর্তী শিরি নদীতে সলিলসমাধি দেওয়া হয়। শিরি নদীকে তারপর থেকে কাল-নদী বা কালা-নৈ বলা হত। দুর্গের নামের উৎপত্তিও সেই থেকে। কালান গড়, অপভ্রংশে কালিঙ্গড়।

তারপর কলাবতী কাণ্ড! কথিত আছে বারাঙ্গনা কলাবতীর প্রেতাত্মাও নাকি সেখানে দেখা যায়। তৎকালীন গুপ্তসেনাপ্রধান উগ্রদেব তাঁর প্রণয়িনী কলাবতীকে কালান গড়ের বধ্যভূমিতেই হত্যা করেছিলেন। কলাবতীর অতৃপ্ত আত্মা তার প্রতিশোধ নিয়েছিল উগ্রদেবের নির্মম হত্যার মাধ্যমে।

এরকম কত কথা জড়িয়ে আছে কালান গড়কে কেন্দ্র করে। আশৈশব এইসব গল্প শুনে এসেছে অকম্পন। তাকে সেই কালানে যাবারই নির্দেশ দিচ্ছেন মহারানি।

—শুনেছি মহারানি। মহারাজ শ্রীগুপ্তের মূল জয়স্কন্ধাবার ছিল কালিঙ্গড়।

—ঠিক বলেছ। এখনও তা যুদ্ধের জন্যে ব্যবহার হচ্ছে। এখান থেকে অনেক দূর, প্রায় বারো যোজন! পথনির্দেশ অবশ্য আমি তোমাকে দিতে পারব না, তোমাকে সন্ধান করে যেতে হবে। কি, পারবে না?

বারো যোজন পথ ঘোড়ায় কখনও অতিক্রম করেনি অকম্পন। সে পথ অজানা এবং অবশ্যই বিপদসংকুল। তা সত্ত্বেও না বলার কথা ভাবতে পারল না সে।

—আপনার আশীর্বাদে নিশ্চই পারব দেবি। অকম্পনের কণ্ঠে সংকল্পের আভাষ।

—তোমাকে পারতেই হবে অকম্পন। শুধু তোমাকে, আর কেউ নয়। অতি প্রয়োজনীয় পত্র। দোহাই তোমার, যা হয় কোরো, কিন্তু দেখো চিঠিটা যেন কুমারের হাতে পৌঁছয়।

সম্রাজ্ঞীর কণ্ঠে আদেশ নয়, যেন এক অস্থির অনুনয়ের সুর। সেই সঙ্গে উপাধানের তলা থেকে একটি হরিৎবর্ণের পুলিন্দা বের করে অকম্পনকে বললেন, আমি তোমায় ভাই বলেছি, তোমারও নিশ্চয়ই বড় বোন আছে। তার কথা মনে করে আমার এই উপকারটুকু করে দাও, ভাই।

মোহাচ্ছন্নের মত অকম্পন নতজানু হয়ে প্রণাম করে পত্র গ্রহণ করল। জ্যেষ্ঠা ভগ্নী তার ছিল, এখন নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে আর এক অগ্রজাকে আবিষ্কার করে অকম্পন। এঁর আদেশও অমান্য করার কথা কল্পনা করতে পারে না সে।

এক মুহূর্তও আর সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না তার। অজানা পথ, অচেনা গন্তব্য। গৃহে একাকী মাতা, বন্ধুর বিবাহে যোগদানের প্রতিশ্রুতি। কোনও বাধাই আর তার মনে এল না। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এক করেও তাকে এই অসাধ্যসাধন করতে হবে, শুধু এইটুকুই এখন মনে হচ্ছে অকম্পনের। অস্ফুটস্বরে বলল, আপনি আশীর্বাদ করুন দেবি। আমি এখনই চললাম।

ধ্রুবাদেবী সস্নেহে একবার তাকে দেখে বললেন, দাঁড়াও, অত ব্যস্ত হোয়ো না। একথা সত্যি, প্রতিটা মুহূর্তই মূল্যবান, তবুও আজ রাতে বেরিও না। দিনমানে যাত্রা কোরো।

এ যেন সত্যই কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি জ্যেষ্ঠাভগ্নীর উদ্বেগপূর্ণ অনুদেশ। আর একবার আনত অভিবাদন জানাল অকম্পন। এ ভালই হল। কিছু প্রস্তুতির সময় পাবে সে। আর কামোদকের বিয়েতেও...

আরও কিছু কর্তব্য বুঝিয়ে দিলেন মহারানি। সব কথার অর্থ অনুধাবন না করলেও কথাগুলি মনে গেঁথে নিল অকম্পন। বিদায়কালে মহারানি বললেন, আমাদের যা কথা হল, সে সব কাউকে বোলো না।

তুমি প্রাসাদের পেছনের পথে বেরিয়ে যেও, বিশেষ কারও সঙ্গে দেখা হবে না। তোমার সঙ্গে রঙ্গিণী যাবে, দ্বারপ্রধানকে বুঝিয়ে তোমাকে পথ বলে দেবে। আর বৈদ্যরাজকে যা বলার, আমি বলে দেব। সাবধানে যেও ভাই, ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।

***

মধ্যাহ্নের পরেই প্রতিহারী এসে বিশঙ্কদেবকে জানাল, উপনায়ক দত্তসেন মহারাজের সাক্ষাৎপ্রার্থী। মহামাত্যের অনুমোদন চাই।

দত্তসেন উপসেনাপতি। লোকটা কর্মকুশল, কিন্তু তামসিক প্রবৃত্তির। ব্যবহারিক শিষ্টতায় নিপুণ, কিন্তু সে তার বহিরাবরণ। প্রকৃতিতে সে শঠ এবং ধূর্ত। মনে পাপ লুকিয়ে রাখে চাটুকারিতার ছদ্মবেশে। তাকে ঠিক পছন্দ করেন না বিশঙ্কদেব। কিন্তু এমন লোক অল্প সময়েই মহারাজের প্রিয়ত্ব অর্জন করে থাকে।

মহামাত্যের সম্মতি পেয়ে দত্তসেন কক্ষে প্রবেশ করল। নিজের উষ্ণীষ ও তরবারি নামিয়ে রেখে মহামাত্যকে অভিবাদন করে বলল, প্রণাম মহামাত্য। আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি।

দত্তসেনের বশংবদ আচরণে বিরক্তিবোধ করেন বিশঙ্কদেব। তার আগমনের হেতু জানাই আছে। মহারাজ রামগুপ্ত তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সম্রাটের সঙ্গে নিভৃত আলাপনে অস্ত্র ও শিরোভূষণ সঙ্গে নিয়ে যাওয়া বিধি নয়। নিম্নপদাধিকারীদের প্রাসাদের সিংহদুয়ারেই এইসব ত্যাগ করে আসতে হয়। দত্তসেন সাধারণ সৈনিক নয়, তার স্মরণলেখার বিধি মহামাত্যের অধিকারে সম্পন্ন হয়।

প্রহরীরা দত্তসেনের তল্লাশি নিল। তারপর বিশঙ্কদেব প্রশ্ন করলেন, অভ্যাগমনের উদ্দেশ্য?

—অজ্ঞাত। মহারাজের আদেশ।

—কোন লিখিত আদিলেখ?

—না।

—আপনি দেখি মহারাজের আদেশ অমান্য করেন না।

—আমি বিশ্বস্ত সৈনিক, ভদ্র। জ্যেষ্ঠের আদেশ পালন আমার ধর্ম। দত্তসেন এরপর দশনপংক্তি নিষ্কাশিত করে বলল, আর মহারাজের আদেশ অমান্য করার স্পর্ধা আমার নেই।

—মহারাজের একান্ত অনুগত আপনি। আপনার এই আনুগত্য কি শুধুই ধর্মরক্ষা?

—অবশ্য। আপনি কি আমার সততায় সন্দিহান, আর্য?

—মহারাজের প্রতিটি কার্যে আপনার শর্তহীন অনুমোদন পুরস্কৃত হয়েছে উপনায়ক, বিশঙ্কদেব গম্ভীর স্বরেই বললেন, অতিভক্তি সন্দেহের উদ্রেক করে বৈকি।

একথায় দত্তসেন স্পষ্টতই সন্তুষ্ট হল না। কিন্তু মনের ভাব তার জিহ্বায় প্রকট হয় না। একটু ভেবে নিয়েই যেন বলল, আমি আপনারও অনুগত মহামাত্য, আপনার আদেশও আমার শিরোধার্য।

বিশঙ্কদেব একটু কষায় হাসি হেসে বললেন, তাই নাকি? আমি আদেশ করলে আপনি তা পালন করবেন?

—অবশ্যই করব শ্রীমান।

—আমি মহারাজের বিরুদ্ধ আদেশ দিলে?

—সেক্ষেত্রে আমি অপারগ, মহারাজের আদেশই পালিত হবে। তবে তা আপনার অবগতির পরেই, দত্তসেন এবার দন্তবিকাশ করে বলল, কিন্তু আপনি ধর্মজ্ঞ। আমি জানি আপনি কখনোই এমন আদেশ দেবেন না।

দুরাত্মা পাষণ্ডটা আবার নির্লজ্জ স্পষ্টবক্তা! আর কথা না বাড়িয়ে হাতের ইশারায় বিশঙ্কদেব দত্তসেনকে অন্দরমহলে প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গদৃষ্টি হেনে দত্তসেন প্রাসাদ অভ্যন্তরে অদৃশ্য হল।

॥ ৪ ॥

অপরাহ্ন বেলা। মহামাত্য এসে বসেছিলেন তাঁর নিজ বাসগৃহ সংলগ্ন গোবিন্দমন্দিরের পিছনের খোলা চাতালটিতে। বৃক্ষলতা পূর্ণ জনবিরল এই স্থানটি তাঁর একান্তচিন্তার উপযুক্ত ক্ষেত্র।

বিশঙ্কদেবের সত্তরোর্ধ প্রাচীন। দেহে বার্ধক্য এসেছে বটে, কিন্তু তা জরাগ্রস্ত নয়। মাথায় কেশবিরলতার পরিপূরণ করেছে মুখমণ্ডলের নিষ্কলঙ্ক শ্মশ্রুগুম্ফ। মেদবিহীন শীর্ণ কায়ায় বলিরেখা তেমন চোখে পড়ে না। এখনও তাঁর পথ চলার বলিষ্ঠ ও ঋজু গতি যৌবনের বিভ্রম জাগায়। অকৃতদার বৃদ্ধ নিয়মিত যোগাভ্যাস ও প্রাণায়ামাদি করেন, সারাদিন রাজকার্যের দায়িত্ব সত্ত্বেও স্বপাকে একাহার করে থাকেন।

যুদ্ধজীবী রূপে তরুণ বয়সেই তিনি বিগত সম্রাটের সংস্পর্শে এসেছিলেন। দুর্ধর্ষ হূণদের বিরুদ্ধে রাজ্যের সুরক্ষায় মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তিনিও একসময়ে অস্ত্রধারণ করেছেন। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ নয়, মানুষের শান্তি ছিল তাঁর স্বপ্ন। আর্যনগরীর নানাবিধ উন্নয়নের পরিকল্পনা ছিল আকাঙ্ক্ষায়। মাহারাজ চিনেছিলেন তাঁর স্থপতিসত্তাকে, অল্পকালের মধ্যেই তাঁকে সমরাঙ্গণ থেকে অব্যহতি দিয়েছিলেন। নিযুক্ত করেছিলেন তাঁকে নগরায়নের অমাত্যরূপে। বিহঙ্গ পেয়েছিল তাঁর পাখা মেলার স্বাধীনতা।

বিশঙ্কদেব মহারাজকে তাঁর সিদ্ধান্তে অনুতপ্ত হবার সুযোগ দেননি। সাম্রাজ্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই তার সাক্ষ্য। পরিশ্রমে কার্পণ্য নেই, নিষ্ঠায় নেই ছল। প্রলোভনে পথভ্রষ্ট হননি কখনও। ব্রত উদযাপনেই নিমগ্ন ছিলেন বিশঙ্কদেব, দারপরিগ্রহেরও সময় পাননি।

আজ কিন্তু বিশঙ্কদেব বড় অসহায় বোধ করছেন। যুদ্ধসন্ধির কথা স্মরণ করে তিনি এখনো শিহরিত হচ্ছেন।

স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, পরলোকগত মহামহারাজের আদর্শ ও প্রেরণায় তিল তিল করে যে স্বর্গরাজ্য এতকাল গড়ে উঠেছিল, আজ তা এক ভয়াবহ সর্বনাশের সম্মুখীন। একটা কালবৈশাখির ঝড় আসছে, তাঁর অন্তরাত্মা বলছে। কিন্তু কালের গতি রোধ করার সামর্থ নেই তাঁর। প্রয়াত মহারাজের স্নেহচ্ছায়ার অভাব বড় বেশী করে অনুভূত হচ্ছে।

মনে পড়ে বর্ষণমুখর সেই ভয়ানক রাত্রি। প্রকৃতিদেবী বোধহয় সাম্রাজ্যের ইন্দ্রপতনে অনাথ হয়ে যাবার আশংকায় পূর্বাহ্লেই অশ্রুপাত শুরু করেছিলেন।

রোগশয্যায় শায়িত মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত। সে রাত্রে তাঁর স্বাস্থ্যে কিঞ্চিৎ স্থিতিশীলতা এসেছিল। কয়েকদিন প্রায় সংজ্ঞাহীন থাকার পর মহারাজ চেতনায় ফিরেছিলেন। পুত্রেরা সুদূর উজ্জয়িনীতে। বিশঙ্কদেবই ছিলেন তাঁর শয্যাপার্শে, কিন্তু গত কয়েকদিনের বিনিদ্র রজনী তাঁর দু'চোখে নিয়ে এসেছিল কালঘুমের আচ্ছন্নতা। নিদ্রাবেশ দূর হল মহারাজের কণ্ঠস্বরে, জাগো বিশঙ্ক, একবার জাগো।

—কি হয়েছে মহারাজ? আপনার কষ্ট কি আবার বৃদ্ধি পেল? অতর্কিত তন্দ্রাভঙ্গে চমকিত হয়ে বিশঙ্কদেব জানতে চান।

—না বিশঙ্ক, আমি ভাল আছি। অন্তত আরও কিছুক্ষণ আছি। এইবেলা তোমাকে কিছু বলে যেতে চাই।

মহারাজ তাঁর বিশ্বস্ত অবলম্বনের সন্ধানে হাত প্রসারিত করলেন। বিশঙ্কদেব সাগ্রহে ধরলেন সেই হাত। মহারাজ বললেন, সারাজীবন অনেক সংগ্রাম করলাম। জানি না মহাকালের কি ইচ্ছা। কিন্তু রাজার প্রধান কাজটুকু তো করে যেতে পারলাম না বিশঙ্ক?

—এ আপনি কি বলছেন মহারাজ? আপনি অক্ষয়কীর্তি, আগামী যুগযুগান্তের ইতিহাস আপনার জয়গান করবে।

—কিন্তু এই রাজ্যের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী তো আমি দিয়ে যেতে পারলাম না বিশঙ্ক। এই আক্ষেপ নিয়েই আমাকে চলে যেতে হবে। বিশঙ্ক, তুমি আমার অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করবে কি?

—এমনভাবে বলবেন না দেব। আমার দেহে প্রাণ থাকতে আপনার ইচ্ছার অমর্যাদা হতে দেবো না।

—তাহলে শোন। রামগুপ্তের হাতে এই সিংহাসন সমর্পণ করো না। চন্দ্রগুপ্ত যেন এ রাজ্যের ভার নেয়। আমি প্রকাশ্যে এই ঘোষণা করে যেতে পারলাম না। কিন্তু বিশঙ্ক, এই জেনো আমার অন্তিম ইচ্ছা।

—আপনি অতি শীঘ্র সুস্থ হয়ে উঠবেন মহারাজ। নিজমুখে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় আপনি সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী চয়ন করে যাবেন। বিশঙ্কদেব অতিকষ্টে উচ্চারণ করেন।

মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসির রেখা, আমার জীবনীশক্তির ইন্ধন শেষ হয়ে এসেছে বিশঙ্ক, তোমার সাহায্য ব্যতীত এ কাজ আমার

অসমাপ্তই থেকে যাবে, তারপর তাঁর কণ্ঠস্বর ম্লান হয়ে এল। যেন নিজের মনেই বলছেন, কিন্তু তুমিই বা কিভাবে এই কাজ করবে? পুরোহিতকে বোলো, সেনাপতির সাহায্য নিও... একবার চেষ্টা কোরো বিশঙ্ক... যদি সফল হও...

মহারাজের কণ্ঠ ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে তলিয়ে গেলো সুষুপ্তির গর্ভে। তাঁর সে নিদ্রাভঙ্গ আর হয়নি। শেষরাত্রে বর্ষণ হয়েছিল। উষার অরুণকিরণ তখনও ছিল অনুপস্থিত। বিশঙ্কদেবের হাতে হাত রেখে ব্রাহ্মমুহূর্তের সেই পুণ্যলগ্নে মহামহারাজ সমুদ্রগুপ্তের অমরাত্মা নশ্বর শরীরের মায়া ত্যাগ করে অমৃতলোকের পথে যাত্রা করে।

মহামহারাজের প্রয়াণের সে রাত্রের কথা মনে এলে এখনও বিশঙ্কদেব আতঙ্কিত হন।

সম্রাট রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর অন্তিম ভাবনা স্বয়ং তাঁকে বলে গিয়েছেন। কিন্তু পৃথিবীতে তার আর কোন সাক্ষ্য নেই। সরাসরি রামগুপ্তকে সে কথা বলে তাঁর অভিমানে আঘাত করতে পারেননি বিশঙ্কদেব। তদ্ভিন্ন আর যাবতীয় উপায়ে মহারাজের অন্তিম ইচ্ছা তিনি পূরণ করতে তৎপর হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রয়াস ফলপ্রসূ হয়নি।

পর্বতপ্রমাণ ব্যক্তিত্বের সহসা অনুপস্থিতি ধরিত্রীর বুকে এক অপার্থিব শূন্যতা সৃষ্টি করে। সে শূন্যতা সহজে পূরণ হবার নয়। দিশাহীনতায় আরও বেশী করে যেন মনে পড়ে নায়কের অনুপস্থিতি। বিশঙ্কদেব সর্বদাই প্রয়াত মহারাজের আদর্শ, উপদেশ ও পন্থা স্মরণ করে প্রেরিত হতে চান। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বড় বিপরীত।

সেই রামগুপ্ত! ছোট থেকে বয়ঃপ্রাপ্ত হতে দেখেছেন বিশঙ্কদেব। স্বহস্তে অশ্বারোহণের অনুশীলন করিয়েছেন। যতদূর সম্ভব স্নেহ দিয়েছেন। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই এক অপরিশীলিত ঔদ্ধত্য ছিল রামগুপ্তের।

যুদ্ধবিগ্রহের স্বল্পাবসরে কখনও কখনও সমুদ্রগুপ্ত উদ্বিগ্ন হয়েছেন জ্যেষ্ঠকুমারকে নিয়ে, উগ্রভাবে শাসন করতে চেয়েছেন পুত্রকে। কিন্তু ফল হয়েছে বিপরীত। বয়স্য বিশঙ্কদেব তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, এ অল্পবয়সের প্রভাব মহারাজ। একটু পরিপক্কতা আসুক, দেখবেন কুমার ঠিক দায়িত্বশীল হয়ে যাবেন।

তা হয়নি। অদৃষ্টের খেলা। আজ সে রাজা। আর তাকে হাত ধরে পথনির্দেশ দিতে পারেন না বিশঙ্কদেব। তাঁর পরামর্শেরও আর কোনও মূল্য নেই রামগুপ্তের কাছে। অতঃ কিম?

বিশঙ্কদেব যেন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছেন। সম্মুখে এ পবিত্র রাজকুলের এক কলঙ্কময় সন্ধিপ্রস্তাবের রাজাজ্ঞা, যা তিনি জীবন থাকতে অনুমোদন করতে পারেন না। তাই কেবলই মনে হয়, আর কেন? সময় সমাপ্তপ্রায়। নিজের তুচ্ছ নশ্বর প্রাণের কোনও আসক্তি নেই বিশঙ্কদেবের। কিন্তু মহারাজের শেষ ইচ্ছা এখনও অপূর্ণ আছে যে! বিড়ম্বিত এ জীবন উৎসর্গ করেও যদি সে ইচ্ছাপূরণ হয়, তিনি প্রস্তুত। কিছুই কি করা যায় না?

এসময়ে চন্দ্রগুপ্তকে কাছে পেলে হয়তো কিছু লাভ হত। কিংবা হত কি? জ্যেষ্ঠের আদেশের আগে তারই বা কি করার আছে?

কিন্তু দত্তসেন আজ কি উদ্দেশ্যে আহূত?

এই লোকটা এক নরাধম। প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞায় কৃত্রিম চাটুবাক্যের প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত। সেটা লোকটার নীচ কুলজাত অশিক্ষার জ্ঞাপক। অস্বাভাবিক নয়, এর পিতৃপরিচয় অজ্ঞাত। মাতা মহাকাল মন্দিরে সেবাদাসী ছিল। লম্পট পিতার উত্তরাধিকারসূত্রে দত্তসেনের শোণিতে এসেছিল উদ্দাম উচ্ছৃংখলতা ও দুর্বিনীত ঔদ্ধত্য।

বিশঙ্কদেব তিক্ততায় চক্ষু মুদ্রিত করলেন। কিন্তু তাঁর কুঞ্চিত ভ্রূরেখা সরল হল না। অশান্ত চিত্তাকাশে যুক্ত হল নতুন ভাবনার জলদরেখা। এই অসময়ে দত্তসেনকে মহারাজের কি প্রয়োজন বিশঙ্কদেব তা জানেন না। কিন্তু দুই অশুভ শক্তির সমন্বয়ের ফল খুব শুভ যে হবে না, তা অনুমান করেই তাঁর স্বস্তি বিঘ্নিত হল।

বিশঙ্কদেবের পুনর্বার মনে এলো রাবেলার কথা। প্রতিবার দত্তসেনকে দেখলেই বিশঙ্কদেবের একবার মনে পড়ে বিশ বছর আগের সেই অভিশপ্ত রাত্রির নারকীয় ঘটনা।

রাবেলা ছিল হূণ। কিন্তু হূণজাতির স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষতা তার ছিল না। সরল ও অনুগত রাবেলার জন্য বিশঙ্কদেবের মনে কিছু দুর্বলতা ছিল। তার পরিবারকে তিনি দীর্ঘদিন পালন করেছেন। সেই রাবেলার জীবননাট্যের মর্মান্তিক পরিসমাপ্তিতে খলনায়ক ছিল এই দত্তসেন!

হূণরা হল অল্পবুদ্ধি প্রজাতি। দেহে বলশালী, চরিত্রে নৃশংস, কিন্তু মস্তিষ্কের তেমন বালাই নেই। তারা যখন বড় দলে সংঘবদ্ধ হয়ে আক্রমণ করত, সম্রাট তাদের দমন করতেন সমরাঙ্গনে। কিন্তু তাছাড়া আরও একটি কারণে তারা সভ্যসমাজের শিরঃপীড়ার কারণ ছিল। তা হল সময়-অসময়ে হূণদের ছোটখাটো এক একটি গোষ্ঠীও অকস্মাৎ নাগরিকদের হরণ-লুণ্ঠন ও নিগ্রহের উদ্দেশ্যে উদয় হত। সম্রাটের সৈনিক অবশ্য সতর্কই থাকত, তাই এদের দৌরাত্ম্য খুব বেশীক্ষণ স্থায়ী হত না। অল্পকালের মধ্যেই তাদের কচুবন কাটার পরে যে দশা হয় সেই অবস্থাই হত। একটি হূণও রক্ষা পেত না। রক্তাক্ত রাজপথ ভিস্তির জলে ধুয়ে আবার স্বভাবিক নগরজীবন শুরু হয়ে যেতো। দুই-চার দিনের মধ্যেই নাগরিকেরা এই খণ্ডযুদ্ধের কথা বিস্মৃত হতো। সম্ভবত হূণরাও, কেননা ছয় মাসের মধ্যেই আবার হয়তো এইরকম একটি আক্রমণ হত।

তখন সদ্যসমাপ্ত এক হূণদলের আক্রমণ বিধ্বস্ত হয়েছে। খণ্ডযুদ্ধের শেষে রাবেলা এসে পড়েছিল মহামাত্য বিশঙ্কদেবের অঙ্গনে। রাবেলা হূণ, দলে পড়ে নগরী লুটতে এসেছিল। কিন্তু সম্রাটের সৈনিকের শাণিত তরবারি বড়ই নির্মম। তার সম্মুখে রাবেলার সব বিক্রম অন্তর্হিত হয়েছে। কোনমতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে সে বিশঙ্কদেবের শরণাপন্ন হয়।

রাবেলার শরীরের গঠন বিশাল, কিন্তু কোনও কারণে হূণের প্রকৃতিগত উগ্রতা তার ছিল না। ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহে পালাবার পথে বিশঙ্কদেবের আবাসে প্রবেশ করে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে রোদনোচ্ছ্বাসে বলেছিল, ওরা মেরে ফেলবে ঠাকুর। আমাকে বাঁচাও।

যে কোনও কারণেই হোক, এই হূণ যুবকটির দুর্দশা বিশঙ্কদেবের দয়ার উদ্রেক করল। তাঁর করুণায় রাবেলা আশ্রয় ও রক্ষা দুই-ই পেল। তিনি আপন গৃহের গুপ্তকক্ষে রাবেলাকে লুকিয়ে সম্রাটের সৈনিকদের দুয়ারেই প্রতিহত করেছিলেন। বিশঙ্কদেবের এখনও মনে আছে, ঘাতকদলের নেতৃত্বে ছিল আজকের সেনাদলের উপনায়ক দত্তসেন। তখন সে সামান্য সৈনিক। বিশঙ্কদেব তাদের বলেছিলেন, কোনও হূণকে তিনি আশ্রয় দেননি। তাঁর কথায় সৈন্যদল ফিরে গিয়েছিল, সম্মানীয় অমাত্যের বাসগৃহে প্রবেশ করে অনুসন্ধানের স্পর্ধা দেখাতে পারেনি দত্তসেন।

হূণকেশরী সমুদ্রগুপ্তের কাছে এ সংবাদ অবশ্য গোপন থাকেনি। তিনি একান্তে বিশঙ্কদেবকে ডেকে দুগ্ধ-কদলী যোগে কালসর্প পালনের প্রবাদবাক্যটি স্মরণ করিয়ে মৃদু ভর্ৎসনা করেই বলেছিলেন, এ তুমি কি করেছ বিশঙ্ক? হূণকে আশ্রয় দিলে?

বিশঙ্কদেব মহারাজকে আশ্বাস দিয়েছেন, রাবেলা অবিশ্বাসী নয়। আমি দায়িত্ব নিলাম মহারাজ।

হূণের রক্তে মহারাজের আস্থা ছিল না, কিন্তু বিশঙ্কদেবের বিবেচনার প্রতি ছিল। সমুদ্রগুপ্ত রাবেলার পুনর্বাসনের বিরুদ্ধে আর হস্তক্ষেপ করেননি।

বিশঙ্কদেবের কৃপায় রাবেলা নবজীবন লাভ করেছিল। হূণেরা স্বভাবত স্বল্পবুদ্ধি এবং রাবেলা ততোধিক হীনবীর্য হলেও তার কৃতজ্ঞতাবোধের অভাব ছিল না। প্রাণদাতার প্রতি অনন্য ভক্তিতে সে বিশঙ্কদেবের একান্ত অনুগত সেবকে পরিণত হল। মহামাত্য নিবাসের অনতিদূরে এক গৃহ নির্মাণ করে সে বসতি শুরু করে। এক অনাথিনী ব্রাহ্মণকন্যার সঙ্গে ঘর বাঁধে। তাদের এক কন্যাও হয়। তার মায়ের ইচ্ছায় কন্যার নামকরণ হয়েছিল বিষ্ণুমালতী। পিতার গাত্রবর্ণ ও মায়ের অনিন্দ্য মুখশ্রী নিয়ে ফুটফুটে মেয়েটি ছিল রাবেলার নয়নমণি।

দুর্দান্ত হূণের এই মার্জারশাবকের মতো শিষ্ট আচরণে সকলেই আশ্চর্য হয়েছিল। প্রতিবেশীরা তাঁকে তৃণভোজী শার্দূলের উপমা দিয়ে উপহাস করত। হূণরক্তের কলঙ্ক বলে তার জন্ম নিয়েও কটাক্ষ করা হত। কিন্তু রাবেলার তাতে কোনও বীতরাগ ছিল না। হি হি করে হাসত, সুখী গার্হস্থ্যে সযত্নে স্ত্রী-কন্যার ভরণপোষণ করতো আর বিশঙ্কদেবের একনিষ্ঠ সেবায় মগ্ন থাকত।

রাবেলা বিশঙ্কদেবের আশ্রয়ে আসার পরে তিন বৎসর অতিক্রান্ত

হয়। রাবেলা তার হূণত্ব ও প্রতিবেশীরা তার জাতিমূলগত বিরাগ প্রায় বিস্মৃতই হয়েছে। এমন সময় হঠাৎই এক অশুভ মুহূর্তে সব ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

নগরীতে হূণদমনের আর এক অভিযান চলছিল। অকস্মাৎ এক রাত্রিতে দত্তসেন সসৈন্যে রাবেলার গৃহে হানা দেয়। তাকে নিদ্রিত অবস্থা থেকে গৃহের বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। হতভাগ্য রাবেলা বা তার স্ত্রী বাধা দেওয়ার সময় পায়নি। নিদ্রাতুর শিশুকন্যা কিছু জানতেই পারেনি।

একটা হূণকে হত্যার অপরাধে কোনও দণ্ড হয়নি দত্তসেনের। বিশঙ্কদেব কিন্তু এই নৃশংস ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। রাবেলার স্ত্রী ও কন্যার দুর্ভাগ্য তিনি রোধ করতে পারেননি। তাই এই দুর্ঘটনার পরে আরও দশ বছর তিনি সেই অনাথিনী ও তার কন্যার ভরণপোষণ করেন।

ভস্মাচ্ছাদিত অঙ্গার বায়ুতাড়িত হয়ে অগ্নিমুখ হয়। বিষ্ণুমালতীর দেহসৌন্দর্যও দিনে দিনে প্রস্ফুটিত হতে থাকে। তারপর একদিন তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। দ্বাদশ বর্ষীয়া বিষ্ণুমালতীর হূণরক্ত তারপর দপ করে জ্বলে ওঠে। সে হারিয়ে যায় অন্ধকার জগতে।

বহুকাল হয়ে গেছে বিশঙ্কদেব আর তাঁর সন্ধান পাননি। তারপর এই গত আশ্বিন মাসে নৃত্যসভায় এক নর্তকীর নৃত্যানুষ্ঠানে বিদ্যুচ্চমকের মত তাঁর মনে পড়েছিল বিষ্ণুমালতীর কথা। কি যেন নাম সেই নর্তকীর? আজ কিছুতেই আর মনে করতে পারছেন না তিনি। কিন্তু সেদিন তাকে দেখেই তিনি চিনেছিলেন নর্তকীর ছদ্মবেশধারী নারীটির অতীতকে।

সে বিষ্ণুমালতী। পরে তিনি অনুসন্ধানে জেনেছিলেন সেদিনের নিষ্পাপ হূণবালিকা আজ নগরীর অন্যতম প্রধান হট্টবিলাসিনী। বিষ্ণুমালতী নাম এখন তার মুছে গেছে। কিন্তু বিশঙ্কদেবের অভিজ্ঞ চক্ষুতে সে ধরা পড়ে গিয়েছিল। যুবতী হয়ে ওঠার প্রাক্কালে দশটি বছর সেই বালিকা ছিল বিশঙ্কদেবের তত্ত্বাবধানে। তাকে চিনতে কি তাঁর ভুল হয়?

কিন্তু কালপ্রভাবে অন্তঃকরণের পুরাতন বন্ধন ততদিনে শিথিল হয়ে গেছে। এক নগরনটীর প্রতি মহামাত্য বিশঙ্কদেব আর আকর্ষণ বোধ করেননি। কিন্তু অতীত মুছে যাবার নয়।

আজ এই অস্থির মুহূর্তে বিশঙ্কদেবের মনে এলো সেই নর্তকীর কথা। তার বর্তমান নামটি কিন্তু আর কিছুতেই স্মরণ করতে পারছেন না বিশঙ্কদেব। পাপিষ্ঠ দত্তসেনের সঙ্গে মহারাজের মন্ত্রণা চলছে। তার ফল অশুভই কিছু হবে নিশ্চয়। বিষ্ণুমালতী যদি তার অতীত জানতে পারে, তা হলে এই দত্তসেনের কুঅভিপ্রায় রোধ করা হয়তো সম্ভব।

দত্তসেনের অপসারণ! অন্তত এই কাজটি বিশঙ্কদেবকে করে যেতে হবে। কিন্তু কিভাবে? হাতে যে সময় বড় অল্প। মনে হল আজই বিষ্ণুমালতীকে তার অতীত অবগত করাবার সময় এসেছে!

এই সময়ে বিশঙ্কদেবের চিন্তাসূত্রে বাধা পড়ল। এক প্রতিহারী এসে জানাল, রাজপুরী থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবক নিষ্ক্রান্ত হতে চাইছে। তাকে অনুমতি দেওয়া হবে কি?

বিশঙ্কদেবের মস্তিষ্কে তখনও বিষ্ণুমালতীর বর্তমান নামটির অনুসন্ধান চলছিল। অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করলেন, ওহে, তোমাদের সেই নগরনটীর কি নাম বলত প্রহরি?

মহামাত্যের মুখে কাজের বেলা এই প্রশ্নের জন্য প্রহরীটি প্রস্তুত ছিল না। হতবুদ্ধি হয়ে তার মুখে কথা সরল না। বিস্মিত সংশয় প্রশ্নচিহ্ন হয়ে তার মুখচ্ছবিতে ফুটে উঠলো।

বিশঙ্কদেব আবার বললেন, আরে বল না হে, ঐ গত আশ্বিনে যে নর্তকী রাজসভায় নৃত্য প্রদর্শন করে, তার নামটা কী?

প্রতিহারী বয়সে তরুণ। রাজনর্তকী তার আয়ত্তের বাইরে হলেও, তাদের সংবাদ সে বিলক্ষণ রাখে। কিন্তু মহামাত্যের সমক্ষে সে আলোচনা গর্হিত কাজ হতে পারে ভেবে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলে, আপনি কি নটী নীলাঞ্জনার কথা জানতে চাইছেন, দেব?

নীলাঞ্জনা! অলক্ষ্য থেকে বিশঙ্কদেবের স্মরণপথে আবির্ভূত হল এই নাম। নীলাঞ্জনা, বিষ্ণুমালতীর ছদ্মনাম। আর ভুল হবে না। বিশঙ্কদেব এবার প্রতিহারীকে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু যাক সে কথা। এখন বল কী বলতে এসেছ?

প্রতিহারী তার পূর্ব প্রশ্নের পুনরুক্তি করল। সঙ্গে যুক্ত করে দিল, নিজেকে সেই যুবক বৈদ্যরাজের শিষ্য বলে পরিচয় দিয়েছে।

বিশঙ্কদেবের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। বৈদ্যরাজের শিষ্যকে সন্দেহ করা কেন? অবশ্য কিছুপূর্বেই মহারাজের আজ্ঞানুসারে প্রাসাদদ্বার নির্গমনকালে যেকোনও অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশেষ অনুমতি নেওয়ার আদেশ তিনিই দিয়েছেন। প্রতিহারীকে তাই বললেন, সে প্রাসাদে প্রবেশ করে কীভাবে?

—বৈদ্যরাজের সহকারী রূপে সে এসেছিল।

এ কথা শোনার পরেও যুবককে সন্দেহ করার অর্থ আচার্য প্রভাকরের সততায় সন্দিহান হওয়া। তিনি জানেন সে সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ব্যাপারটিতে তিনি কৌতূহল বোধ করলেন। তাই বললেন, ভবনের বহির্কক্ষে যুবককে আমার সমক্ষে নিয়ে এসো। আর শোন, চমূকে বল এখনি আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে।

চমূ কিম্পুরুষ, কিন্তু বুদ্ধিমান। বিশঙ্কদেবই তাঁকে অন্দরমহলে উপ্ত করেছিলেন কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে। প্রতিহারী অভিবাদন করে প্রস্থানোন্মুখ হল। তাকে সম্বোধন করে পুনরায় বিশঙ্কদেব বললেন, ওহে প্রহরি, আর একটা কাজ। সারথিকে বল শকট প্রস্তুত করে রাখতে। একবার নগরীতে যাব।

পুনরাভিবাদন করে প্রতিহারী চলে গেল। বিশঙ্কদেবও গাত্রোত্থান করলেন, বহির্কক্ষে যাবেন। কিন্তু তাঁর মুখে মেঘ-রৌদ্রের খেলা। মস্তিষ্কে একটা দৃঢ়সংকল্পের প্রস্তুতি চলেছে। হাল ভাসিয়ে দেওয়ার আগে যেন বাতাসের গতি বুঝে নিচ্ছেন।

কালো মেঘের কোলে কি দেখা গেল কোন অশনি-সঙ্কেত?

***

উপসেনাপতি দত্তসেন এসে মহারাজকে অভিবাদন করে বললেন, আদেশ করুন মহারাজ।

দত্তসেনের কণ্ঠস্বরের এই আত্মপ্রত্যয় মহারাজকে প্রসন্ন করে। তবুও রামগুপ্ত দত্তসেনকে একবার আপাদমস্তক দেখে বললেন, আশা করি আমি তোমার প্রতি আস্থা রাখতে পারি?

রাজ্যের সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে, দত্তসেন তাই এখন নগরীর সুরক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত। সে কর্মশক্তিসম্পন্ন উদ্যমী পুরুষ। চারিত্রিক অনুশাসন তার ছিল না। ছন্নছাড়া জীবন তাকে পরিশীলিত করেনি, কিন্তু একটা হঠকারী দুঃসাহসের অধিকারী করে তুলেছিল। তদুপরি সে উচ্চাভিলাষী, অন্তরে মগধে সিংহাসনের স্বপ্নও সে সযত্নে লালন করত। আপন উদ্দেশ্যসাধনে সে সবরকম পন্থা অবলম্বন করতে প্রস্তুত, স্বীয় জীবনের নিমিত্ত অনাবশ্যক শংকাও তার ছিল না।

বর্তমানে তার একমাত্র অভিপ্রায় মহারাজের দৃষ্টিতে নিজের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করা। সুখের বিষয়, দত্তসেন মহারাজ রামগুপ্তের সুনজরে আছে। তাই একটু ক্ষুব্ধস্বরে সে নিবেদন করল, আমি কি অজান্তে মহারাজের অপ্রসন্নতার কোন কারণ ঘটিয়েছি?

—না, সে কথা নয়, কিন্তু এখন সময়টা এমনই যে কারওর প্রতি যেন বিশ্বাস করতে পারি না। মহারাজ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত স্বরে বললেন, রাজ্যের চতুর্দিকে এখন সন্দেহজনক চরের আনাগোনা,—এই দেখো না, মহারানির অসুস্থতার অজুহাতে বৈদ্যরাজ তাঁর এক শিষ্যকে আজ প্রাসাদে নিয়ে এসেছেন। সেও যে গুপ্তচর নয় কে বলতে পারে? আচার্য মিশ্র মাঝে আছেন, সেইটুকুই যা আশ্বাস...

—আপনি আদেশ করুন মহারাজ, আমি এখনই ব্যবস্থা নিই।

—না না, মহামাত্য সেদিক সামলাবেন। তোমাকে আমার অন্যত্র প্রয়োজন, এবং আমি জানি তুমি আমাকে নিরাশ করবে না। তোমায় কি জন্য ডেকেছি জানো?

দত্তসেন নীরবে মাথা দুলিয়ে না বললেন। মহারাজ বললেন, তোমাকে এক গুরুদায়িত্ব দিচ্ছি। কাল তুমি কালান দুর্গে যাবে। তোমার উপর আমার পথের কাঁটা অপসারনের ভার দিলাম।

পথের কাঁটা! মহারাজের পথের কাঁটা—কে সে? দত্তসেনের চকিত দৃষ্টিতে আশা ও আশঙ্কার দোলাচল। মহারাজ একটু থেমেই বললেন, এই কাজ তোমাকে করতে হবে একান্ত সঙ্গোপনে। তোমার সবচেয়ে

নির্ভরযোগ্য গুপ্তচরকে এই কাজে নিয়োগ করো। কিন্তু সবচেয়ে ভাল হয় যদি তুমি এই কার্যোদ্ধার করতে পারো নিজের হাতে, আর কারো ওপর নির্ভর না করে।

মহারাজের কথায় যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত নিহিত ছিল, দত্তসেন নিক্তির তৌলে যেন তাকে ওজন করে নিতে চায়। মহারাজের অভিপ্রায় সে অনুমান করতে পারে, কিন্তু সে সম্ভাবনার কথা মুখে উচ্চারণ করতে পারল না। তার সপ্রশ্ন উৎকণ্ঠা মহারাজের দৃষ্টি এড়ায়নি, কিন্তু সরাসরি সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন, পন্থা তুমি নিশ্চিত করো। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দাও আমার আদেশ তুমি পালন করবে। কাকপক্ষীতে যেন টের না পায়, তোমাকে একটি গুপ্তহত্যা করতে হবে।

দত্তসেনের দৃঢ়সংবদ্ধ চোয়ালে সংকল্পের আভাস। আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সে বলল, আপনার আদেশ অবশ্যই পালিত হবে মহারাজ। আপনি শুধু আমাকে তার নাম বলুন।

রামগুপ্ত তার বাহু আকর্ষণ করে বললেন, এসো, সব বলছি...এই বলে দুটি প্রস্তরাসনে তাঁরা মুখোমুখি বসলেন। মন্ত্রণা শুরু হল।

॥ ৫ ॥

সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের মুহূর্তটি অকম্পনের নিস্তরঙ্গ জীবনে নিয়ে এসেছিল এক অভূতপূর্ব আলোড়ন। এ যেন এক স্বপ্নের অনুভূতি! বিদায় নেবার পরেও বারংবার এই অসাধারণ রমণীর স্মৃতি ফিরে আসছিল মনে। তিনি শুধু রানি বলেই নয়। দশ বছর আগে অকম্পন তার ভগিনীকে হারিয়েছিল। কেবলই মনে পড়ছিল অকম্পনের সেই দিদির কথা। আজ ইশ্বর কি তাকেই আবার ফিরিয়ে দিলেন? ধ্রুবাদেবীর স্নেহময়ী ভগিনীরূপ কখন যেন তার হৃদয়মন্দিরে দেবতার বেদীতে স্থান করে নিয়েছে।

যে কাজের দায়িত্ব সে পেয়েছে, তার গুরুত্ব কতখানি হতে পারে সে সম্বন্ধে কোনও ধারণা ছিল না অকম্পনের। তাই তখনই সে চিন্তা তার মাথায় এলো না। ভারত সম্রাজ্ঞীর দেবদুর্লভ দর্শন সে পেয়েছে, এই অসম্ভব ঘটনাটির সঠিক অনুধাবনেই তার পুলকিত মন বারংবার রোমাঞ্চিত হচ্ছিল।

অকম্পন তখনও জানে না, আজকের দিনটিতে তার জীবন কোন পরিণতির পথে মোড় নিল।

মহারানির কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ডানহাতি অলিন্দের শেষে এসে অকম্পন দেখে এ যেন মায়াপুরী! এরপর কোন পথে যেতে হবে কিছুই তো জানা নেই। সেইখানে দাঁড়িয়েই এদিক ওদিক দেখছে যদি কোনও নিশানার সন্ধান পাওয়া যায়, এমন সময় সে পিছন থেকে শুনতে পেল কে যেন বলছে, ওদিকে নয় ঠাকুর, এদিকে এসো আমার সঙ্গে...রঙ্গিণী প্রেরিত হয়েছে অকম্পনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু পথ দেখবে কে? অকস্মাৎ উজ্জ্বল আলোয় যেমন দিকভুল হয়ে যায়, রঙ্গিণীকে দেখে মুহূর্তকালের জন্য সেইরকম আচম্বিত রয়ে গেল অকম্পন।

রঙ্গিণীর বরতনু জুড়ে উচ্ছ্বলিত যৌবনের প্রাণবন্ত প্রকাশ। কিন্তু এ উচ্ছ্বাস দু'কূল ভাঙ্গা বন্যার প্লাবন নয়, সম্ভ্রম উদ্রেককারী গর্জমান জলপ্রপাতের মতো প্রকৃতির বুকে একটি স্থিরচিত্র যেন। রঙ্গিণীর বয়স অকম্পনের চেয়ে কিছু বেশি, কিন্তু তা যৌবনের মধ্যগগন অতিক্রম করেনি। আলম্ব বেণিবন্ধন দুইহাতে ধরে চোখের ইশারায় তাকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দিল রঙ্গিণী। নির্দেশ নয়, সে যেন আদেশ। রঙ্গিণীর সুগঠিত তনুলতা হিল্লোল তুলে আহ্বান জানাচ্ছে, পুরুষের সাধ্য কি সে আহ্বান উপেক্ষা করে? অকম্পন আবিষ্ট হয়ে তাকে অনুসরণ করলো।

অবশ্য রমণীর দেহলতায় আবিষ্ট হয়নি অকম্পন। তার মস্তিষ্কে আবর্তিত হচ্ছিল মহারানির কথাগুলি। এক অজানা আশঙ্কায় আবিষ্ট ছিল সে।

অকম্পন যখন সন্তর্পণে ফিরে আসছিল, মহারানি আবার তাকে সম্বোধন করে বলেছেন, ভাই, তোমাকে যে কাজের ভার দিলাম, তা কিন্তু খুবই বিপজ্জনক। গোপনীয়তা রক্ষা না হলে তোমাকে অনেক অজানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে। এতে তোমার প্রাণও বিপন্ন হতে পারে। একথা জেনেও তুমি এ কাজে যাবে তো?

অকম্পন সে কথার কোন উত্তর দিতে পারেনি। বলতে চেয়েছিল, তোমার আজ্ঞার সামনে না বলার আগে আমার যেন মৃত্যু হয়। কিন্তু কণ্ঠে তার স্বরোদ্গম হয়নি। স্তব্ধ হয়ে শুনেছিল মহারানি বলছেন, তুমি নিষেধ করলে অবশ্য আমার কিছু করার নেই। আর দ্বিতীয় কোন পন্থা না থাকায় তোমাকে এই অনুরোধ করছি ভাই। কিন্তু তোমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে আমিও সঙ্কুচিত হচ্ছি। তাই জেনো এ আমার কোন আদেশ নয়, শুধুই অনুরোধ। আমার এই কাজ তুমি করবে কিনা, সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা তোমার রইল। এর অন্যথায় তোমার কোন শাস্তি হবে না।

—আর আমাকে অপরাধী করবেন না দেবি। অকম্পন অনুনয় করে বলেছে, আমাকে আপনার আদেশের যোগ্য বিবেচনা করেছেন, এতেই আমি ধন্য হয়েছি। যদি আমার এ তুচ্ছ জীবন তাতে উৎসর্গ হয়, তাহলে আমার কোন আক্ষেপ থাকবে না।

—জানতাম তুমি এই কথাই বলবে, কিন্তু বিশ্বাস রেখো, নিতান্ত অনন্যোপায় হয়ে আমি তোমাকে এই কাজে নিযুক্ত করলাম। আমার আশীর্বাদে যদি কিছু শক্তি থাকে, তুমি নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হবে। আর যদি তোমার জীবন সংশয় হয়, এই কথা ভেবে আমায় মার্জনা কোরো, যে যমালয়ে তোমার এই ভগ্নীও তোমাকে অনুসরণ করবে।

অকম্পন অভিভূত হল। এই কি ভারতসম্রাজ্ঞীর আজ্ঞা দেওয়ার ধরণ? এতো কোমল ভাষায় তিনি কথা বলেন? মহারানির কণ্ঠে সকরুণ মিনতির সুরে অকম্পনের চোখে জল এসে গেল। কণ্ঠে স্বরোদ্গম হল না, আবেগরুদ্ধ হয়ে মনে মনেই সংকল্প করল, তোমার এই আদেশ পালনের জন্য আজ আমি জীবনপণ করলাম। এ কাজে অকৃতকার্য হলে সে কলঙ্কিত মুখ আমি পরপারেও তোমাকে দেখাতে চাই না দেবি।

হাতে করে পুষ্পমণ্ডিত বেণী আবর্তিত করে মরালছন্দে আগে আগে চলেছিল রঙ্গিণী। একসময়ে যাত্রা থামিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে, মধুরস্বরে প্রশ্ন করল, রানিমাকে কেমন দেখলে ঠাকুর?

আকস্মিক প্রশ্নে চকিত অকম্পন সংক্ষেপে বলতে গেল, ভাল, মানে শরীরে সেরকম কোনও ব্যাধির লক্ষণ তো...

—সে আমিও জানি ঠাকুর। রানিমার শরীরে কোনও রোগ নেই। কিন্তু মনে?

সহসা এই অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে অকম্পনের মুখে কথা জোগাল না। মৃদু হেসে রঙ্গিণী আবার বলল, রানিমার মনের কথা কি কিছু জানতে পারলে ঠাকুর?

রঙ্গিণী আবার চলতে শুরু করেছিল। চলতে চলতেই বলল, বিনা কারণে অসুখের ছল করা থেকেও কিছু সন্দেহ হয়নি তোমার?

অকম্পনের কিছুমাত্র সন্দেহ হয়নি, তাই কোনমতে বলল, বিনা কারণে কেন? তিনি অসুস্থ হয়েছিলেন নিশ্চয়ই। তারপর আপনা হতেই সে অসুস্থতার হয়তো নিরসন হয়েছে...

—কাল সন্ধ্যায় মহারাজ দূতীর হাতে রানিকে বার্তা পাঠিয়েছিলেন। তারপরেই রানি মূর্ছিত হয়ে পড়েন। তার আগে পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন।

চিন্তান্বিত স্বরে রঙ্গিণী কথা বলছে, যেন ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে নিজেও সন্ধান করছে কোনও অজানা তথ্যের। অসাবধানে অকম্পনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কি ছিল সেই বার্তায়?

রঙ্গিণীর স্বরে একটু প্রচ্ছন্ন তিরস্কার, রাজা-রানির মধ্যে কথা। আমি সামান্য দাসী কি করে জানব বল? তারপর ধরো তোমাকে ডেকে পাঠানো। আচ্ছা ঠাকুর, তুমি কি প্রভাকর ঠাকুরের চেয়েও বড় বৈদ্য?

অকম্পন অসহায়ভাবে মাথা নেড়ে বলল, না না, এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই সে যথেষ্ট কুণ্ঠিত ছিল।

—তাহলে? রাজপ্রাসাদে রানির সেবকের কোনও অভাব নেই। তাও একটা চিঠি পাঠাতে তোমাকে ডেকে পাঠালেন। এর থেকেও কিছু আন্দাজ করতে পারলে না?

রঙ্গিণী প্রশ্ন করছে অকম্পনকে, কিন্তু সে প্রশ্ন যেন তার নিজেকেও। প্রায় স্বগতোক্তির স্বরে সে বলে চলল, রানিমাকে আমি যতটা জানি আর

বোধহয় কেউ তত জানে না। তুমি তো একেবারেই জানো না। তাই তুমি আর কি করে বুঝবে বল? কিন্তু নারী যখন ছলনার দ্বারা পরপুরুষকে ডেকে গোপন কাজের ভার দেয় তখন তার পিছনে যে কারণ বড় সামান্য নয় তা অনুমান করা কি খুব শক্ত?

দেখা গেল, পত্রের কথা রঙ্গিণীর অজ্ঞাত নয়। অকম্পন অনুভব করল রঙ্গিণীর কণ্ঠে এক অজানা আশঙ্কার আভাষ। সে আশঙ্কার ছোঁয়া লাগলো অকম্পনেরও মনে। সত্যি তো, মহারানির আকস্মিক অসুস্থতা কি তাহলে সর্বৈব ভিত্তিহীন? রাজপুরীর বিশ্বস্ত পরিচারক থাকতে তার মতো এক অপরিচিতের হাতে এই দায়িত্ব সমর্পণের কিবা উদ্দেশ্য থাকতে পারে? এসব প্রশ্ন অকম্পনকে আরও একবার বিব্রত করতে লাগল। কারণ যে সম্ভাবনার কথা তার সুদূর কল্পনাতেও এলো না তা হল, মগধের সম্রাজ্ঞী রাজপ্রাসাদের নিরাপদ বেষ্টনীর মাঝেও অসুরক্ষিত বোধ করতে পারেন!

তাকে নিরুচ্চার দেখে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে রঙ্গিণী বলল, কি জানি? বড় ঘরের বড় কথা। আমরা তার কি বুঝব, তাই না ঠাকুর?

অকম্পন বুঝল রঙ্গিণী ইচ্ছাকৃতভাবে প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাইছে। আজকের ঘটনায় সে আগেই অভিভূত হয়েছিল। এখন আবার নতুন করে বিস্মিত হল অকম্পন। কিন্তু রঙ্গিণীকে কিভাবে সম্বোধন করে প্রশ্ন করবে ভেবে পেল না। অবশ্য আর কোনও প্রশ্ন করার সুযোগই সে পেল না।

রঙ্গিণী বাকপটু, অকম্পনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলতে চলতে অনর্গল কথা বলে গেল। প্রথমেই সে জেনে নিল অকম্পনের সম্যক পরিচয়। তার নিবাস কোথায়, বাড়ীতে কে কে আছে, বিয়ে করেছে কি না, কেন করে নি, কিরকম কন্যা পছন্দ ইত্যাদি রকমারি তথ্য প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জেনে নিল সে। আশ্বাস দিয়ে জানাল, তার সন্ধানে অনেক সুপাত্রী আছে, সে নিশ্চই সেসব সম্বন্ধ তার মাতার নিকট প্রেরণ করবে।

তরলমতি রমণীকুলের অনর্থক বাক্যব্যয়ের প্রবণতা অকম্পনের অজানা ছিল না। কিন্তু রঙ্গিণীর কথা পরিমাণে বহুল হলেও বাক্য গঠনের সরস শৈলী ও কুশলতায় চমৎকৃত না হয়ে পারা যায় না। বিনম্র শ্রোতারূপে অকম্পন কখন রাজ প্রাসাদ অতিক্রম করে সিংহদুয়ারে এসে গিয়েছে, তা অনুভবই হল না।

দুয়ার পার হবার আগে হঠাৎ রঙ্গিণী ঘুরে অকম্পনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার দৃষ্টিতে তখন আর লঘুতার চিহ্নমাত্র নেই। দৃঢ়স্বরে বলল, শোন ঠাকুর। তুমি কি কাজে কোথায় যাবে, সে সব তো আমি জানি না। কিন্তু তুমি বড় ভালোমানুষ, তোমার জন্য আমার ভারী আশঙ্কা হচ্ছে।

রঙ্গিণী একটু চুপ করলো, কিন্তু ভাবে বোঝা যায় যে তার আরও কিছু যেন বলার আছে। অকম্পন বলল, তুমি আশঙ্কা করো না রঙ্গিণি। আমার কুশল কামনা করো। তোমার শুভেচ্ছায় দেখো আমি সব বাধা অতিক্রম করতে পারব।

—হ্যাঁ, তাই যেন হয়। তুমি ভালো থেকো, মা ভবানী তোমার সহায় হবেন। আমি সামান্য দাসী, তোমায় তো আর কোনও সাহায্য করতে পারব না। একটু ইতস্তত করে সে আবার বলল, আমি শুধু একটি কথা তোমায় বলে দিতে চাই। আমি একটা মন্ত্রকূট জানতে পেরেছি। তোমার তা হয়তো কোনই কাজে আসবে না। কিন্তু তবুও তা না হয় জেনে রাখো। কি বলা যায় যদি কোনও কাজে লাগে।

একটু থেমে হ্রস্বকণ্ঠে রঙ্গিনী আবার বলে, মন্ত্রকূট কি জানো তো ঠাকুর? যুদ্ধের সময়ে সংবাদ আদান-প্রদান করতে ব্যবহার করা হয়।

অকম্পন জানত না। রঙ্গিণী অল্প কথায় বুঝিয়ে দেয়, গোপনীয় সংবাদ আদান-প্রদানের সময় সংবাদ বা বার্তা বিনিময়ের আগে এই মন্ত্রকূট যাচাই করে নেওয়া হয়। মন্ত্রকূট অতীব গোপনীয় একটি শব্দ বা শব্দসমষ্টি, যা শুধুমাত্র কোনও এক বিশেষ কর্মকাণ্ডের জন্য নির্দিষ্ট সদস্যদের মধ্যেই বিতরণ করা হয়। কার্যনির্বাহী সদস্যরা পরস্পর অপরিচিত হলেও এই মন্ত্রকূট দ্বারা নিজেদের শনাক্ত করে থাকে।

রঙ্গিণী বলল, কিছুদিন আগে এক মন্ত্রণাসভায় যুদ্ধসংক্রান্ত কোনও বিশেষ কাজে একটি মন্ত্রকূট গৃহীত হয়। ওই মন্ত্রণায় সামিল কিছু সৈনিকের অসাবধানতায় আমি সেই মন্ত্রকূট জেনে ফেলেছি। কেউ এ কথা জানে না, আমিও আর কারওকে বলিনি। সে মন্ত্রকূট হল, বরেণ্যম্! কোথায় এটা ব্যবহার করা যাবে তা আমি জানি না। কিন্তু যে গোপন কাজে তুমি যাচ্ছ, হয়তো সেখানে তোমার কাজে লাগতে পারে ভেবে বলে দিলাম। যদি কখনও প্রয়োজন হয়, দাসীর কথা মনে রেখো ঠাকুর।

অকম্পন আমোদ অনুভব করলো। যুদ্ধের মন্ত্রকূট তার কিবা কাজে আসবে? কিন্তু গোপন কাজে গোপনীয় যে অস্ত্র রঙ্গিণীর কাছে ছিল, আন্তরিক উদ্বেগে সে তাই তাকে দিতে চেয়েছে। রঙ্গিণীর স্নেহসিক্ত ভাবালুতা অকম্পনের মন ছুঁয়ে গেল, বলল, তোমার এই সহৃদয় উপকার আমি নিশ্চয়ই মনে রাখব রঙ্গিণি।

—তোমাকে উপদেশ দেওয়ার পাপ করলাম ঠাকুর, আমাকে মার্জনা করো। এইটুকু বলতে রঙ্গিণীর চোখে জল এসেছিল নিশ্চয়ই। দ্রুত চোখের উপর একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে আবার সেই আগের উচ্ছলতায় বলে উঠল, চলো চলো ঠাকুর, দেরি হয়ে গেল। সন্ধের আগেই তোমায় রাজপুরীর বাইরে নিয়ে যেতে হবে।

পুরদ্বারের রক্ষীপ্রধান নিশ্চই রঙ্গিণীর পূর্বপরিচিত, একটি আদিরসাত্মক হাসি হেসে প্রশ্ন করলো, এতোক্ষণে দেখা দিলে সুন্দরি?

দেখা গেল এ ধরনের সম্ভাষণে রঙ্গিণী অভ্যস্ত। বেণীবন্ধনের এক ঝাপটায় রক্ষীকে ধমক দিল, রস যে উথলে পড়ছে দেখি! ঘরের নাগরিকাটি বুঝি আর মনে ধরছে না? একবার জানতে পারলে ওই গোঁফজোড়াটির বাহার ঘুচিয়ে দেবে। এখন শোন, এই ব্রাহ্মণ বৈদ্যরাজের শিষ্য, মহারানির আদেশে তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। এঁকে যেতে দিও। আর দেখো, তল্লাশি করে হেনস্থা করো না যেন।

রক্ষী এরকম ধমক খেয়েও অপ্রসন্ন হল না বরং আরও আতিশয্যের সঙ্গে বলল, আহা রাগ করো কেন দেবি? কিন্তু অপরিচিতের তল্লাশি নেওয়া যে আমার কর্তব্য, কি করি?

—ঠাকুর চিকিৎসক, আমার গ্রামের দিকেই যাচ্ছেন। তাই আমি কিছু সামগ্রী সঙ্গে দিয়েছি। অকম্পনের সঙ্গে মহারানি প্রদত্ত পুলিন্দাটি দেখিয়ে পুনরায় বলল, ওই যে। আমার উপর ভরসা আছে তো, নাকি ওটাও খুলে দেখাতে বলবে?

—কী যে বল দেবি, তোমার জিনিস খুলে দেখবো? কপট ত্রাসে দু'কানে হাত দিয়ে রক্ষীটি বলল, ঘাড়ে আমার একটিই মাথা, তার ভয় নেই?

—তবু ভালো। এতে তোমার সীলমোহরের ছাপ লাগাও দিকিনি। রাজপুরীর সিংদরজায় তোমার চর পাঠিয়ে দাও। সেখানে আবার ঠাকুরকে যেন কেউ বিরক্ত না করে।

দ্বারপাল বিগলিত মুখে আদেশ পালন করে অকম্পনের দেহবস্ত্রের অন্যান্য অংশ তল্লাশ করে নিল। তারপর রঙ্গিণীর উদ্দেশ্যে করুণকণ্ঠে বলল, তোমার আত্মীয়কে আবার বিরক্ত করবে কার এতো সাহস?—তা বলছিলাম কি, সন্ধের পরে একটু এসো না গো, কতদিন তোমার সঙ্গে সুখদুঃখের কথা হয় না?

—নাঃ তোমার ঘরের মানুষটিকে বলতেই হবে দেখছি। দ্বাররক্ষককে আর এক মুখঝামটায় নস্যাৎ করে অকম্পনের দিকে ফিরে রঙ্গিণী বলে, আমার প্রণাম নিও ঠাকুর। এবার এসো। রানিমা যেমন বললেন, ওই পথ দিয়ে ঘুরে চলে যেও। জয় মা ভবানী।

রঙ্গিণীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে আর একবার অবাক হল অকম্পন। তার পরিচয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থার সব জটিলতাই সহজ হয়ে গেল। রঙ্গিণীর দেখানো পথে এগিয়ে চলল সে। প্রথম মোড়টিতে ঘুরে যাওয়া পর্যন্ত যতবার পিছন ফিরল, রঙ্গিণীকে দেখতে পেল। তারপর কদম্বকাননে প্রবেশ করে আর দেখা গেল না।

মহারানির নির্দেশিত পথটি উদ্যানের ভেতর দিয়ে একটু ঘুরে যেতে হয়। তখন সন্ধ্যা হয়ে এলেও বেশ আলো ছিল। রঙ্গিণী তাকে প্রাসাদ প্রাকারের প্রধান দুয়ার থেকে বিদায় দিয়েছিল। কিন্তু একাকী পথে আসতে আসতে অকম্পনের মনে হলো, সে যেন একা নয়। কাছাকাছি আরো কেউ আছে। প্রথমটা কিছু না দেখলেও, কিছু পরেই একটা ঘন গুল্মের আড়ালে পরিষ্কার দেখতে পেল একটি মূর্তি। নারীমূর্তি! একটু থমকে দাঁড়াতেই মেয়েটি নিজেই এগিয়ে এলো, তারপর উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করলো, তুমিই রানিদিদির চিকিৎসা করছো বুঝি? কেমন দেখলে তাঁকে?

অঙ্গে কিছু মহার্ঘ বেশভূষা ও আভরণ থাকলেও মেয়েটি নিতান্তই সাধারণ। অপরূপা সুন্দরী নিশ্চই বলা যায় না, কিন্তু এ রূপ একবার দেখলেই মনে থেকে যায়, সহজে বিস্মৃত হবার মত নয়। কিছু পূর্বেই অকম্পন নারীর অগ্নিসমা রূপ প্রত্যক্ষ করেছে। সে রূপ যদি বিলাসবহুল অট্টালিকা হয়, এ তাহলে নিতান্তই পর্ণকুটির। তবু অকম্পনের দৃষ্টি সরিয়ে নিতে ইচ্ছা হল না। সে সুসংস্কৃত যুবক, চপলমতি কামোদক নয়। নারীরূপ দর্শনে বিহ্বলতা তার স্বভাববিরুদ্ধ। তবুও তার মনে হল, অট্টালিকায় বৈভব আছে, কিন্তু পর্ণকুটিরে আছে আশ্রয়।

—বলছ না কেন, রানিদিদিকে কেমন দেখলে? পুনরায় মেয়েটির উৎকণ্ঠিত প্রশ্নে চিন্তায় ছেদ পড়ল অকম্পনের। অল্পকথায় জানালো মহারানির স্বাস্থ্যের কথা, এও জানাল, আপাতত তিনি ভালো আছেন এবং অনতিকালের মধ্যেই পরিপূর্ণ আরোগ্য হবেন।

মেয়েটি যেন স্বস্তির একটি শ্বাস নিল। তারপর চকিতে যেমন এসেছিল তেমনই পিছন ফিরে লতাগুল্মের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো। অকম্পন তার পিছনে বেশ কিছুদূর গিয়েও তাকে আর দেখতে পেল না। জানা হলো না, কে ছিল এই মায়াবিনী।

সিংহদুয়ারের নিকটবর্তী হয়ে কিন্তু দেখা গেল সকল সমস্যার সমাধান হয়নি। দ্বারপাল জানালো, প্রাসাদের রক্ষী সংবাদ দিয়েছে বটে মহারানির চিকিৎসক প্রাসাদে এসেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি অপরিচিত, তাই মহামাত্য বিশঙ্কদেবের বিশেষ অনুমতি বিনা অকম্পন প্রাসাদ ত্যাগ করতে পারবে না।

প্রমাদ গুনল অকম্পন। আশেপাশে পরিচিত কেউ নেই। আচার্য নেই, রঙ্গিণী নেই। মহারানিকে সংবাদ দিতে বলা শোভন বিবেচনা করলো না অকম্পন। আচার্য বলেছিলেন, অসুবিধা হলে বিশঙ্কদেব আছেন। তিনিই যখন আজ্ঞা করেছেন তখন সাহস সঞ্চয় করে অগ্রসর হল সে।

দুই প্রতিহারী তাকে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলো মহামাত্যের সমক্ষে। অকম্পন দেখল, বিশাল সে কক্ষে দারুকাসনে উপবিষ্ট এক ক্ষীণতনু বৃদ্ধ। প্রশস্ত ললাটের নীচে দুই তীক্ষ্ণ চক্ষু তার দিকে চেয়ে আছে। সে চোখের দৃষ্টি যেন মর্মমূলের ভাষা পড়ে নিতে চায়। দু'টি শীর্ণ হাত দুই দিকে আসনের হস্তধারকের উপর প্রসারিত। এতো অকিঞ্চিৎকর মনুষ্য দেহে এতখানি ব্যক্তিত্বের প্রকাশ আগে দেখেনি অকম্পন। আসবার সময়ে যেটুকু সাহস সঞ্চয় করেছিল সে, মহামাত্যের সম্মুখে এসে তার কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না।

হাতের সংক্ষিপ্ত ইশারায় প্রহরীদের বিদায় করে বৃদ্ধ প্রশ্ন করলেন, বল, কে তুমি যুবক?

প্রশ্নকর্তার স্বর কর্তৃত্বব্যঞ্জক কিন্তু তাতে ক্রূরতা নেই। অকম্পন কিছুটা নির্ভয় হয়েই নিজের পরিচয় দিল। মহারানির সঙ্গে তার সম্পূর্ণ আলাপ প্রকাশ করল না। কিন্তু মহামাত্যের পরবর্তী প্রশ্ন তাকে বিহ্বল করে দিল, মহাদেবীর সঙ্গে তোমার একান্ত সংবাদটুকু আমি জানতে আগ্রহী। আর তোমাকে আগেই বলে রাখি মিথ্যাভাষণে কালক্ষেপ করলে তোমারই সমস্যা বৃদ্ধি পাবে।

মহারানিকে অকম্পন সর্বৈব গোপনতার আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু এই বৃদ্ধ যেন আগে থেকেই সব জেনে নিয়েছেন! অকম্পন দেখে আর কোন উপায় নেই। তার কান্না পেতে লাগলো। প্রখর ব্যক্তিত্বের সামনে তার সব ভুল হয়ে গেল। প্লাবনে কূল ভেঙ্গে গেলে যেমন জলোচ্ছ্বাস আর রোধ করা যায় না, অকম্পনও তেমন আর কিছু গোপন করতে পারল না। সব কথা প্রকাশ করে বিশঙ্কদেবের চরণাবদ্ধ হয়ে কাতরস্বরে বলল, আমি আপনার শরণাগত দেব। এ সংবাদ অতীব গোপনীয়, সে গোপনীয়তা রক্ষা না হলে অনর্থ হতে পারে। আমার যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে তার শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব। কিন্তু এখন আমার উপর করুণা করুন। আমাকে আমার কর্তব্য পালন করার অনুমতি দিন।

—তুমি ব্রাহ্মণ। আমার পদস্পর্শ কোরো না, এই বলে বিশঙ্কদেব নিজের আসন পরিত্যাগ করে দুই পা পিছিয়ে গেলেন। মনের ভাব গোপন করতেই যেন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তাঁর মনে তখন কি যে আনন্দদ্বন্দ চলছে অকম্পনের পক্ষে তা অনুমান করা সম্ভব নয়। বিশঙ্কদেবের মনে তখন আশা-নিরাশার দোলা। চমূ মারফৎ তিনি মহারানির পত্রপ্রেরণ সংবাদ পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন। এই যুবকের আন্তরিক সততা যেন তাঁকে আশ্বস্ত করল। তাঁর আরব্ধকর্ম, মহারাজের অন্তিম আশা তাহলে হয়তো বা নিষ্ফল হবে না! এই কি মহাকালের ইচ্ছা? এও কি সম্ভব?

যখন তিনি আবার সম্মুখে দৃষ্টি ফেরালেন, অকম্পন স্পষ্ট দেখল বৃদ্ধের চোখে সেই মর্মভেদী দৃষ্টি অন্তর্হিত হয়েছে। তার স্থানে দু'ফোঁটা অশ্রু চোখের কোণে চিকচিক করছে। অকম্পনকে আর কিছু না বলে সরাসরি প্রহরীদের ডেকে বললেন, এই অতিথিকে সসম্মানে রাজপুরীর বাইরে তার গন্তব্যে যেতে দেওয়া হোক। সিংহদুয়ারে কেউ যেন তার অঙ্গস্পর্শ না করে।

হতবুদ্ধি অকম্পন কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রতিহারীরা তাকে দুই হাত ধরে তুলে নিয়ে যেতে তৎপর হল। কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার আগে পিছন থেকে আহ্বান এলো, দাঁড়াও।

অকম্পন ফিরে দেখে সেই দীর্ঘদেহ ক্ষীণকায় বৃদ্ধ তার দিকেই এগিয়ে আসছেন। নিকটে এসে তিনি অকম্পনের দুই বাহু ধরে তাকে পূর্ণদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ অবলোকন করলেন। তারপর বললেন, তুমি ব্রাহ্মণ, তোমায় আশীর্বাদ দেওয়া আমার শোভা পায় না। কিন্তু প্রয়াত মহারাজ স্বর্গ থেকে আজ তোমাকে আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। বিজয়ী ভব।

***

সন্ধ্যার পরে বিশঙ্কদেব নগরীর পথে বের হলেন। সারথিকে বললেন নগরপ্রান্তের গণিকাপল্লীতে তাঁকে নিয়ে যেতে। সারথি বিস্মিত হলেও নীরবে আজ্ঞা পালন করল। যথাস্থানে উপস্থিত হলে তাকে আরও বিস্মিত করে বিশঙ্কদেব বললেন, দু'দণ্ড অপেক্ষা করো। আমি এখনই ফিরব।

একে এই পরিণত বয়স, তাঁর পর বিনা রাত্রিবাসে গণিকাবিলাস? রাজপুরুষের খেয়াল, সামান্য সারথি তার স্থান-কাল-পাত্রের বিচার করে কি ভাবে?

বিশঙ্কদেব সত্যিই তাঁর ভবনে ফিরে এলেন দুই দণ্ডকালের মধ্যেই। স্নানাদি সেরে গোবিন্দমন্দিরে অনেকক্ষণ ধ্যানাসনে বসে রইলেন। ধ্যান ভাঙলে সমাহিত দৃষ্টিতে বিগ্রহের দিকে চেয়ে আপন মনেই বললেন, হে গোবিন্দ, আমার যতদূর সাধ্য করলাম। এরপর তোমার ইচ্ছা। আমার এ জীবনের প্রয়োজন সমাপ্ত হয়েছে। রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করা আমার অনুচিত কিন্তু রাজাজ্ঞা পালন আমার পক্ষে অসম্ভব। এখন তুমি আমার সহায় হও।

দৃষ্টিতে তাঁর কঠিন সংকল্পের আভাস। তাঁর মুখে হাসি ছিল না, কিন্তু এক আসাধারণ ব্রত উদযাপনের পরিতৃপ্তিতে তা উদ্ভাসিত। সে রাত্রে তিনি আহার গ্রহণ করলেন না। নিত্যকার অভ্যাসমত যথাসময়ে শয়নকক্ষে প্রবেশ করে দুয়ার বন্ধ করলেন।

জীবিতাবস্থায় বিশঙ্কদেবকে আর দেখা যায়নি। পরদিন সূর্যোদয়ের বহু পরেও তিনি শয়নকক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন না, যা তাঁর সেবকেরা কখনও দেখেনি। কিন্তু তাদের আজ্ঞা ছিল না বিশঙ্কদেবের শয়নকক্ষে প্রবেশ করার। সংবাদ মহারাজ রামগুপ্তের কর্ণগোচর হতে তিনি স্বয়ং এলেন মহামাত্য ভবনে।

শয়নকক্ষের দরজা অর্গলিত ছিল না। মহারাজ কক্ষে প্রবেশ করেই দেখতে পান, পালঙ্কের উপর বিশঙ্কদেবের দেহ। স্পষ্টতই সে দেহে আর প্রাণ নেই। তাঁর একটি হাত পালঙ্ক থেকে নীচে এসে ভূমিস্পর্শ করেছে। সে হাতের মণিবন্ধের নিকট এক গভীর ক্ষত। দ্বিধাবিভক্ত ধমনীর পথে বিশঙ্কদেবের সমস্ত দেহরস নির্গত হয়ে ভূমিকে অলক্তরাগের আল্পনায় রঞ্জিত করেছে। যে পাপমুক্ত রাজ্য গড়ার স্বপ্নে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, যেন রুধিরাঞ্জলিতে সম্পন্ন করেছেন তার ভূমিপূজন!

॥ ৬ ॥

রাজপ্রাসাদ থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে অকম্পন তার মাতাকে বলল, এক রোগিণীর শুশ্রূষা করার বরাত পেয়েছি মা। সাতদিনের জন্যে উড়ালি যেতে হবে।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। মহামাত্যের আশীর্বাদে রাজপুরী

থেকে নিষ্ক্রমণের আর কোনও সমস্যা হয়নি। পথে আসতে আসতেই তার পরবর্তী কর্মপদ্ধতি মোটামুটি স্থির করে নিয়েছিল অকম্পন। রাত্রে বন্ধু কামোদকের বিবাহ অনুষ্ঠানে রাত্রিযাপন করে মহারানির কথামত প্রভাতেই যাত্রা করবে জয়স্কন্ধাবারের পথে। সন্ধ্যার আগেই তাহলে সে উড়ালিয়া গ্রামে পৌঁছে যাবে।

অকম্পন আগেই শুনেছিল উড়ালি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রায় চার ক্রোশ দূর, এ রাজ্যের অন্তিম অসামরিক জনপদ। উড়ালি পর্যন্ত যেতে কোনো বিঘ্ন না হবারই কথা, পথ সরল ও সুগম। শ্রেষ্ঠীগনের ব্যবসায়সুত্রে এ পথে যাতায়াত আছে। সেখানে রাত্রিযাপনের ব্যবস্থাও আছে। পথের বাকিটা তার পরদিন প্রভাতের জন্যই রাখতে হবে, কেননা সেটা একেবারেই অজানা দুর্গম রাস্তা, রাত্রে দস্যু ও বন্যপ্রাণী অধ্যুষিত বিপদসংকুল। অতএব হিসাব মত সবকিছু নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলে পরশু দ্বিপ্রহরের মধ্যে সে মহারানির পত্র কুমার চন্দ্রের হাতে তুলে দিতে পারবে।

সে বোধহয় সবকিছু একটু বেশি সরল ধরে নিয়েছিল। তার শঙ্কা শুধু পথের বাধাটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তদ্ভিন্ন আর যা বিপদ আসতে পারে, তার কোনও কল্পনা সে তখন করেনি।

মা-কে সব কথা খুলে বলা চলবে না। অযথা আশঙ্কিত হবেন। তাই একটা অজুহাত দেখাতেই হল। সেই কথা শুনে মা বললেন, সেকি, সে যে অনেক দূরের পথ! কি করে যাবি?

অকম্পন কি নিজেই জানে, কীভাবে যাবে? কিন্তু মহারানি প্রদত্ত দায়িত্ব সে স্বীকার করেছে, এখন তাকে যেতেই হবে। অথচ তার সেই ছেলেবেলার রহস্যময় কল্পপুরী কালান গড় তো দূরস্থান, অদ্যাবধি নগরীর বাইরেই সে কখনো পদার্পণ করেনি। আজ এই দুস্তর পথ অতিক্রম করে সে কি পারবে মহারানির বার্তা যথাস্থানে পৌঁছে দিতে?

—ঘোড়ায় চড়ে যাব, মা-কে আশ্বস্ত করার ছলে নিজেকেই সাহস যোগায় অকম্পন, ও তুমি কিচ্ছু ভেবো না মা, আমি ঠিক চলে যাবো। অসহায় মানুষের আহ্বান কি উপেক্ষা করা যায়?

কল্পিত অসহায় মানুষটির কথা ভেবে মাতা নিজেকে প্রবোধ দিলেন। পুত্রকে চিকিৎসাবৃত্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত দেখে হয়তো খুশিও হলেন। এদিকে অকম্পনের কানে তখনও বাজছে সম্রাজ্ঞীর করুণ স্বর। তিনি অসহায় একথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। কি তাঁর বিপদ তা তো জানা নেই। কিন্তু কতখানি অসহায়তা বোধ থেকে মহারানিকে এক অপরিচিত প্রাকৃতজনের কাছে এত মিনতি করতে হয়? অকম্পন যতই ভাবে মনে হয় পত্রখানা যথাস্থানে না পৌঁছলে সত্যই কোনও অনর্থ ঘটবে। এ কাজে তাকে সাফল্য পেতেই হবে।

সে ধীরে ধীরে ভাবতে আরম্ভ করলো তার সম্মুখবর্তী কার্যক্রম। অবশ্য ভাববার খুব বেশি কিছু নেই। প্রথম কর্তব্য উড়ালি গ্রামে পৌঁছন। ততক্ষণে যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে পরবর্তী গন্তব্যের প্রস্তুতি নিতে। মুশকিল হল, এ অত্যন্ত গোপন রাজকার্য। মহারানিকে সে গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিশঙ্কদেবের আশিস লাভ করেছে সে, তাঁর কাছ থেকে গোপনীয়তা ভঙ্গের আশঙ্কা নেই। আর সবকিছুই তাকে একাকী করতে হবে, কারুকে এ ব্যাপারে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলা চলবে না।

আপন বিবেচনামতই পাথেয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সে বিবাহস্থলে যাবার আগেই সংগ্রহ করে নিল। সন্তর্পণে সুরক্ষিত জায়গায় ভরে নিল মহারানির পত্র। মনে পড়ে গেল ধ্রুবাদেবী বলেছিলেন, চিঠিটা খুলে দেখো না যেন। জানোই তো, বাহকের রাজকীয় মোহর ভাঙলে অপরাধ হয়। এতে অবশ্য আমার সীলমোহর নেই, কেউ দেখে ফেললে অযথা সন্দেহ হতে পারে। শুধু লাক্ষা দিয়ে মুখ বন্ধ করা আছে। আর

বেশি কিছু এখন জানতেও চেয়ো না। পারতপক্ষে লোক জানাজানি কোরো না। যদি বা কেউ দেখে ফেলে তাহলে বোলো, তোমার কোনও আত্মীয় তাঁর গ্রামে কারুকে উপহার পাঠাচ্ছে। তুমি বাহক মাত্র, ভিতরে কি আছে তুমি জানো না।

পত্রের সঙ্গে ধ্রুবাদেবী দিয়েছিলেন তাঁর একটি অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়। পত্র কুমারকে দিতে হবে জেনে অকম্পন সংশয় প্রকাশ করেছিল, কুমারের সমক্ষে পৌঁছনো কি সম্ভব, আমার মতো এক সামান্য মানুষের পক্ষে?

মহারানি তাঁর অনামিকার অঙ্গুরীয়টি খুলে অকম্পনকে দিয়ে বলেছিলেন, আমার এই আংটিটা সঙ্গোপনে রাখো। এখানে কারওকে দেখিও না। কালানে গিয়ে কুমারকে দেখিও। তাঁকে না পেলে তাঁর প্রহরীদের দেখিও। আর কারওকে নয়।

তারপর একটু থেমে আবার বলেছিলেন, আর ওই যে বললে, তুমি সামান্য, আর কখনো বোলো না। আমি যদি বেঁচে থাকি, জেনো তুমি সামান্য থাকবে না।

একথার অর্থ, কেন একথা বলা—কিছুই জানে না অকম্পন। তবে সম্রাজ্ঞী হলেও তিনি নারী। এই কথার মধ্যে অকম্পন অনুভব করেছিলো, সম্রাজ্ঞীর অনুশীলিত অবিচল বহিরাবরণের অন্তরালে এক অসহায় নারীহৃদয়ের অনুচ্চার আগ্রহ।

মহার্ঘ অঙ্গুরীয়টি পরিচ্ছদের মধ্যে রাখতে সাহস হল না অকম্পনের, নিজের কনিষ্ঠায় গলিয়ে নিল। বিচ্ছিন্ন হবার সম্ভাবনা থাকবে না। আর স্বর্ণখণ্ডটির মধ্যে আছে মহারানির স্নেহস্পর্শ। অকম্পনের কাছে তার মূল্য সুবর্ণমূল্যের অনেক বেশী। সুকঠোর যাত্রাপথে সেই হবে তার প্রেরণা।

আরও কয়েকটি পরিচ্ছদ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে সে তার পোটুলি প্রস্তুত করে নিল। সঙ্গে রাখল তার ওযধি ও চিকিৎসার ছোট পেটিকাটি, যদি প্রয়োজন হয় মনে করে। উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন রেখেই প্রতিবেশীদের নিকট যথাসম্ভব জেনে নিল পথনির্দেশ। তার নিজের বাহনটি এই দূরপথ চলায় অভ্যস্ত নয়, তাই একটি বড় শক্তিশালী ঘোড়া ভাড়া করে নিল। তারপর সেটির ওপর তার যাত্রাসামগ্রী রেখে পদব্রজেই অগ্রসর হল বিবাহস্থলের উদ্দেশ্যে।

পথে দেখা গেল আজ হঠাৎ অকম্পনের সম্বন্ধে মানুষের অনুসন্ধিৎসা যেন বেড়ে গেছে। বিবাহসভার পথে অগ্রসর হতে না হতেই একটি খর্বাকৃতি উদরসমৃদ্ধ লোক তার সঙ্গ নিল। আকারে প্রকারে নাড়ুগোপালের কথা মনে হয়। লোকটি অপরিচিত, দেখে মনে হয় বেনে—কোনও সামান্য পণ্যের ব্যবসায়ী। পরিচ্ছদে অর্থাভাবের চিহ্ন নেই, কিন্তু বিশেষ সম্ভ্রান্তও নয়। লোকটির মুখে কথা নেই, শুধু চোখাচোখি হলেই অমায়িক হাসিতে অকৃপণ হয়, যেন কতকালের চেনা। কিন্তু সে হাসি অকম্পনের কাছে সম্পূর্ণ অনাবিল ঠেকল না।

কিছুক্ষণ অস্বস্তির সঙ্গে পথ চলে অকম্পন জিজ্ঞেস করেই ফেলল, মহাশয়ের কি আমাকে কিছু বলার আছে?

—না না তেমন আর কই? নাড়ুগোপাল একগাল হেসে বিগলিত হল, তা মহাশয়ের গন্তব্য?

অকম্পন উত্তর না দিয়ে গম্ভীরভাবে পালটা প্রশ্ন করল, মহাশয়ের উদ্দেশ্য?

মলিন দশনপংক্তি আরও উন্মুক্ত করে অকম্পনের কথার শ্লেষটুকু হজম করে নিল নাড়ুগোপাল। যেন বেশ মজার ব্যাপার শুনেছে এইভাবে বলল, মহাশয় দেখছি রসিক ব্যক্তি। আপনি বিরক্ত হবেন না। অধমের কোনও অসৎ উদ্দেশ্য নেই। নিছক কৌতূহল। আসলে আপনার বাহনটি তো ঠিক গৃহকার্য নিমিত্ত মনে হয় না। তা যুদ্ধের ঘোড়া নিয়ে নগরীর পথে সান্ধ্যভ্রমণ?

—এতে আপনার আপত্তির তো কোনও কারণ দেখি না। বরং আপনার এই অহেতুক কৌতূহল আমার কিন্তু আদৌ রুচিকর ঠেকছে না। অকম্পন একটু রূঢ়ভাবেই জানালো, তাই তা চরিতার্থ করতে না পারার জন্য দুঃখিত। দয়া করে অনুমতি করুন, আমার কাজ আছে।

—তা—তা—বেশ তো, বেশ তো, বিলক্ষণ! ক্ষুদ্রকায় লোকটি সবিশেষ ব্যস্ততায় বলল, আর বটেই তো, আপনার ঘোড়া নিয়ে আপনি যুদ্ধেই যান অথবা ভ্রমণই করুন, আমার তাতে কী, ঠিকই তো...

নাড়ুগোপাল ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে অকম্পনকে অনুসরণ করা হতে বিরত হল। তারপর কিছুদূর অগ্রসর হয়েও আর কেউ তাকে বিরক্ত করলো না বটে, তবু অকম্পনের মনে হল বেশ কয়েক জোড়া অদৃশ্য চক্ষু যেন তাকে অনুসরণ করছে।

নগরীর লোকে কি তাকে আজ একটু বেশীমাত্রায় পর্যবেক্ষণ করছে? সে যে বিশেষ এক অভিযানে চলেছে তা আর কারওকে সে বলেনি। কিন্তু লোকে কি তা কোনও ভাবে জেনে গেল? আপাতত মনের সন্দেহটাকে আমল না দিয়ে সে দ্রুত পা চালাল, পিছন ফিরে আর দেখল না। যদি দেখত, তাহলে দেখতে পেতো দূর থেকে সেই লোকটি অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার যাত্রাপথের দিকে সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে আছে।

বিবাহসভায় উপস্থিত হয়েও অকম্পনের অস্বস্তি কাটল না, মনে হচ্ছিল এখানেও বোধহয় কেউ তার উপর দৃষ্টি রেখেছে। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অবচেতনায় তাকে অতিরিক্ত স্পর্শকাতর করে তুলেছে। এই কথাই নিজেকে বোঝাচ্ছিল অকম্পন, কিন্তু সেই সভায় উপস্থিত একটি লোক তাকে অন্যভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করলো। লোকটির দোহারা গঠন। অর্ধেক মস্তক মুণ্ডিত, বাকি অর্ধেক ঢাকা পিছনদিকে গ্রন্থিবদ্ধ লম্বা কেশপাশে। দেখে সচরাচর বণিক শ্রেণীর বলে বোধ হয় না। লোকটি অতি কৌতূহলীভাবে বারংবার অকম্পনের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপণ করছিল।

অকম্পনের অস্বস্তি অল্প সময়ের মধ্যেই কুণ্ঠায় পরিণত হল, যখন লোকটি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আপনিই কি আর্য অকম্পনদেব? আপনাকে অতি পরিচিত মনে হওয়ায় আলাপ করার আগ্রহ দমন করতে পারলাম না। আচার্য মিশ্রের আশ্রমে আপনাকে দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল। আমি সম্পর্কে কন্যার মাতুল। আশা করি আপনাকে অযথা বিব্রত করিনি।

সম্ভ্রান্ত কুটুম্বকে সন্দেহ করায় লজ্জাবোধ করলো অকম্পন, অপ্রতিভ হয়ে তাঁকে অভিবাদন জানালো। মাতুল অতি সজ্জন ব্যক্তি, আরও কিছু শিষ্টতা বিনিময়ের পর প্রশ্ন করলেন, আপনি সঙ্গে অশ্ব এনেছেন দেখলাম। দূরে কোথাও যাবেন নাকি?

অকম্পন এইরকম একজন বরিষ্ঠ অভিভাবকের পরামর্শই চাইছিল। মূলকথা গোপন রেখেই বলল, কাল এক বিশেষ প্রয়োজনে উড়ালি যেতে হবে। অতদূরে যাবার পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। আপনার পথনির্দেশ পেলে বাধিত হই।

—অবশ্যই। এতো আমার সৌভাগ্য। আমি বহুবার ঐ পথে গিয়েছি, এই বলে মাতুল পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে উড়ালি যাবার পথের নির্দেশ অকম্পনকে বুঝিয়ে দিলেন। অকম্পন পূর্বেই কিছু অনুসন্ধান করেছিল, এখন এক অভিজ্ঞ মানুষের পরামর্শে তার আত্মবিশ্বাস অনেকটা বৃদ্ধি পেল। উড়ালির পরে কালান গড়ে কীভাবে যাবে তা এপর্যন্ত চিন্তা করেনি অকম্পন। এখন সে পথনির্দেশও এঁর কাছে জেনে নেওয়া যায় কিনা ভাবছে সে, এই সময়ে তাদের আলাপচারিতায় বাধা পড়ল।

বিবাহলগ্ন মধ্য রাত্রে। অভ্যাগতরা অলস হাস্য-পরিহাস ও পান-ভোজনে কালক্ষেপ করছিল। কন্যাপক্ষীয় কর্মকর্তা ও সেবকবৃন্দের শশব্যস্ত চঞ্চলতা। প্রসাধিতা নবীনার দল কলহাস্যে ছুটোছুটি করছে। এরই মাঝে অকম্পনের জনাকয়েক বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী একত্রিত হয়েছে বরাসরে। তাদেরই একজন এসে অকম্পনকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল যেখানে তাদের অন্যান্য বন্ধুরা বরসজ্জায় সুসজ্জিত কামোদককে ঘিরে আসর সাজিয়ে বসেছে। বিবাহ অনুষ্ঠান শুরু হতে তখনও কিছু দেরি ছিল। বন্ধুসংসর্গে সেখানে নানান আলাপচারিতা চলছে।

অকম্পনকে দেখে জনৈক বললেন, আরে এসো এসো, সুশ্রুতের বরপুত্র এসো। এতক্ষণ তোমারই বড় অভাববোধ করছিলাম। তা ওদিকে বৃদ্ধদের মাঝে কি করছিলে?

বক্তার নাম ধূমল। বন্ধুস্থানীয় হলেও সে আর সবার থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ। অকম্পন বলল, কন্যার মাতুলের সঙ্গে কিছু আলাপ চলছিল।

—কন্যার মাতুল? ধূমল কিঞ্চিৎ বিস্মিতস্বরে বলল, গজানন ভদ্রের শ্বশুরকুল আমার পরিচিত। তাঁর তো কোনও শ্যালক আছেন বলে শুনিনি?

অর্থাৎ পাত্রীর কোনও মাতুল নেই। এতক্ষণ যার সঙ্গে অকম্পনের বার্তালাপ হচ্ছিল, তিনি তাহলে কে? যে স্থানে তিনি ছিলেন, সেখানে তখন আর কারওকে দেখা গেল না। অকম্পন শিরঃসঞ্চালন করেও আশেপাশে কোথাও আর তাঁকে দেখতে পেল না। কে ছিল আগন্তুক? হয়তো দূরসম্পর্কিত কেউ। প্রতিশংকার অবসান হল না।

যে অকম্পনকে এই আসরে টেনে নিয়ে এল তাঁর নাম চন্দ্রহাস। সে এবার বলল, মাতুল বিতর্ক রাখো। হবে কোনও বৃদ্ধভাস। কম্পন আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধ, ও কি আমাদের বালকোচিত স্ফূর্তিতে সহজে যোগ দেয়? কামোদক নেহাত অনেক করে অনুনয় করেছে, তাই।

অকম্পনের সত্যই এধরণের লঘুচিত্তবিনোদন পছন্দ নয়। কিন্তু আসন্ন অভিযানের নিমিত্ত অন্তরে যে প্রচ্ছন্ন উৎকণ্ঠা জমা হয়েছিল, তা থেকে অব্যহতি পেতে আজ এই হাস্যতরল পরিবেশে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করতে তাঁর মন্দ লাগল না। কণ্ঠস্বরে আরোপিত গাম্ভীর্য এনে বলল, বিস্তর কাজ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব ছেড়ে আসতেই হল। কি করি, এক নির্বোধ ছাগশিশু যে আজ বলিপ্রদত্ত হতে উঠেপড়ে লেগেছে।

সকলেই উচ্চহাস্য করে উঠলো। অন্য সময় হলে কামোদক এর এক উচিৎ জবাব না দিয়ে ছাড়ত না। কিন্তু আজ সে বন্ধুদের অবাধ প্রশ্রয় দিতে অকুণ্ঠচিত্ত। তাঁর মৃদু হাসি দেখে চন্দ্রহাস উচ্চকণ্ঠে বলল, কামোদক কার জালে ধরা পড়ল তোমরা জানো কি?

বক্রায়ুধ বলল, তা আর জানিনা? নাম তার মধুমল্লিকা।

কামোদকের ভাবী বধূর কথা জানা গেল। কুলীন ঘর না হলেও তারা অবস্থাপন্ন এবং সম্ভ্রান্ত। গজানন শ্রেষ্ঠীর নাম নগরীতে বেশ পরিচিত, পাত্রী তাঁরই কন্যা। পোশাকি নাম মধুমল্লিকা, সবাই ডাকে মউলি বলে। রাজবাড়িতে যায়, বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও সে রানি ধ্রুবাদেবীর স্নেহপাত্রী এবং সহচরী।

কামোদক হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, "কিরে কম্পন, তুই কবে ধরা দিবি ভাই? বল তো দেখি, তোর মধুমল্লিকাটি কোন জ্যোৎস্নায় ফুটবে?

সবাই এবার নবোদ্যমে অকম্পনকে নিয়ে পড়ল। ধূমল বলল, কম্পন আমাদের মুখে বলে না, কাজে করে। কিরে কম্পন, বল তো ইতিমধ্যেই তুই তার দেখা পেয়েছিস কিনা?

নিতান্তই রসিকতা করে বলা কথা। কিন্তু আজ সন্ধ্যার সেই অভিজ্ঞতা অকম্পনের মানসপটে আর একবার স্ফুটিত হল। মনশ্চক্ষে ভেসে উঠলো সেই উদ্বিগ্ন দুটি আয়তনয়ন। সেই কি অকম্পনের মধুমল্লিকা?

কিন্তু সেকথা এই সভায় প্রকাশ করা সঙ্গত বোধ করলো না অকম্পন। মাথা দুলিয়ে দুঃখিতস্বরে বলল, জানি না ভাই কবে সে জ্যোৎস্নার উদয় হবে। কখনও হবে কি?

—হবে হবে, সান্ত্বনা দেয় বক্রায়ুধ, আমি বলি কি, এবার বসন্তে কামশাস্ত্রের অধ্যায়গুলো একটু পালটে দেখ না হয়!

চন্দ্রহাসের প্রসন্নতা ফিরে এসেছিল, উৎফুল্লস্বরে বলল, দেহতত্ত্বের অধ্যয়নে বৃথা কালক্ষয় করছ। এ বিষয়েও দুটি পঙক্তির টীকারচনা করেছিলাম একসময়ে, যার অর্থ, রূপ শ্রবণ, সঙ্গীত আঘ্রাণ ও সুবাস দর্শন করে কি লাভ? তার চেয়ে...

অকস্মাৎ বরাসনের এই রসঘন বৈঠক ভঙ্গ হল কামোদকের পিতার রুষ্ট উচ্চকণ্ঠস্বরে। দূর হতে তাঁর বক্তব্য অবশ্য সঠিক ধরা গেল না। কিন্তু দেখা গেল সম্মুখে দণ্ডায়মান কন্যাকর্তাকেই তিনি উগ্রস্বরে তর্জন করছিলেন। ভাবে ভঙ্গিতে স্পষ্টতই সে সম্ভাষণ খুব সম্মানজনক ছিল না। কন্যাকর্তা দীনভাবে ও ক্ষীণস্বরে তাঁকে আশ্বস্ত করবার প্রচেষ্টায় ক্রমাগত ব্যর্থ হচ্ছিলেন। অন্যান্য অনেকে মধ্যস্থতা করবার প্রয়াসে প্রচুর বাক্যব্যয় করছিলেন বটে, কিন্তু অবস্থা আয়ত্তে না এসে তা শুধু কোলাহলই বৃদ্ধি করছিল।

সময় যেমন যেমন মধ্যরাতের লগ্নাভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল, অকম্পন পূর্বেই লক্ষ করেছিল, অন্দরমহলে যেন একটি গুঞ্জন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কন্যাপক্ষের মধ্যে এক আশঙ্কিত অস্থিরতা। প্রথমটা একে বিবাহ-গৃহের সাধারণ উদ্বেগ বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু বাদানুবাদের মাঝে ক্রমশ যা প্রকাশ পেল তা রীতিমত চাঞ্চল্যকর।

কন্যা নিরুদ্দিষ্ট! বিবাহের লগ্ন সমাগত, অথচ বাগদত্তা কন্যাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!

॥ ৭ ॥

গজানন শ্রেষ্ঠীর গৃহে এই অভাবনীয় বিবাহ-নাট্যের অভিনয় যখন চলছিল, তখন নগরীর অপরপ্রান্তে এক মদিরালয়ের কোন নিভৃত কক্ষে শুরু হল অন্য আর এক প্রেমলীলা।

মধ্যরাত্রিতে পথঘাট জনশূন্য হয়ে এলেও মদিরালয়টি তখনও আসব-পিপাসুদের মদালস কণ্ঠের জড়িত কলস্বরে গুঞ্জরিত। ভৃত্যেরা মধ্যে মধ্যে মশালের আলো উসকে দিচ্ছিল, সশ্রীক পরিচারিকার দল ঘুরে ঘুরে আসবের শূন্যপাত্র পূর্ণ করে দিয়ে আসছিল আর জনাকয়েক নবীনা বন্দীশূলা হাস্যে-লাস্যে গ্রাহকদের নিকট হতে সুরার মূল্য সংগ্রহ করে আনছিল। দু'একটি ষণ্ডাকৃতি পুরুষ নজর রাখছিল, গ্রাহকেরা মূল্য নিয়ে দরদাম করতে গিয়ে উচ্ছৃঙ্খল হলে অথবা রসিকাদের সঙ্গে রঙ্গরসের মাত্রা অতিক্রম করলে তাদের বলপ্রয়োগে শান্ত করছিল। অগুরু-চন্দনের সুবাসিত ধূম্রজালে সুরার সুগন্ধ মিশ্রিত একটা শিথিল রসঘন আবহ মদিরালয়ের বাতাস ভারী করে রেখেছিল। এই মদিরালয়ের মক্ষীরানি ছিল নীলাঞ্জনা।

গণিকা নীলাঞ্জনার চোখের মণি কিন্তু নীল নয়, কালো। ঠিক কালোও নয়, গাঢ় বাদামী রঙের অনুষঙ্গে সে চোখের দৃষ্টি হয়েছে আরও মোহময়। তার অঙ্গের উজ্জ্বল তাম্রবর্ণের ত্বক অনার্যরক্তের পরিচয় বহন করছে। কিন্তু তাতে তার আকর্ষণ হ্রাস পায়নি, বরং নীলাঞ্জনার গাত্রবর্ণ তার বরতনুতে যুক্ত করেছে এক নিষিদ্ধ রহস্যের হাতছানি। তার চোখের দৃষ্টিতে ছিল অদম্য কামনার বিদ্যুচ্ছটা। যুগে যুগে এমন দৃষ্টিজালের কুহকে পুরুষ দিকভ্রান্ত হয়, কবি রচনা করেন কাব্য, আর রমণী হয় ঈর্ষাকাতর। নীলাঞ্জনার রূপের মোহে বহু রাজপুরুষ বাঁধা পড়েছেন। সে তাই সামান্য গণিকা নয়, তার মদিরালয় সম্ভ্রান্ত অভিজাতদের জন্যই চিহ্নিত ছিল। সাধারণ প্রাকৃতজনের আনাগোনা বড় একটা সেখানে ছিল না।

পুরাকালের গণিকাদের মধ্যে প্রসিদ্ধি পেয়েছেন আম্রপালী, বাসবদত্তা। নীলাঞ্জনাকে ইতিহাস মনে রাখেনি। কিন্তু তবু সে সামান্যা ছিল না। নয়তো সাধারণ গৃহস্থকন্যা হয়ে সে কুমার চন্দ্রগুপ্তের প্রণয়িনী হবার দুঃসাহস দেখাতে পারত না!

রাজকুমার চন্দ্রগুপ্ত তখন তরুণ। তাঁর অসামান্য সুকুমার ব্যক্তিত্বে হৃদয় হারিয়েছিল উজ্জয়িনীর এক নিম্নবিত্ত অনার্য পরিবারের উদ্ভিন্নযৌবনা কন্যা বিষ্ণুমালতী। তাতে ক্ষতি ছিল না, এমন হয়তো অনেক রমণীই ছিল। কিন্তু বিষ্ণুমালতী কোন এক দুর্লভ একান্ত মুহূর্তে নিজের দুর্বলতা প্রকট করে রাজকুমারকে স্বমুখে প্রেম নিবেদন করবার স্পর্ধা দেখিয়েছিল। অগ্নির সংস্পর্শে পতঙ্গের অথবা সুউচ্চ তালবৃক্ষ হতে পতনে ফলের যে দশা হয়, বিষ্ণুমালতী সামান্যা নারী হলে তার সেই অবস্থাই হত। তা হয়নি, কেননা সে সামান্যা ছিল না।

চন্দ্রগুপ্ত আদৌ নারীলোলুপ ছিলেন না, তদুপরি তখন তিনি গুরুনির্দেশে ব্রহ্মচর্যের এক ব্রতপালনে নিরত ছিলেন। বিষ্ণুমালতীর মোহজালে চন্দ্রগুপ্ত ধরা দেননি, মধুরবচনে কিশোরীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অবারিত হৃদয়ের দ্বার থেকে প্রেমাস্পদ ফিরে গেলে সে বড় লজ্জার। প্রত্যাখ্যানের লজ্জায় বিষ্ণুমালতী যদিও দু'চোখে অন্ধকার দেখেছিল, কিন্তু ভেঙ্গে পড়েনি। শুধু নিজের অবুঝ হঠকারিতায় অকলঙ্ক অতীতকে সে মুছে দিতে চেয়েছিল।

আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের অবজ্ঞা তাকে করে তুলেছিল নিষ্ঠুর। প্রতিশোধের জিঘাংসায় ভেসে গেল নারীত্বের আব্রু ও পবিত্রতা। বিষ্ণুমালতীর মায়াবি চক্ষে জ্বলে উঠলো অভিমানের আগুন। যে আগুন অনায়াসে ভস্ম করে দিতে পারে অখণ্ড পৌরুষের সুবিশাল দম্ভ। সুকোমল কিশোরী রূপান্তরিত হল কামনার প্রতিমূর্তিতে। কেউ জানলো না কখন বিষ্ণুমালতীর মৃত্যু হল আর তার চিতাভস্মে উৎপন্ন হল নীলাঞ্জনা। স্ফুরিত বহ্নিকণার মতো রূপের অন্তরালে বরণীয় পুরুষমাত্রকেই অবনত করবার সংকল্প নিয়ে ধিকিধিকি জ্বলতে থাকল

এক কঠিন মানবীহৃদয়।

নীলাঞ্জনার গৃহে গণ্যমান্য অতিথির আগমন কিছু বিরল ঘটনা নয়। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় তার অতিথিটি ছিলেন সবার চেয়ে স্বতন্ত্র।

বেশ খানিক আগে সূর্যাস্ত হয়েছে, গণিকালয়টি তখন অনেক মশালের আলোকসজ্জায় সজ্জিত হয়ে প্রসাধিত নবযুবতীর মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। শুরু হয়েছিল একটি-দু'টি অতিথির আনাগোনা। তারি মাঝে মহামাত্য বিশঙ্কদেবের অভাবনীয় আগমন ঘটেছিল এই আবাসে! তারপরেই নীলাঞ্জনার জীবনের উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়ে যায়।

অপ্রত্যাশিত অতিথির আবির্ভাবে স্তম্ভিত হয়েছিল নীলাঞ্জনা। বহুকাল পরে অতীতের স্নেহময় অভিভাবকের নিকট যে উষ্ণতা সে আশা করেছিল, বিশঙ্কদেব তদনুরূপ কোনও আবেগ প্রকাশ করলেন না। নীলাঞ্জনা সসম্ভ্রমে আপ্যায়ন করতে এলে বিশঙ্কদেব তাকে নিরস্ত করেন। গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন, অযথা ব্যস্ত হয়ো না বৎস। নটীর আতিথ্য বা সৎকারে আমার কোনও আকর্ষণ নেই জেনো, কিন্তু তোমাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন বিষ্ণুমালতী।

বিষ্ণুমালতী! নীলাঞ্জনার বুকের মাঝে এক অন্ধ আবেগ তোলপাড় করে উঠেছিলো। বহুবর্ষব্যাপী এ নামে তাকে কেউ সম্বোধন করেনি! এই নামে যে বেঁচেছিল তার অশ্রু-শোণিত জমাট বেঁধে আজ গরলে পরিণত হয়েছে। সে বিষের জ্বালায় বিষ্ণুমালতী যে নীল হয়ে গেছে!

বিশঙ্কদেব অল্পকথার মানুষ। কোনও গৌরচন্দ্রিকা না করেই বললেন, আমি জানি, নীলাঞ্জনা নয়, তুমি বিষ্ণুমালতী। আমি তোমাকে কোনও আদেশ দিতে আসিনি, কোনও পার্থিব বস্তুর কামনায়ও আসিনি। আমি শুধু তোমার অতীতকে তোমার সামনে প্রস্তুত করতে এলাম। আর হয়তো সময় পাব না, ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে গেছে। আমার কথা শোনার পরে ইচ্ছামতো তোমার কর্মপন্থা তুমিই নির্ধারণ করে নিও।

তারপর নীলাঞ্জনা চমৎকৃত হয়ে শুনেছিল তার হারিয়ে যাওয়া অতীতের সেই রক্ত-ঝরা অধ্যায়।—

বিশঙ্কদেব বিদায় নেবার অনেকক্ষণ পরেও তাঁর কথাগুলি নীলাঞ্জনার কানে গুঞ্জরিত হচ্ছিল, হূণকন্যা তুমি। আমার কথায় হয়তো তুমি বিশ্বাস করবে না, কিন্তু তোমার গাত্রবর্ণকে তুমি অস্বীকার করবে কি করে? আমি ধর্ম সাক্ষী করে বলতে পারি, সে রাত্রে তোমার পিতার কোনও অপরাধ ছিল না। তুমি তোমার জন্মদাতার সম্পর্কে কতটা সংবেদনশীল, আজ এতদিন পরে এ প্রশ্ন হয়তো অবান্তর। কিন্তু জেনে রেখো, আজও তার আত্মার শান্তি হয়নি। কন্যারূপে তোমার পিতৃদায়টুকু স্মরণ করিয়ে দিতেই আজ আমার এখানে আসা। এরপর তোমার ইচ্ছা। তোমার কর্তব্য তুমিই স্থির করো। শুধু মনে রেখো, দত্তসেন তোমার পিতৃহন্তা!

নীলাঞ্জনা স্তব্ধ হয়ে শুনেছে বিশঙ্কদেবের কথা। আর সেই থেকে বড় অস্থির হয়েছে সে।

স্মরণকালে পিতার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়নি, তাহলে বিশঙ্কদেবের বাক্যে সে এতটা উদ্বেলিত হচ্ছে কেন? কেন মনে বার বার কশাঘাতের মতো উচ্চারিত হচ্ছে তাঁর পিতা নেই, কারণ দত্তসেন আজও জীবিত? কেন? কে তাকে এই অধিকার দিয়েছে? রাবেলার কন্যা জীবিত থাকতে কেন রাবেলার হত্যাকারী এখনও এই পৃথিবীতে শ্বাস নিচ্ছে? এই অধিকার ছিনিয়ে নিতে নীলাঞ্জনা কি আরও বিলম্ব করবে?

দত্তসেন অকৃতদার, তবে বেশ কয়েকটি উপপত্নী আছে তার। কিন্তু এই রাজপুরুষের জীবনের রশি বাঁধা আছে নীলাঞ্জনারই দুয়ারে। সে ব্যক্তি নীলাঞ্জনার বড়ই রূপাসক্ত গুণগ্রাহী। নীলাঞ্জনা আহ্বান করলে দত্তসেন তো পৃথিবীর অপরপ্রান্ত থেকেও ছুটে আসবে তার পদতলে। আর বিস্ময়ের বিস্ময়! আজই রাত্রে নীলাঞ্জনার আতিথ্যের প্রস্তাব দিয়েছেন, স্বয়ং দত্তসেন নিজে।

ঝড় থেমে গিয়ে প্রকৃতি শান্ত হলে বাতাস অনেক স্বচ্ছ হয়ে যায়, অনেক কিছু পূর্ব অপেক্ষা বেশি স্পষ্ট দেখা যায়। নীলাঞ্জনার ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ হৃদয় যখন একটু স্বাভাবিক হল, সেও দেখতে পেল নিয়তির অমোঘ বিধান। স্পষ্ট অনুভব করলো আজ এই রাত্রির জন্যই বুঝি তাঁর পিতা রাবেলা এতকাল অপেক্ষা করে আছে!

তাই আজ সেই বিশেষ অতিথিকে আপ্যায়নের জন্য সাগ্রহে প্রস্তুত হচ্ছিল সে। মধ্যরাতের কিছু আগেই বিক্রিবাটার ভার এক সহকারিণীকে দিয়ে ভবনের দ্বিতলস্থ শয়নকক্ষে নীলাঞ্জনা সে রাত্রের অভিসারের প্রস্তুতি সেরে নিল। মাননীয় উপসেনাপতি আসবেন বলে কথা। আসবেন এবং ফিরে যাবেন না! দ্রুতগতিতে আনুষঙ্গিক সব নিবন্ধন করে নিল নীলাঞ্জনা। কবরীবন্ধনে যূথীমাল্য, আঁখিতে কাজল ও অঙ্গের অলক্তরাগে নিজেকে সজ্জিত করে নিল সমুচিত শৃঙ্গারসজ্জায়।

পানভোজনের নানান সামগ্রীর মাঝে ছোট্ট এক স্ফটিক ভৃঙ্গারে ছিল হলুদাভ এক পানীয়। ছোট্ট স্ফটিকপাত্রটি আজ অনেক দিন পরে সে বার করেছে। এ জিনিস গণিকাদের সংগ্রহে রাখতে হয়। নাগজীহ্বিকার তীব্র আরক! যে পরিমাণ বিষ ঐ পাত্রে আছে, তা দিয়ে দত্তসেনের মত দশ জনকে চিরনিদ্রায় শুইয়ে দেওয়া যায়।

গোলাপজলের সিঞ্চনে সুরভিত শয্যা প্রস্তুত করেছিল স্বর্ণাঙ্কিত সূক্ষ্ম কার্পাসে। পত্রপুষ্পে সজ্জিত ছিল কক্ষ ও অন্যান্য আসবাব। তারপর দরজাটি আটকে দিয়ে বাতায়নপথে অধীর আগ্রহে চোখ রেখে প্রতীক্ষা করছিল নীলাঞ্জনা।

অতিথি এল অনেক রাত্রে। দরজা খুলে দিয়ে অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিল নীলাঞ্জনা। রাজপুরুষেরা গণিকালয়ে আসতেন আবৃত মুখে। কক্ষে প্রবেশ করে মুখের আবরণ সরালেন উপসেনানায়ক দত্তসেন। শয্যায় বসে নীলাঞ্জনার মান ভাঙাতে মিষ্টস্বরে তিনি বললেন, আমাকে কাছে ডাকবে না, অঞ্জনা?

নীলাঞ্জনা কপট নির্লিপ্ততায় বাতায়নের বাইরে চেয়ে রইল। দত্তসেন আবার বললেন, আজকের এই রাত কি তাহলে বৃথা যাবে? সব কথা শুনলে কিন্তু তুমি আমার প্রতি এতো নির্দয় হতে না প্রিয়ে।

নীলাঞ্জনা তবু নিরুত্তর। অতিথি এবার একটু অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, আমি তবে ভগ্নহৃদয়ে বিদায় নিলাম।

—একটু দাঁড়ান আর্য, চলেই যদি যাবেন, এ হতভাগীর প্রাণটা নিয়েই যান। অবশেষে মুখ খোলে নীলাঞ্জনা, আপনার ঐ তরবারির ফলায় শেষ করুন না প্রণয়ের এই মিথ্যা অভিনয়।

আজকে রাতের এই অভিসারপর্বের নিমিত্ত মাত্রাতিরিক্ত পারিশ্রমিক ও উপঢৌকন আগেই সংগ্রহ করা ছিল। অতিথি বিদায় নিলেও নীলাঞ্জনার কোন ক্ষতি হোতো না। কিন্তু আজকে তাঁকে বিদায় দেবে কী করে? বিশিষ্ট গ্রাহককে অপ্রসন্ন করার মতো নির্বোধ কি সে! তাই দুই বাহু দিয়ে দত্তসেনের কণ্ঠবেষ্টন পূর্বক তাঁর পালাবার সব পথ বন্ধ করে ললিতকণ্ঠে ঢেলে দিল তার নারীত্বের সব ছলনা, আপনার দেরি হওয়াতে যে এই হতভাগিনীর প্রাণ যেতে বসেছিল সে সংবাদ রাখেন?

দত্তসেন গাঢ়স্বরে বললেন, প্রিয়তমে...

তারপর চলল একপ্রস্ত মান-অভিমানের ছলা-কলা। দত্তসেন তাঁর বিলম্বের যেসব অজুহাত দিলেন, নীলাঞ্জনা জানে তা সর্বৈব মিথ্যা। তবু সন্তুষ্ট হওয়ার অভিনয় করে বলল, সর্বদাই ব্যস্ত আপনি। আমি কি তাহলে কেউ নই?

—তুমিই তো আমার সর্বস্ব প্রিয়ে, দত্তসেনের মধুর স্বরে প্রবোধের ছলনা। মিথ্যার অভিনয় সমাপ্ত করে দত্তসেন বললেন, আমাকে আসব দেবে না প্রিয়ে?

নীলাঞ্জনা স্বর্ণভৃঙ্গারে মদিরা ঢেলে রাজপুরুষের দিকে এগিয়ে দিল। অন্তিম পানীয়টি এখনই নয়, তার জন্য রজনীর অনেক প্রহর বাকি। দত্তসেন একাদিক্রমে কয়েকপাত্র মদিরা গলাধঃকরণ করে শয্যায় অঙ্গরক্ষা করলেন। নীলাঞ্জনা বলল, আজ রাতে অভাগীর এই সৌভাগ্যোদয়ের কারণ জানতে পারি আর্য?

—আর বোলো না। রাজাদেশে কালান গড় যাচ্ছি। কঠিন রাজকার্য। কবে ফিরব জানি না। তাই যাবার আগে দেবীর প্রসাদ পেতে বড় আগ্রহ হল।

—হয়েছে হয়েছে, নারীর মনোহরণ বিদ্যা যেন লোকে আপনার থেকেই শেখে। কিন্তু এলেন যদি, সেকি এই বিরহের জ্বালাটুকুই দেবার জন্য? কী এমন রাজকার্য, প্রাণেশ্বর?

দত্তসেনের মস্তিষ্কে তখন আসবের ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। চারপাশে স্বপ্নময় নূপুরনিক্বণ। যদিও তিনি জানতেন রাজাদেশ অতিশয় গোপনীয়

এবং তিনি এর মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিয়েছেন, তবুও কেন জানি মনে হল এই মুহূর্তে নীলাঞ্জনা তাঁর বড় আপন। তাকে সব কথা অনায়াসেই বলা যায়। জড়িত স্বরে তিনি বললেন, এক পাপিষ্ঠকে হত্যা করতে হবে প্রিয়সখি। অথচ কি করে তা করবো ভেবে পাচ্ছি না। সেসব পরিকল্পনা করতেই শৌনকের কাছে গিয়েছিলাম। তাই তোমার কাছে আসতে দেরি হয়ে গেল।

সোমরসের কৃপায় প্রকৃত কথা প্রকাশ হচ্ছে। চকিতে নীলাঞ্জনা কঠিন হয়ে গেল। একথা অনেকেই জানে, গণিকা ও গ্রাহকের সম্পর্ক কখনোই মধুর হয় না, বিশেষত গ্রাহক যদি রাজপুরুষ হয়। মত্তাবস্থায় প্রেয়সীর ক্রোড়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরও নিষেধের বেড়া ভেঙ্গে যায়। ইতিপূর্বে অনেক রাজন্যবর্গের স্খলিত গুপ্তকথা নীলাঞ্জনা শুনেছে। কিন্তু তা আজকের মতো ভয়াবহ নয়। নরহত্যা করতে চায়, সে কথা মুখ ফুটে বলতেও ভয় নেই নির্লজ্জ নরাধমটার! নীলাঞ্জনা মনে মনে দত্তসেনের মুণ্ডপাত করে নিলো। কিন্তু মুখে কিছু বলল না, আরও কিছু যদি জানা যায় সেই আগ্রহে।

দত্তসেন তখনও বলে চলেছেন, সমস্যা হল, আমি তার কাছে কোনও অস্ত্র নিয়ে যেতে পারব না। অস্ত্র বিনা, বল প্রিয়ে, কারওকে হত্যা করা যায়? তুমিই বলো। অবশ্য তোমার কথা স্বতন্ত্র। তুমি তোমার ঐ চোখ দুটির সাহায্যে একশো পুরুষের প্রাণ নিতে পারো। কিন্তু আমার তো সে চোখ নেই। আমাকে তোমার ঐ চোখ দুটি ধার দেবে সখি, দু'দিনের জন্য, কথা দিচ্ছি, দু'দিনের মধ্যেই তোমার সম্পত্তি আমি আবার ফিরিয়ে দেব তোমার কাছে।

নীলাঞ্জনার ঘৃণা হচ্ছিল। একবার মনে হল, পাষণ্ডটাকে এখনই শেষ করে দেয়। কিন্তু তা না করে আরও কথা জানবার জন্যে লাস্যভরে বলল, আমার যদি সে ক্ষমতাই আছে মনে করেন, তাহলে আমার কাছে আসেন কেন আর্য? আপনি ভয় করেন না, আমি যদি আপনার প্রাণ নিই?

—আমি তো তোমার চরণে মরেই আছি, সুন্দরি, আমায় আর নতুন করে মারবে কিভাবে? দত্তসেন হাস্যতরল কণ্ঠে বললেন, তার চেয়ে বলো না আমি কীভাবে কৃতকার্য হই?

—নরহত্যা করতে বীর সেনানায়কের কি আজ স্ত্রীলোকের সাহায্য প্রয়োজন হল? কে সেই পরাক্রমী হতভাগ্য?

—চন্দ্রগুপ্ত।

নীলাঞ্জনা যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হল। একটা সূচীমুখ শলাকা যেন একেবারে তার মর্মস্থলে প্রবিষ্ট হল। কালের প্রবাহে যে ক্ষতের ওপর বিস্মৃতির প্রলেপ পড়েছিল, সহসা আবার তা রক্তমুখ হয়ে উঠলো। প্রতিহিংসার তপ্ত বাতাসে উড়ে গেল বিস্মৃতির কুহেলিকা। একদা যে নাম বিষ্ণুমালতীর হৃদয়ে ঝড় তুলেছিল, সেই নাম আজ আগুন ধরাল ঝড়ের শুষ্ক ঝরাপাতায়।

দত্তসেন চলেছে চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করতে! নীলাঞ্জনার হৃৎরক্ত আবার ছলকে উঠে জানাল, এই তো সুযোগ। কানে ভেসে এল বিষ্ণুমালতীর লজ্জা বিসর্জন দেওয়ার কান্না। সে লজ্জার যে মূল্য দেয়নি, সেই নির্মম কিম্পুরুষ আজ দত্তসেনেরও লক্ষ্য! তার সহায়তা করলে তো অন্তে নীলাঞ্জনারও লক্ষ্যবেধ হয়। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুবাণটি কালানে দত্তসেনের হাতে পৌঁছে দেওয়া নীলাঞ্জনার আয়ত্তের অতীত নয়। এখনই এক দণ্ডের মধ্যে সে ব্যবস্থা হতে পারে।

কিন্তু পিতৃহত্যার প্রতিশোধ? তার জন্য ত্বরা কী? দত্তসেন নীলাঞ্জনার মোহপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। শিকার আবার আসবে শিকারির জালে। আপাতত অতিরিক্ত কয়েকটা দিনের পরমায়ু সে দান করতেই পারে এই পাপিষ্ঠকে।

সোহাগের স্বরে দত্তসেনকে নিশ্চিন্ত করার ছলে নীলাঞ্জনা বলল, আপনার কার্যসিদ্ধি হয়ে যাবে আর্য। ওখানে কার সঙ্গে সম্পর্ক করতে হবে তার নামটা শুধু বলে দিন।

—কর্ণিক তার নাম। আমার নাম করে বোলো..., ধীরে ধীরে দত্তসেনের কণ্ঠস্বর তলিয়ে গেল নিদ্রার অতলে।

নীলাঞ্জনা পূর্ণদৃষ্টিতে একবার শয্যায় নিদ্রিত দত্তসেনের মূর্তি অবলোকন করে নিল। ঐ তার পিতৃহন্তা! এই রকমই নিদ্রাতুর ছিল রাবেলা যখন অকস্মাৎ মৃত্যু নেমে এসেছিল তার অদৃষ্টে। প্রতিরোধটুকু করার অবকাশ পায়নি হতভাগ্য! শায়িত দত্তসেনকে মনে হল যেন একটা কৃমিকীট শুয়ে আছে। নিদ্রা যাও দত্তসেন, নীলাঞ্জনার মুখে একটা কষায় হাসির রেখা দেখা গেল, গভীর নিদ্রায় ডুবে থাকো পাষণ্ড আর ক'টা দিন, তাহলে অল্প কষ্টে বিদায় নিতে পারবে।

রাত্রি তখনও তৃতীয় প্রহরে, সূর্যোদয়ের দেরি আছে। উত্তরীয় জড়িয়ে নিয়ে একটি প্রদীপ হাতে নীলাঞ্জনা কক্ষ থেকে নির্গত হল। নিঃশব্দে দুয়ারের পাল্লা টেনে দিয়ে ক্ষিপ্রপায়ে সোপান বেয়ে নীচে অবতরণ করতে শুরু করলো।

দুটি তল পেরিয়ে এসে ভূমিতলের নীচে একটি অনুভূমিক সুড়ঙ্গ বেয়ে চলল সে। খানিক চলার পরে সুড়ঙ্গ শেষ হল এক দরজার সম্মুখে। দরজা খোলাই ছিল, সেই পথে এক গুপ্ত কক্ষে প্রবেশ করে তীক্ষ্ণ, কিন্তু হ্রস্বস্বরে নীলাঞ্জনা আহ্বান করলো, ভীম, ভীম, কোথায় তুই?

ক্ষণিকের মধ্যে একটি খর্বাকৃতি লোক এসে চক্ষু মার্জনা করতে করতে বলল, বলুন আয়ি, কি আদেশ?

ভীম নীলাঞ্জনার চর। নাম তার ভীম হলে কি হয়, আকারে অতি শীর্ণ ক্ষুদ্রকায়। ছোট্ট প্রদীপের স্বল্পালোকে মানুষটিকে অল্পবয়সি বালক বলেই ভ্রম হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে এক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি। শরীরের তুলনায় মাথাটি বেশ বড়। তার উপরিভাগের ইন্দ্রলুপ্তটি ঘিরে আছে কিছু রজত-কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ। লোকটি আকৃতিতে তার নামের অনুরূপ না হলেও কর্মদক্ষতায় সে নীলাঞ্জনার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। গোপনে সংবাদ আদান-প্রদান করা তার কাজ। সেকালে গণিকারা এই ধরনের লোক পালন করতো বেতন দিয়ে। নীলাঞ্জনা চাপাস্বরে দ্রুত বলে গেল, সত্বর সন্ধান কর, কালান গড়ে পঞ্চকর্ণ এখন কোথায়। তারপর সেই সংবাদ পৌঁছে দিতে হবে সেনাপতি দত্তসেন অথবা তার অনুচর কর্ণিকের কাছে।

কাজ সেরে নীলাঞ্জনার ফিরে আসতে এক দণ্ডও লাগেনি। নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে সে দেখল, ইতিমধ্যেই দত্তসেনের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। বাতায়নের সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, প্রশ্ন করলেন, আমাকে একলা ফেলে কোথায় গিয়েছিলে প্রিয়ে?

—আপনারই কাজে আর্য। কালান গড়ে নিরাপদ মারণাস্ত্রের সন্ধান আপনি যথাসময়েই পেয়ে যাবেন।

দত্তসেনের অধরোষ্ঠে একটু হাসির আভাষ। পিছনদিকে হস্তবদ্ধ হয়ে তিনি নীলাঞ্জনার কাছে এগিয়ে এলেন। প্রসন্নস্বরে বললেন, আমি জানতাম তুমি আমাকে নিরাশ করবে না। নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু মধ্যরাত্রির আর তো বিশেষ অবশিষ্ট নেই। প্রভাতেই আমি নগরী ত্যাগ করব। আর কালক্ষেপণ কেন? এসো, আমার হাত থেকে তোমার পানীয় গ্রহণ করো।

রাজপুরুষ তাঁর রমণীর নিমিত্ত পানীয় প্রস্তুত করেই রেখেছিলেন। রজত ভৃঙ্গারটি দুই হাতে ধরে মদির দৃষ্টিতে দত্তসেনের প্রতি খানিকক্ষণ চেয়ে রইল নীলাঞ্জনা। উদগ্র কামনায় উদগ্রীব দত্তসেন বলল, আজ শৃঙ্গারে বড় আনন্দ, অঞ্জনা।

গ্রাহকের আগ্রহ বিমুখ করে না হট্টবিলাসিনী। নির্দ্বিধায় পাত্রের তরলটি গলায় ঢেলে দিল নীলাঞ্জনা। আসবের তীব্রতা যেন বড় বেশী, স্বাদেও তা মনে হল কটু। তরল অগ্নির মতো তা নীলাঞ্জনার খাদ্যনালীতে অবতরণ করল।

দুই হাত প্রসারিত করে গাঢ়স্বরে দত্তসেন বলে, এসো প্রিয়ে, আমায় আলিঙ্গন করো তোমার অন্তিম শৃঙ্গারে। তারপর আমাকে বিদায় দাও।

অন্তিম শৃঙ্গার! অকস্মাতই নীলাঞ্জনার দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। আসবের ক্রিয়া কি এত দ্রুত হয়? আর আসবের ক্রিয়ায় বুকের মাঝে এই অসহনীয় জ্বালা হবে কেন? শ্বাস নিতে এতো কষ্ট হচ্ছে কেন? সম্মুখের দৃশ্যপট অন্ধকার হয়ে আসছে কেন?

নীলাঞ্জনার মস্তিষ্কের ক্রিয়া শিথিল হয়ে আসছিল, তারই মধ্যে সে অনুমান করে তার আসব বিষাক্ত ছিল। ভগ্নস্বরে আর্তনাদ করে সে, আমাকে কি পান করালি, নরাধম?

—একটা কথা এখনও বলা হয়নি প্রিয়ে। তুমি দুঃখ পাবে ভেবে

এতক্ষণ বলিনি...

দত্তসেন দন্তপিষ্ট কষায়কঠোর স্বরে বলে, নগরীর পথে কানাঘুষোয় শুনেছিলাম, আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে। আমি বিশ্বাস করিনি, কিন্তু তোমার কাছে এসে এইটা দেখে মনে হল সে কথা হয়তো মিথ্যা নয়, তাই একটু ছলনার আশ্রয় নিতে হল সখী।

এই বলে দত্তসেন পিছন থেকে তার হাত সম্মুখে এনে তুলে ধরলেন। দুই অঙ্গুলির মাঝে সেই ছোট্ট স্ফটিকপাত্রটি ঝিকমিক করে উঠলো। হলুদাভ তরলটি আর তাতে নেই!

সর্বনাশ! পাষণ্ড কীভাবে এর সন্ধান পেলো? মনের ভুলে এটিকে লুকিয়ে রেখে যায়নি নীলাঞ্জনা। এখন সভয়ে শ্বাস নিয়ে পিছিয়ে যেতে গেল সে। কিন্তু আর কোনও অঙ্গসঞ্চালনের শক্তি তার অবশিষ্ট ছিল না। অশক্ত দু হাত একবারের জন্য সম্মুখে প্রসারিত হল দত্তসেনের কণ্ঠ অভিমুখে। তারপরই তার দেহ শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়ল পালঙ্কে।

নীলাঞ্জনার দীপ্তচক্ষু ক্রমশ কোমল হয়ে এলো। অধরোষ্ঠ বিভাজিত হয়ে গড়িয়ে পড়ল রক্তরেখা। দৃষ্টির বহ্নিশিখা স্তিমিত হয়ে গেল ধীরে ধীরে।

॥ ৮ ॥

সেদিন পূর্ণিমা। আকাশে পূর্ণচন্দ্র, বনানীর পাতায় পাতায় জ্যোৎস্নার রজতরেখা আর সরোবরে চন্দ্রমার টলটলে ছায়া। ধ্রুবাদেবী সে রাত্রেও একাকী অলিন্দের কিনারায়। সেই সন্ধ্যার পর মহারাজ আর আসেননি। রাত্রে এসেছে তাঁর বার্তা। তার প্রতিটি অক্ষর টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে মহাদেবীর সমগ্র চেতনায়। অশ্রুবিন্দু যেন ছিন্নসূত্র সাতনরী হারের মোতির মতো ঝরঝর করে ছড়িয়ে পড়েছে অন্তর্মহলের মর্মরপট্টে।

অনেক কেঁদেছেন রানি, চক্ষে শেষ হয়ে গেছে জলের ধারা। সন্তাপে শুষ্ক হয়েছে নয়ন সরসী। হতাশা বসেছে আজ মন জুড়ে, বিদায় নিয়েছে সকল সরসতা। তাই আজ পূর্ণিমার আকাশেও নেমেছে অমাবস্যার অন্ধকার, পত্রপুষ্পে ঝিকমিক করা শিশিরকণা যেন সমবেদনার অশ্রুজল আর বসন্তের বাতাস শুধুই বয়ে নিয়ে চলে দীর্ঘশ্বাস।

রঙ্গিণী এসে চুপিচুপি বলল, চারু এসেছে রানি, তোমায় কিছু বলতে চায়।

চারু রন্ধনশালার কর্মী, সেখানে কিঙ্করীদের নেত্রী। মধ্যযৌবনা, খররসনা কিন্তু রন্ধনশিল্পে অতিনিপুণা।

চারু আবার এসময়ে আমায় কি বলতে এলো, চল তো দেখি, বলে মহারানি নীচে অবতরণ করলেন।

চারু তাঁকে দেখে কুণ্ঠিত ভাবে বলল, একটা নিবেদন ছিল রানিজি।

—কি বলবি, বল না?

—বলতে বড়ই লাজ লাগে যে।

—আমার কাছে আর লজ্জা করিস না। বল কি বলবি?

—কি করে বলি? লজ্জায় মরে যাই—

—তাহলে থাক, বলিস না। আমি চললাম—রানি গমনোদ্যত হলেন।

—না না, বলছি বলছি—

এইরকম বারকয়েক 'বলি-কি-না-বলি' করে অবশেষে অজস্র বাক্যবিন্যাসে চারু যা বলল, তার মর্মকথা হল, পিতৃগৃহ থেকে সম্প্রতি চারুর কনিষ্ঠা সহোদরা চিকা এসেছে তার কাছে। তাতে সমস্যা কিছুই ছিল না, কিন্তু চারুর স্বামীকে নিয়ে হয়েছে গোলযোগ। চারুর স্বামী এমনিতে খুবই সজ্জন, সন্তানের পিতা এবং চারুকে অত্যন্ত ভালোবাসে। কিন্তু কিছুদিন হল চিকার প্রতি সে কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। তাতেও ক্ষতি ছিল না, পুরুষের অমন একটু-আধটু হয়েই থাকে। সামান্য বলপ্রয়োগেই চারু স্বামীকে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম, কত ধান্যে কি পরিমাণ তণ্ডুল পাওয়া যায়। এতাবৎ কি সে প্রেম-ভালোবাসা ও প্রতিযোগের উচিত প্রয়োগে স্বামীকে তার বশংবদ করে রাখেনি?

কিন্তু সমস্যা হয়েছে চিকাকে নিয়ে। কন্যা বড়ই চপলা, উদ্ভিন্নযৌবনা এবং তাদের সমাজের মাপদণ্ড অনুযায়ী ঘোর সুন্দরী। তদুপরি সে তার জামাতৃপূর্বের অতিশয় প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠেছে। তার স্বভাব অত্যন্ত পুরুষকামী এবং নানাবিধ ছলা-কলা দ্বারা চারুর স্বামীকে ক্রমাগত প্রলুব্ধ করছে। এমতাবস্থায় চারুর আশংকা, যে কোনও মুহূর্তে তার স্বামীর পদস্খলনের আশঙ্কা! সম্প্রতি চারুর মুষ্টিযোগের প্রতিও সে অপ্রত্যাশিতরূপে নির্ভীক হয়ে উঠেছে। চারু নানাভাবে জেনেছে যে, তার অনুপস্থিতিতে দুজনে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করছে। অবিলম্বে এর কোনও বিহিত না করলে চারুর চরম দুর্গতির আশংকা! এমতাবস্থায় কি করা যায় বুঝতে না পেরে চারু মহারানির শরণাপন্ন হয়েছে।

শুনতে শুনতে রঙ্গিণীর বড়ই হাসি পাচ্ছিল এবং বহু দুঃখের মাঝে ধ্রুবাদেবীরও অধরকোণে দেখা দিল হাস্যরেখা। কিন্তু সংযত গাম্ভীর্যে মহারানি সব শুনে বললেন, তুই তোর স্বামীকে ভালো করে বুঝিয়ে বল।

চারু জানাল সে চেষ্টায় কোনও ত্রুটি করেনি, কিন্তু কোনও ফল হয়নি। তখন মহারানি বললেন, তাহলে তোর বোনকে বেশ করে ধমকে দে।

কপালে হাত রেখে চারু বলল, কি আর বলি রানিজী, বোন আমাদের সবার ছোট। মাতা-পিতা, ভ্রাতাদের এবং আমারও বড় প্রিয়। তাকে বেশী বকাঝকা করতে পারি না। তাছাড়া কচি মেয়েকে এসব লজ্জার কথা আর কতো বোঝাবো বল দেখি?

দেখতে গেলে সমস্যা তেমন গুরুতর নয়। সেসময়ে দুই ভগ্নীর একই পুরুষের ঘরণী হওয়া খুব গর্হিত কিছু ছিল না। কিন্তু চারুকে নিতান্তই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখে মহারানি বললেন, আচ্ছা যা, কাল চিকাকে আমরা কাছে একবার পাঠিয়ে দিস। আমি ওকে যা বলবার বলে দেবো।

মহারানির কাছে এই আশ্বাস পেয়ে হৃষ্টচিত্তে গ্রীবা হেলিয়ে চারু প্রস্থান করলো। রঙ্গিণী ও ধ্রুবাদেবী পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। রঙ্গিণী হেসে বলল, কি ব্যবস্থা করবে রানি?

সম্রাজ্ঞী এখন কোনও সমস্যার কথা আর চিন্তা করতে চাইছেন না। মসীভাবুক চিত্ত একটু চিন্তামুক্ত হতে চাইছে। শুষ্ক হাস্যে ধ্রুবাদেবী বললেন, কি জানি, দেখি ভেবে কি করা যায়। এখন সরোবরের ধারে একটু বসবো। তুই এখন যা। আর আলোগুলো নিভিয়ে দিয়ে যাস।

কষ্টিসমাকুল জীবনাবর্তে আলোকোজ্জ্বল বাতাবরণ আর ভালো লাগছিল না মহারানির। তমিস্রার একটা শমনীয় প্রভাব আছে, মনস্তাপের তরঙ্গ অনেকটা সহনীয় হয়ে যায়। রঙ্গিণী পরিচারিকাদের নিয়ে অনেকগুলি মশাল ও প্রদীপ নিভিয়ে দিল। ধ্রুবাদেবী অন্ধকার অলিন্দ পেরিয়ে জ্যোৎস্নালোকিত সরোবরের কিনারায় এসে দাঁড়ালেন।

মলয়ানিল বয়ে চলেছে জলাশয়ের উপরিতলে মৃদুমন্দ কম্পন তুলে। পাথরে বাঁধানো ঘাটের ধারে রৌপ্যকলসগুলি চাঁদের আলোয় ঝকমক করছে। আর ঘাটের একটি ধাপ নীচে জলের দিকে ফিরে বসে আছে, এক রমণীর মূর্তি!

সে মউলি। শ্রেষ্ঠী গজাননের কন্যা। মউলি মহারানির প্রিয়তমা নর্মসহচরী। সদ্যফোটা গোলাপের মতো নিষ্পাপ বালিকাটি মহারানির হৃদয় জয় করেছিল। তাঁদের মাঝে বয়সের যে ব্যবধান তা তাঁদের সখ্যতার অন্তরায় হয়নি, বরং বয়ঃকনিষ্ঠা এই সহচরীটির জন্য ধ্রুবাদেবী এক অদ্ভুত বাৎসল্য অনুভব করতেন। রানির অন্দরমহলে ছিল মউলির অবাধ গতি। সম্রাজ্ঞীর ঐশ্বর্য নয়, তাঁর স্নেহসিক্ত প্রশ্রয় ছিল এই সরল কিশোরীর একান্ত আশ্রয়।

মউলির মাথায় হাত রেখে মহারানি প্রশ্ন করলেন, একি মউলি! তুই কখন এলি? কোথায় ছিলি? আর এত রাত হল, এখনও ঘরে ফিরিসনি?

ধীরে ধীরে ধ্রুবাদেবীর হাত ধরে উঠে দাঁড়ালো মউলি। বলল, জলে কেমন চাঁদের ছায়া পড়েছে দেখেছো দিদি? আমি তো সেই কখন থেকে তাই দেখছিলাম। এই জ্যোৎস্নারাতের নিস্তব্ধতা তোমার মনে ভালোবাসা জাগায় না রানিদিদি?

মহারানি সহসা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ভালোবাসা? অকুণ্ঠ ভালোবাসায় হৃদয় পূর্ণ করে অহর্নিশ যে মানুষটি তাঁর অন্তরের ধ্যানলোকে বিরাজ করে, ইহজন্মে হয়তো তার সঙ্গে আর দেখা হবে না। মউলি সেসব জানে না, জানার কথাও নয়। অবোধ বালিকা তার কিই বা বুঝবে? আত্মবিস্মৃত স্বরে তিনি শুধু বললেন, আজ তোর মুখে একি প্রশ্ন মউলি? ভালবাসার তুই কি জানিস?

—কেন জানবো না রানিদিদি? মউলির মুখে সুখের হাসি, উদ্ভিন্ন

অধরোষ্ঠের ফাঁকে দশনপংক্তির নক্ষত্ররাজি সাজিয়ে সে বলল, আমি কি আর ছোট্টটি আছি?

অভূতপূর্ব এক স্নেহরসে ধ্রুবাদেবীর হৃদয় পূর্ণ হল। দু'হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে মউলির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ওমা, তাই বুঝি? দেখি তো, আমার ছোট্ট মউলি আজ কতো বড় হয়ে গেছে?

জ্যোৎস্নার আলো যা পারেনি, মউলির সরল সান্নিধ্যে তা সম্ভব হল। মহারানির মনের অনেকটা অন্ধকার কেটে গেল, তিনি সহজ হয়ে এলেন। মউলিকে আবার সোপানে বসিয়ে নিজে উপবেশন করলেন তার পাশে। তারপর ঘনিষ্ঠস্বরে ধীরে বললেন, তা বল তো দেখি কি কি জেনেছিস তুই?

মউলি এবার লজ্জা পেলো। কিভাবে রানির প্রশ্নের উত্তর দেবে যেন ভেবে পেল না। মহারানি একটু অধৈর্যভাবে আবার বললেন, বল না মুখপুড়ি, কী নতুন কথা জানতে পারলি তুই?

—চাঁদের আলোয় চকোরের যে ব্যথা, আমি এখন তা বুঝি রানিদিদি। মউলি অস্ফুটস্বরে বলল।

ধ্রুবাদেবী চমৎকৃত হলেন। মউলির মুখে এধরনের প্রেমবিহ্বলতা তিনি আগে দেখেননি! আবেশমাখা স্বরে বললেন, ব্যথাটুকুই বুঝলি? আর কিছু না?

—আরও অনেক কিছু আমি জানি। চকোরের ব্যথা তো শুধু ব্যথাই নয়, তার মাঝেই থাকে সুখের আশ্বাস।

—সে কোন সুখ তুই জানিস মউলি?

—যে সুখের আশে মউমাছি ফুলের কাছে আসে। মউলি চাঁদের দিকে চেয়ে ছিল। এখন দৃষ্টি নামিয়ে বলল, তাই তো বলছিলাম চাঁদের আলোয় তোমার এইসব মনে হয় না দিদি?

মুগ্ধদৃষ্টিতে মহারানি তাঁর সখীকে অবলোকন করে দেখলেন মউলির দৃষ্টিতে সংস্মিত প্রসন্নতা। মুখে সেই চিরন্তন রহস্যময় হাসি। দেহে তার নবযৌবনের রমণীয় আহ্বান। এতদিন যে প্রসঙ্গ কখনও তিনি মউলির নিকট উত্থাপন করেননি, এখন দেখলেন তাতে আর কোনও বাধা নেই। চুপি চুপি তিনি বললেন, তোর মুখে এই কথা শুনে আমার কান জুড়িয়ে গেল। তা কোন ভ্রমরে আজ তোকে ছুঁয়ে গেল রে মউলি?

—কেউ না, রানিদিদি, কেউ না। এই বলে দৃষ্টি আনত করলো মউলি। তারপর লজ্জাজড়িত স্বরে বলল, আজ একজন আমাদের ঘরে আসবে আমাকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে। কিন্তু আমি করবই না তাকে বিয়ে। তাই তোমার কাছে পালিয়ে এসেছি।

প্রথমটা পরিহাস ছলে রঙ্গের কথাই ভেবেছিলেন ধ্রুবাদেবী। তারপরেই বুঝলেন অবুঝ বালিকা একটা মস্তবড় ভুল করে ফেলেছে। দাসীদের মুখে মউলির পরিণয়সংবাদ মহারানি পেয়েছিলেন, তাঁর নিজের জীবনের উথালিপাথালিতে মনে ছিল না, আজই তো সেই পূর্ণিমা তিথি। আর আজকেই বিবাহমণ্ডপ ত্যাগ করে মউলি এইখানে বসে আছে! মহারানি জানতেন না যে বিয়েতে মউলির সম্মতি নেই।

কয়েক মুহূর্তের জন্য তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর মনে এলো মাস দুই আগের একটা দিনের কথা। কথায় কথায় মউলি একদিন বলেছিল, বাড়িতে আমার বিয়ের জন্য বড় আয়োজন শুরু হয়ে গেছে দিদি।

মহারানি সানন্দ বিস্ময়ে বলতে চাইলেন, ওমা তাই নাকি—? মউলি তাঁকে থামিয়ে বলেছিলো, আমি কিন্তু বেনের ঘরে যাবো না রানিদিদি, এই তোমাকে বলে রাখলাম।

—ওমা, বেনের মেয়ে তুই, বেনের ছেলে বিয়ে করবি না? কেন রে? রানির কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠলো রমণীর সেই আবহমান কৌতূহল।

—আমার ভালোই লাগে না। বাবাকে দেখেছি তো, ব্যবসার কাজে বাড়িতে সর্বদা মুখভার করে থাকে। আমি অমন ছেলে বিয়ে করবো না।

—তোর যদি বেনের ঘরেই সম্বন্ধ হয়, তাহলে?

—তাহলে তুমি দেখো, আমি পালিয়ে যাব। অমন ঘরে যাবই না।

বালিকার চপলতায় আমোদিত হয়েছিলেন রাজ্ঞী। সহাস্যে মউলির চিবুকে হাত দিয়ে তার মুখখানি তুলে ধরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাহলে কেমন ছেলে বিয়ে করবি দিদিকে বল তো মউলি?

মউলি কিছুক্ষণ মৌন থেকে কি ভাবলো। কিন্তু অনেকে চেষ্টা করেও রানিদিদির কাছে তার পছন্দের পাত্রের বর্ণনা করতে পারল না। অবশেষে মহারানির বাহুতে একটু ঠেলা দিয়ে, জানি না যাও—বলে লজ্জায় দু'হাতে মুখ ঢাকল সে।

রানি তখন তাকে অন্তরঙ্গ বাহুবেষ্টনে আরও কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে বলেছিলেন, করিস না মউলি, যাকে পছন্দ হবে না, তাকে কক্ষনো বিয়ে করিস না...

বলেছিলেন বটে একথা, কিন্তু সত্যিই বিয়ের দিনে মউলি যে এইরকম কিছু করবে, মহারানি তা স্বপ্নেও কল্পনা করেননি। বিস্ফারিত নেত্রে তিনি মউলিকে বললেন, এ তুই কি করেছিস মউলি? আজ রাতে যে তোর বিয়ে?

মউলি বিস্মিত হয়ে তার রানিদিদির মুখপানে চেয়ে রইল। যেন বুঝতে পারছে না, এ সংবাদ রানিদিদি তাকে আবার শোনাচ্ছে কেন? সে-ই তো এইমাত্র একথা বলেছে। আর এতে রানিদিদি এতো বিচলিতই বা কেন হচ্ছে? অস্ফুটস্বরে বলল, ও বেনের ছেলে, সাগর বেনে ওর পিতা। আমি যাব না ঐ ঘরে।

—অমন করিস না মউলি, মহারানি ব্যস্ত হয়ে বললেন, এখনও সময় আছে, চল তোকে ঘরে পৌঁছে দিই।

—যাকে পছন্দ নয়, তাকে বিয়ে করতে বোলো না দিদি।

—পছন্দ নয়, তো সেটা আগে বলিসনি কেন মুখপুড়ি? বিয়ের রাতে এই কাজ করতে হয়?

—আমি মাত্র দু'দিন আগে জেনেছি ওরা ব্যবসায়ী। আগে বলেছিল কাত্তিকের মতো বর, মস্ত ঘর। যখনই জানলাম বেনের ছেলে, আমি বলেছি করব না এই বিয়ে। কেউ আমার কথা শুনল না দিদি।

—আমার কাছে এলি না কেন? আমাকে তো বলতে পারতিস?

—তার আর সময় পেলাম কই? রাজ্যের পুজো, অনুষ্ঠান। আমাকে ঘর থেকে বেরোতেই দিচ্ছিল না। আজ দুপুরে একটু সুযোগ পেয়েই...

ধ্রুবাদেবী বুঝলেন, যখন থেকে মউলি জেনেছিল শ্রেষ্ঠির ঘরে তার বিবাহ স্থির হয়েছে, তার মনে আর সুখ ছিল না। পারিবারিক সূত্রেই বিবাহ। এক্ষেত্রে পাত্র সুদর্শন, বর্ধিষ্ণু অর্থবান পরিবার। সুতরাং বিবাহ স্থির হতে আর কোন বাধা হয়নি। মউলির মাতা জীবিত না থাকায় বিবাহে কন্যার মতামত গ্রহণের কথা আর কেউ ভাবেনি।

আর কন্যা বিবাহের কিছুদিন আগে থেকেই গৃহবন্দি হয়, প্রথাগত নানা অনুষ্ঠানে। পরামর্শ করার মতো সহানুভূতিসম্পন্ন কারুকে পায়নি মউলি, যে তাকে মুক্তির সন্ধান দিতে পারে। অবশেষে বিবাহের দিন আজকেই দ্বিপ্রহরে এক সুযোগে সে পালিয়ে রাজপ্রাসাদের উদ্যানে আশ্রয় নেয়। মউলির সেখানে প্রবেশে কোনো বাধা ছিল না মহারানি ধ্রুবাদেবীর অনুগ্রহে। কোনো আত্মীয়ের সাহায্য পায়নি সে। তাই ছুটে গিয়েছিল মহারানির আশ্রয়ে। ইচ্ছা ছিল যদি কোনও ভাবে মহারানির মধ্যস্থতায় এ বিয়ে রদ করানো যায়।

যেন ভারি মজার ব্যাপার বর্ণনা করছে, এইভাবে খুশীতে উচ্ছল হয়ে মউলি সোৎসাহে বলে চলেছিল, এখানে এসে শুনি তোমার শরীর খারাপ। দেখা হবে না। তাই তোমার বাগানে লুকিয়ে ছিলাম। সন্ধের পরে যদি কেউ তোমার কাছে আসতে দেয়। ওমা, তারপর গাছপালার মধ্যে আর পথ খুঁজে পাই না। আমার তো খুব কান্না পাচ্ছিল। তারপর ওখানে একজন...

এইটুকু বলে মউলি হঠাৎ চুপ করে গেল। মহারানি বললেন, তারপর বল কি বলছিলি?

—না ও কিছু না। আকাশে চাঁদ উঠতে একটু ভাল লাগল। আলোও হল। পথও পেয়ে গেলাম। তোমার দীঘির তীরে বসে চাঁদ দেখছিলাম...

এই ফুলের মতো নিষ্পাপ কিশোরির জন্য বড় মায়া হল ধ্রুবাদেবীর। জাগতিক পরম্পরার কিছুই জানে না, সে শুধু ভেবেছে যে প্রকারেই হোক তার এ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া রোধ করতে হবে। পরম সহায় রানিদিদিকে না পেয়ে বিহ্বল মউলি বোধহয় উদ্যানের তরুরাজির গভীরে হারিয়ে যেতেই চেয়েছিল। যখন সংবিৎ ফিরে পায়, তখন সত্যই আর সে পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। আহা রে! ধ্রুবাদেবী মউলির মাথায় হাত রেখে বললেন, কিন্তু এরকম করে না মউলি। ঘরে তোর বাবা কত ভাবছে

বল দেখি?

মউলির যেন একথাটা মনেই আসেনি। মহারানির কথায় সন্ত্রস্ত হয়ে বলে, ওমা! তাই তো। তুমি তোমার দূত পাঠিয়ে আমার বাবাকে একটু জানিয়ে দাও না রানিদিদি, আমি তোমার কাছে আছি। আর এই বিয়ে হবে না।

রাজপ্রাসাদে মউলির বিলম্ব হলে সংবাহক তার গৃহে বার্তা পৌঁছে দিত, মউলি রাজপুরীতেই রাত্রিযাপন করবে। এমন মাঝেমধ্যেই হয়ে থাকে। মউলির কথায় মনে হয় যেন আজকেও তো ওইরকমই একটা সামান্য দিন। এতো চিন্তার কি আছে? কিন্তু আজ যে তার বিয়ে, এমন দিনে মহারানি কি তাকে ধরে রাখতে পারেন?

আকাশের দিকে মুখ তুলে তিনি বুঝলেন মধ্যরাত্রির তখনও বিলম্ব আছে। হয়তো লগ্ন বয়ে যায়নি। এখনও কিছু সময় বাকি থাকতে পারে। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, আমি লোক পাঠাচ্ছি মউলি, কিন্তু তুইও চলে যা। এখনও হয়তো সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

মউলি দেখল রানিদিদিও তার বিয়ে নিরস্ত করতে চাইছে না। হতাশ হয়ে সে বলে, বাবা খুব বকবে, রানিদিদি।

মহারানির চোখে জল এল। বললেন, কিছু বলবেন না। আমি বলে পাঠাচ্ছি। কিন্তু বাবা আর যা যা বলেন তাই করবি। অবাধ্য হবি না। দেখিস, তুই তোর মনের মানুষকে ঠিক পেয়ে যাবি। তুই খুব সুখী হবি মউলি।

মউলি ফিরে যেতে চায়নি। রানিদিদি তার একান্ত অনিচ্ছাতেই কয়েকজন দাসী-প্রতিহারীর সঙ্গে তাকে তার পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দিলেন।

ওদিকে কামোদকের বিবাহবাসরে গোলযোগ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। কন্যাপক্ষের সকল সাবধানতা সত্বেও কন্যার অন্তর্ধানের কথা অবশেষে আর গোপন রইল না। পাত্রপক্ষ ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়েই উঠেছিল, এবার তাদের অসন্তোষ ক্রোধে পরিণত হল। অকম্পন বিবাহবাসরে এই ধরনের পরিস্থিতি কখনও দেখেনি। উষ্মা থেকে বচসা, তারপর তিক্ত মনান্তর। অবশেষে নির্দিষ্ট লগ্নের দণ্ড দুই পূর্বেই, কন্যাকর্তাকে বহু তিরস্কারপূর্বক ক্রুদ্ধ অপমানিত পাত্রপক্ষ বরসমেত প্রস্থান করল।

ঘটনার রূঢ়তায় বজ্রাহত কন্যাপক্ষ। অনিশ্চিত এক স্তব্ধতায় স্থির হয়ে গেল পত্রপুষ্পে শোভিত শূন্য মণ্ডপখানি। এক কোণে প্রদীপের শিখাটিও যেন আতঙ্কে নিশ্চল। অন্দরমহলে রমণীকূল দিশাহারা হয়ে বোধহয় রোদনও ভুলে গেছে।

পাত্রপক্ষের এই নিদারুণ সিদ্ধান্তের অনতিকাল পরেই কিন্তু জনাকয়েক রাজ-প্রতিহারিণীর একটি দল এসে উপস্থিত হল, সঙ্গে মউলি। রানি ধ্রুবাদেবী সন্দেশ পাঠিয়েছেন, তাঁর অন্দরমহলের উদ্যানে মউলি হারিয়ে গিয়েছিল, এতক্ষনণ এক প্রতিহারিণী দেখতে পেয়ে তারা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। বিবাহের দিন সন্ধ্যায় সে রাজবাড়িতে কেন গিয়েছিল, তা অবশ্য আর জানা গেল না। মহারানি তাঁর আশীর্বাণীতে জানিয়েছেন, বিশেষ কারণে মউলির প্রত্যাবর্তনে কিছু বিলম্ব হয়েছে। আর কালক্ষেপ না করে যেন শুভকাজ সম্পন্ন করা হয়।

কিন্তু ততক্ষণে শুভকাজ সম্পন্ন হবার পক্ষে যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে গেছে। আর কিছুই করার নেই।

গৃহ প্রত্যাবর্তনে প্রথমেই একপ্রস্থ তিরস্কার জুটল মউলির। কটূক্তি মূলত বিমাতারাই করলেন। পিতা নিরুদ্দিষ্ট কন্যার শোকে মূক হয়েইছিলেন, এখনও কন্যার কঠোর ভবিতব্যের কথা ভেবে তাকে আর কিছু বলতে পারলেন না। মউলির অবর্তমানে তার আশঙ্কায় যে পাত্রীপক্ষ উৎকণ্ঠিত ছিল, অতঃপর তারা লগ্নভ্রষ্টা কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তায় আকুল হয়ে পড়ল।

মউলি নির্বাসিত হল অন্দরমহলে। বিমাতারা মহাসমারোহে সপত্নীকন্যার নির্বুদ্ধিতা ও ফলভোগের সরস বিলাপে মগ্ন হলেন। বয়োজ্যেষ্ঠরা শাস্ত্রানুসারে তার ভাগ্য নির্ধারণে ব্যাপৃত হলেন।

মউলি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। অনভিজ্ঞা সপ্তদশী, শৈশবেই মাতৃহারা বলে পিতার আদরিণী কন্যা। বিয়ে ভেঙ্গে গেলে লগ্নভ্রষ্টা অরক্ষণীয়ার সুকঠোর ভবিষ্যতের সম্যক ধারনা তার ছিল না। বড় সহজে, বলতে গেলে খেলার ছলেই নিজের জীবনতরণীখানা মাঝদরিয়ায় ঠেলে দিয়েছিল। বুঝতে পারেনি এতো নিকটেই ছিল ঘূর্ণাবর্তের চোরাস্রোত!

পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে গৃহের পৃষ্ঠভাগের দেহলীতে এসে একাকী নির্জনতায় মউলি কিছুটা অনুধাবন করলো কতখানি দুষ্প্রচেষ্টা সে করে ফেলেছে! সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি তার ভালো জানা ছিল না, কিন্তু গুরুজনেদের কথায় এবার অতিপ্রবিদ্ধ হল। এরপর আর তার বিয়ে হবে না, আর কেউ তাকে ভালবাসবে না, তার পিতাও সমাজে বহিষ্কৃত হবে আর পিতৃগৃহে গলগ্রহ হয়ে তার কলঙ্কিত উপজীবিকা—এইসব কথা ভেবে একান্তেই সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

কিন্তু অশ্রুজল তার চোখেই শুষ্ক হল, কেউ সান্ত্বনা দিতে এল না। মন্থরপদে অগ্রসর হয়ে কখন দেহলী পরিসরের বাইরে এসে পড়েছে সে জানতেই পারেনি। চন্দ্রালোকে ভাসমান স্বপ্নময় চরাচরে মউলির মস্তিষ্ক শূন্য হয়ে গেল, ক্রমশ ভয়ও দূর হয়ে গেল। অদূরে এক মনুষ্যমূর্তি দেখেও সে আশঙ্কিত হল না। বরং লঘু পদবিক্ষেপে তারই নিকটে অগ্রসর হয়ে বলল, কে তুমি?

আগন্তুক তার দিকে ফিরে তাকাল। মউলির তখনই মনে হল এই মুহূর্তটির জন্যই বোধহয় সে আজীবন অপেক্ষা করছিল। এ তো সেই, যাকে সে আজ রাজপ্রাসাদের কাননে দেখেছে! এ সেই যে তার রানিদিদিকে সারিয়ে তুলতে পারে। তার নিজের এখন যে অসুখ, তার কি কোনও উপচার আছে এই ব্যক্তির কাছে? তরঙ্গিণী নদীমাঝে তার জীবনের তরীখানা আজ টলমল করছে। বাঁধনহারা সে তরীখানি তীর খুঁজে পাবে কি? একপলকের দেখা এই মানুষটি কি পারবে তাকে ও তার পরিবারকে চূড়ান্ত লজ্জা থেকে পরিত্রাণ করতে?

পারবে, মউলির মন বলল, এই পারবে। মউলির অন্ধকার আকাশটাকে আবার চন্দ্রপ্রভায় ভাসিয়ে দিতে এই-ই পারবে। একবার তাকে কাছে পেয়েও হারিয়েছিল সে। আর যাতে হারাতে না হয়, তাই তাড়াতাড়ি মউলি নতজানু হয়ে তার পায়ে নিজেকে সঁপে দিতে গেল। আগন্তুক তাকে নিচু হতে দিল না, দুই বাহু ধরে তুলে মুখের সম্মুখে নিয়ে এলো।

মউলি দেখল, তার স্বপ্নে দেখা রাজপুত্র! অনুভব করল, একটা অপরিচিত পুরুষ শরীর দুইহাতে তাকে আবেষ্টন করছে। আবেশে অবশ হয়ে এল মউলি, কোনও বাধা দিল না। অনুচ্চকণ্ঠে শুধু বলল, আমি লগ্নভ্রষ্টা। তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে? করো না গো।

দিগন্তের পার থেকে যেন ভেসে এলো এক উপাংশু কলস্বন, করব মধু।

আকাশভরা কূলপ্লাবী জ্যোৎস্না। নিস্তরঙ্গ চরাচর। সুডৌল চন্দ্রমার বুকে এক হয়ে যাওয়া দুই নর-নারীর অসিতবরণ পরিলেখা। প্রসূন-পর্ণিল নিসর্গ কান পেতে রয়, বোধহয় শুনতে পায় দুটি হৃদয়ের নিরুচ্চার বাণী। অনাদিকালের কথা শুনিয়ে যায় দুই জোড়া অধরোষ্ঠের নিঃশব্দ বিনিময়।

॥ ৯ ॥

অকম্পনের চব্বিশ বছরের নিরুপদ্রব জীবনে একমাত্র স্ত্রীলোকটি ছিল তার মা। পিতার কথা তো মনেই পড়ে না, ভগিনীর স্মৃতিও তার ধূসর হয়ে গেছে। শৈশব ও কৈশোর ব্যতীত হয়েছে শুধুই মাতাকে অবলম্বন করে।

অকম্পনের মাতা অত্যন্ত কঠিন চরিত্রের নারী। রাজ্যের নানা প্রতিকূল পরিবর্তনশীলতার মাঝে, স্বামী ও কন্যাকে হারিয়েও অকম্পনকে তিনি একাকী বড় করেছেন। তার শিক্ষাদীক্ষায় কোন বাধা আসতে দেননি। সংসারের সব বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে একক সংগ্রাম করে তিনি জয়ী হয়েছেন।

কিন্তু আজ তিনি ক্লান্ত। মাতাপুত্রের একাকী সংসারে তিনি প্রসন্নতার অভাব বোধ করছেন। সংসারযাত্রায় তাঁর সহকারী দাসীর অভাব ছিল না বটে, কিন্তু সম্প্রতি তিনি পুত্রবধূমুখ দর্শনের নিমিত্ত কিছু বেশীমাত্রায় উতলা হয়েছেন। অহরহ দেশে বিদেশে সর্বগুণসম্পন্না কন্যার সন্ধানে দূত প্রেরিত হচ্ছে। অনেক সুলক্ষণা গুণবতী কন্যার সন্ধান আসছে, কিন্তু

প্রজাপতির ইতিবাচক নির্বন্ধ এখনও অধরাই রয়ে গেছে।

এদিকে বিবাহ বিষয়ে অকম্পন সম্পূর্ণ উদাসীন। সে স্বভাবত স্বল্পবাক ও অন্তর্মুখী। অপরিচিত স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যে খুব স্বাচ্ছন্দ অনুভব করে না। উজ্জয়িনীতে সুন্দরী আলোকপ্রাপ্তা রমণীর অভাব নেই। প্রায় সকলেই অতি রূপবতী এবং অনাবশ্যকরূপে লজ্জাশীলাও নয়। তারা দল বেঁধে নগরীর পথে বার হয়, বিপণণ করে। স্নানরতা সম্ভ্রান্ত গৃহবধুর কলকাকলিতে মুখরিত নর্মদার ঘাটও খুব বিরলদৃশ্য নয়। অকম্পন এসব দেখে নিরাসক্তির সঙ্গে। সুন্দরী রমণীতে সে আকর্ষণ অনুভব করে না এমন নয়। কিন্তু সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে সংসারযাত্রার বাইরে উচ্ছৃঙ্খল বনিতাবিলাস তার মতো মধ্যমবর্গীয়ের সাজে না। অনায়াস সংযত জীবনই তার পছন্দ। এছাড়া জ্ঞানার্জনে প্রভূত আকাঙ্ক্ষা, তাই অধ্যয়নে তার অনন্ত আকর্ষণ। বিজ্ঞান ও কাব্যের জগতে সে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। পুঁথিপত্র তার সকল অবসরের আসঙ্গলিপ্সা পূরণ করে।

এই মুহূর্তে একটি নারীর সঙ্গে গার্হস্থ্য জীবনে জড়িয়ে পড়ায় সে বিশেষ আগ্রহী নয়। বিধাতা নির্ধারিত জীবনসঙ্গিনীটিকে যথাসময়ে তার জীবনে প্রেরণ করবেন, এ বিশ্বাস তার ছিল। কিন্তু মাতাকে তার বিবাহের চেষ্টায় নিরস্ত করতে পারেনি অকম্পন।

মাতা প্রবলবেগে কন্যানুসন্ধান করে চলেছিলেন। আর অকম্পন শিষ্ট বালকের মতো মায়ের পছন্দ করা কন্যার জন্য প্রতীক্ষা করছিল। বিবাহে তার নিজের কোনও ত্বরা ছিল না। আর ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলতে হবে, যে তার মায়ের কন্যা বাছাইয়ের মাপদণ্ডগুটি যথেষ্ট কঠোর। তাই সর্বসুলক্ষণযুক্তা কন্যাটির সন্ধান পাওয়ারও আশু সম্ভাবনা ছিল না। এতে সে আমোদই অনুভব করত। মায়ের আপাতকঠোর শাসনে অকম্পন নিজের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা নিয়ে মোটামুটি সুখেই ছিল।

কিন্তু মানুষের জীবনে অনেক সময় এমন সব ঘটনা ঘটে, যার কোনও পূর্বাভাস থাকে না, অথচ ক্ষণকাল মধ্যে তা জীবনের গতি পরিবর্তন করে দেয়। গত রাত্রিটা অকম্পনের জীবনে ছিল এই রকমই এক রাত যখন একযোগে কিছু বিচিত্র ঘটনায় সব হিসাব ওলট পালট হয়ে গেল। অথচ গতকাল অপরাহ্নেও সে জানত না কি বিস্ময়কর ঘটনাবলীর সম্মুখীন হতে চলেছে সে।

রানি ধ্রুবাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার এইরকমই একটা ঘটনা। আর বন্ধুর বিবাহসভায় যে তার জীবনের মধুরতম বিস্ময়টি বাকি ছিল, তাই বা কি সে জানত?

***

গজানন শ্রেষ্ঠীর সব আয়োজন ব্যর্থ হল। কামোদক, অকম্পনের অন্তরঙ্গ বন্ধু কামোদক, পিতার অবাধ্য হয়নি। কোনও প্রতিবাদ সে করেনি। আদেশমাত্র নীরবে পিতার অনুগমন করে সে সভাস্থল ত্যাগ করে। তাদের অভিযোগ মিথ্যা নয়, অপমানিত বোধ করার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে তাও সত্য। কিন্তু এক কাঙ্ক্ষিত শুভানুষ্ঠানের এই পরিণতি বোধহয় উপস্থিত কেউই কল্পনা করেনি।

ঘটনার অভাবনীয়তায় অকম্পন যেন স্থবির হয়ে গিয়েছিল। বয়স্কদের গুঞ্জনে উদ্বেগ, যুবকদের আনাগোনায় চাঞ্চল্য ও ঘনঘন পাইক-নফরের ত্বরিত গমনাগমনে বাতাবরণ ক্রমশ অসহনীয় হয়ে আসছিল। আমন্ত্রিতরা অনেকেই প্রস্থান করছে। অকম্পন ধীর পায়ে গৃহের পশ্চাদ্ভাগে চলে এল, একটু নির্জনতায় নিজেকে সুস্থির করে নিতে ইচ্ছা ছিল।

জনশূন্য সেইস্থানে গিয়ে অকম্পনের মনে হল, কোথাও বোধহয় একটু ভুল হল। অন্তত কামোদক আর একটু সংবেদনশীলতা প্রদর্শন করলে শোভন হত। কামোদক তার মিত্র। তার আচরণ অশোভন। কিন্তু অকম্পন কি করে উদাসীন থাকে? একটা অসহায় পরিবারকে এই অসময়ে কাপুরুষের মতো নিঃশব্দে পরিত্যাগ করতে তার বড় কুণ্ঠাবোধ হচ্ছিল। অথচ এমতাবস্থায় তার কী কর্তব্য স্থির করতে পারছিল না।

এক সময়ে কারওর সম্বোধনে সে পিছন ফিরে তাকাল। সাভূষণা এক নারী তার সমক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে! দিগভাসিত চন্দালোকে চকিতেই সে দেখতে পেল একটা ভীত সন্ত্রস্ত মুখ, আশংকাসাগরে সাহায্যের আশায় ইতস্তত দুটি চোখের অনুতপ্ত চাহনি। অকম্পন স্তম্ভিত হয়ে গেল! এ সেই কন্যা, যার সঙ্গে কয়েক পলের জন্যে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল আজ সন্ধ্যায়, রাজ অন্তঃপুরের পিছনের উদ্যানবাটিকায়।

তারপরই সব এলোমেলো হয়ে গেল। একটা প্রবল ঝঞ্ঝার বেগ যেন অকম্পনের সব সংযম ও সংস্কারের বাধা তছনছ করে দূরে সরিয়ে দিল। মুহূর্তের অবসরে উন্মুক্ত হল সেই নিষিদ্ধ দুয়ার, ক্ষণিকে বিপর্যস্ত হল সকল চিত্তবৃত্তির অনুশাসন। যৌবন সরসীনীরে সিক্ত হয়েই শান্ত হল সেই প্রভঞ্জনের বেগ।

মউলি অকম্পনের বাহুপাশ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। সে প্রচেষ্টাও সে করল না। আলিঙ্গনের সুখাবেশেই বলল, এ কি করলে? কেন তুমি আমাকে ছুঁয়ে দিলে? কেন তুমি আমার সব এইভাবে কেড়ে নিলে?

—আমি তৃষিত ছিলাম মধু। তুমি যে তৃষ্ণার জল হয়ে এলে।

—আমি মেয়ে। আমার লজ্জা, আমার আব্রু—

—আর তোমার নয় মধু, আজ থেকে এসব আমার।

—কিন্তু আমি যে লগ্নভ্রষ্টা!

—কে বলেছে? লগ্ন তো এখনও বয়ে যায়নি মধুমল্লিকা।

অকম্পন দেখল তার মনে দ্বিধার মেঘ আর নেই। মউলির দৃষ্টিতে কী ছিল কে জানে, সাহায্যের ভিক্ষা অথবা করুণার আবেদন...তা আর যাই হোক, প্রণয়ের নিবেদন নিশ্চয়ই নয়। অকম্পন কিন্তু দেখতে পেল তার আশ্রয়। সে আর অগ্র-পশ্চাৎ ভাবল না। কন্যাকর্তার নিকট গিয়ে নিজ পরিচয় দিয়ে বলল, আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে চাই।

মউলির পিতা এ প্রস্তাবের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না, অনুধাবন করতে তাঁর খানিক সময় লাগল। সেই মুহূর্তে আকাশের পূর্ণচন্দ্র হাতে এসে গেলেও বোধহয় তিনি এতখানি প্রসন্নবিস্ময়ে অভিভূত হতেন না। বিত্তবান গৃহে কুটুম্বিতার আকাঙ্ক্ষা আর তাঁর ছিল না। কন্যার দুর্ভাগ্যের অবসানে অনেক নিকৃষ্টতর বিকল্পেও তিনি সম্মত হতে প্রস্তুত ছিলেন। সে জায়গায় অকম্পন উচ্চবর্ণের সুপাত্র, আপত্তির তো প্রশ্নই নেই, বণিকের গৃহে এ যে অহোভাগ্য!

আকস্মিক সৌভাগ্যোদয়ে মউলির পিতা সমাপ্লুত হলেন। কম্পিতহস্তে অকম্পনের দুটি হাত ধরে তিনি তাঁর কৃতজ্ঞতা ও সম্মতি জানিয়ে বললেন, আজ আমি ধন্য হলাম। অশ্রুপূর্ণ চক্ষু মার্জনা করে তিনি তৎপর হলেন কন্যাসম্প্রদানে। নিভে যাওয়া প্রদীপগুলি আবার প্রজ্জ্বলিত হল, নহবতে বেজে উঠলো মিলনের সুর।

বিবাহলগ্নের আর বিশেষ অবশিষ্ট ছিল না, অবিলম্বে ও যথাসংক্ষেপে অকম্পন ও মউলির শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হয়ে গেল।—

জনবিরল পথে হালকা কুয়াশার আস্তরণ আসন্ন হিমঋতুর আগমন সংবাদ দিচ্ছে। একটি দুটি পথচারী যা দেখা যাচ্ছিল, নগরীর বাইরে আসতে তাও আর দেখা যায় না। ক্বচিৎ দু'একটি অশ্বারোহী বিপরীত দিক থেকে অকম্পনকে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। বড় অশ্বচালনায় অনভ্যস্ততার জন্য অকম্পন ধীরেই চলেছিল। একটা স্নিগ্ধকোমল সুখানুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

গত রাত্রের কথা স্মরণ করে অকম্পনের মনে মনেই হাসি পেল। এসেছিল বন্ধুর বিবাহের নিমন্ত্রণে, কেউ জানত না, প্রজাপতির লক্ষ্য ছিল তার প্রতি। এমনভাবে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ার কোন কথা তো ছিল না। নিজগৃহে সংবাদও সে দিতে পারেনি। অবশ্য গৃহে শুধু মাতাই আছেন, কন্যাপক্ষ এতক্ষণে নিশ্চই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তিনি শুনে যথেষ্ট আচম্বিত হবেন। হয়তো খানিক রুষ্টও হবেন। কিন্তু অকম্পন চেনে তার মা'কে, মনে মনে তিনি অসুখী হবেন না। অকম্পনের বিবাহের জন্য তিনি বিশেষ উদগ্রীব ছিলেন। মউলিকে তাঁর অপছন্দ হওয়ার কথা নয়।

কিন্তু এ কীরকম বিবাহ? আজকের পূর্বে তারা ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। কয়েকটি আলোড়িত মুহূর্তের স্মৃতি এখনও অকম্পনের মনে রসসঞ্চার করছে। সেই কয়েক মুহূর্তই যেন জন্ম-জন্মান্তরের অপরিচয়ের গণ্ডি মুছে দিল। আলাপ-পরিচয় দূরে থাক, মউলির সঙ্গে আর বিশেষ কোন বাক্যালাপই হয়নি। বিবাহোপরান্ত কয়েক মুহূর্তের জন্য সে শুধু দেখতে পেয়েছিল মউলিকে। প্রথম দর্শনের মায়াময় আবেশের সেই রেশটুকু তখনও ছিল। মউলির সলজ্জ দৃষ্টিতে ছিল কৃতজ্ঞতা, দু'চোখের

নীরব ভাষায় জানিয়েছিল আত্মসমর্পণের প্রতিশ্রুতি।

অল্প পরেই রমণীকুল মউলিকে নিয়ে চোখের আড়ালে চলে যায়, কালরাত্রি যাপনের জন্য। ভোররাত্রেই অকম্পনকে চলে যেতে হবে দূরদেশে, তার হাতে আর যে সময় নেই, সে কথা কারওর চিন্তায় এল না। কিন্তু এলেও কিছু করার ছিল না, এই-ই প্রথা।

সকলেই তাকে মত পরিবর্তন করার সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিল। মউলির পিতা একান্তভাবে কামনা করেছিলেন, জামাতা যেন সেদিন অন্তত যাত্রা স্থগিত করে। অকম্পনের হৃদয় বারংবার সে উপরোধে সাড়া দিতে ব্যাকুল হয়েছে। কিন্তু তার মস্তিষ্ক জানিয়েছে, এ হৃদয়াবেগের সময় নয়।

প্রভাতের আবছায়া আলোতে অকম্পন যাত্রা শুরু করেছিল। কর্তব্যের শাসনে অবুঝ হৃদয়াবেগকে অশ্রুসিক্ত করে বিদায় জানিয়েছিল পুষ্পসজ্জিত বিবাহ মণ্ডপকে।

অকম্পন এখন মউলির কাছ থেকে অনেক দূরে। প্রায় দু'ঘটিকার পথ অতিক্রম করে এসেছে সে। সূর্যদেব ইতিমধ্যেই মাথার উপরে আপনার রাজপাট বিস্তার করছেন। বাতাসে প্রভাতের শৈত্য আর নেই, বরং বেশ আরামপ্রদ একটি উষ্ণতা।

সকাল থেকে অকম্পন প্রায় অভুক্ত। খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে সে পথের বোঝা বৃদ্ধি করেনি। এবার সে অনুভব করলো জঠরে কিছু খাদ্যবস্তু দেওয়া প্রয়োজন। সম্মুখেই পড়লো অপর একটি পথের সমকোণী সঙ্গম। দুই পথের সেই সঙ্গমস্থলে ছিল একটি মনোরম পান্থশালা। অকম্পন গুটিগুটি পায়ে সেখানে গিয়ে একটি আসন গ্রহণ করলো।

পান্থপাল একজন মধ্যবয়স্ক অমায়িক ব্যক্তি। সকাল সকাল ব্রাহ্মণ অতিথি পেয়ে হাসিমুখে সৎকার করতে এগিয়ে এলো। অকম্পন তাঁকে যৎসামান্য আহার্য প্রস্তুত করতে বলে আবার চিন্তামগ্ন হল আগামী কর্মপন্থার পরিকল্পনায়।

নিতান্ত সাধারণ গৃহস্থ সে, চলেছে রাজপুরুষ সন্দর্শনে। যে সে রাজপুরুষ নয়, স্বয়ং কুমার চন্দ্রগুপ্তের সম্মুখীন হতে হবে তাকে। একদিকে এ যেমন গৌরব, অপরপক্ষে দারুণ শঙ্কাও বটে। মহারানির অভিজ্ঞান আংটিটা তার হাতে আছে, সেইটুকুই ভরসা। সেইটি সম্বল করে তাকে এখন কুমার চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে দেখা করতে হবে। মহারানির বার্তা না জানলেও আনুপূর্বিক সব ঘটনা তাঁকে সে জানাবে। এই কাজে কত সময় লাগবে জানা নেই। ইতিমধ্যে যে অপরিকল্পিত গার্হস্থ্যে সে জড়িয়ে পড়েছে, তা স্বদেশ থেকে ব্যবধানের মুহূর্তগুলি আরও প্রলম্বিত করে তুলেছে। কেবলই মনে হচ্ছে, যে পথে সে চলেছে তার বিপরীত দিকে এক্ষুনি ছুটে যায়। থেকে থেকেই নববধূকে ঘিরে প্রথমরজনীর কল্পনা অকম্পনের চিন্তায় এসে উপস্থিত হচ্ছিল, একান্ত আয়াসে তা সরিয়ে বারংবার সে ভবিষ্যতের কর্মপন্থায় মনঃসংযোগ করছিল।

তখনও আহার তার সম্মুখে প্রস্তুত হয়নি, অকম্পনের চিন্তার ধারা বিচ্ছিন্ন হল এক বিরাট কোলাহলে। সম্মুখে যা দেখল তাতে তার চক্ষুস্থির।

পান্থশালার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ ধুলোয় ধূসরিত করে উপস্থিত হয়েছে অন্তত পনেরোজন ঘোড়সওয়ার। সবাই সৈনিক। তাদের নায়ক অশ্বাবতরণ করে ইশারায় পান্থপালকে আবাহন করতেই সে পড়ি-কি-মরি করে দৌড়ল আদেশ পালন করতে। সেনানায়ক অকম্পনের অপরিচিত, কিন্তু তাঁর আগমন যেরকম শোরগোল সৃষ্টি করেছে তাতে সন্দেহ নেই তিনি কোনও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। মুহূর্তের মধ্যে আর সব কাজ ফেলে পান্থপাল ও তার সবকটি অনুচর সেই দলটির সেবায় জুটে গেল। অকম্পন এবং আর দুই চারজন পথিক যারা পূর্বেই উপস্থিত ছিল তাদের প্রতি আর কারও ভ্রূক্ষেপ রইল না।

ত্বরিতে সৈনিকদের আসন ও খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন হল। অবশ্য সেসবের পূর্বেই তারা যথেচ্ছ খাদ্য ও পানীয় নিজেরাই তুলে নিতে শুরু করেছিল। খাদ্যদ্রব্য যত না উদরসাৎ হল, নষ্ট হল তার অনেক বেশি। কিন্তু কেউ তাতে বাধা দিতে সাহস করল না। তুমুল বিশৃঙ্খলার মাঝেও পান্থপাল কষ্টার্জিত কাষ্ঠহাসি সহযোগে বহু মিষ্টবাক্যে দলনায়কের তুষ্টিবিধান করতে ব্যস্ত রইল।

দণ্ডকালব্যাপী এই অত্যাচার চলার পরে অনাহূত অতিথিরা আবার সবাই অশ্বারূঢ় হল। দলনায়ক উচ্চৈঃস্বরে পান্থপালকে জানালেন, খাদ্যাদির মূল্য যথাসময়ে রাজকোষ থেকে সংগ্রহ করে নিও।

পান্থপাল যেন কৃতার্থ হয়ে গেল। বিগলিত বিনয়ে আভূমি আনত হয়ে তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানালো। অতঃপর সন্ত্রাসদল দৃষ্টির অগোচর হতেই নিকটস্থ প্রস্তরপট্টে ধপ করে দেহরক্ষাপূর্বক বহির্গতপ্রায় শ্বাসকে আয়ত্ত করতে সচেষ্ট হল। গলবস্ত্রখানা ঘুরিয়ে নিজেকে শীতল করতে করতে বলল, ওরে কে আছিস—আমাকে একটু পানীয় দে বাবা।

প্রবল বাত্যাঘাতে বনস্থলীর যে দশা হয়, পান্থশালার তখন সেই অবস্থা! চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত নানান ব্যঞ্জন, বহমান পানীয়ের কাদা, লণ্ডভণ্ড বাসন। গোটা দুই চুল্লী ক্ষতিগ্রস্ত, তা থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার ছড়িয়ে পড়েছে। অনুচরদের ক্ষয়ক্ষতির পূরণ, সংস্কার ও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন করার নির্দেশ দিয়ে পান্থপাল এবার অন্যান্য অতিথিদের কাছে এসে বিনীতভাবে বলল, আপনাদের সৎকারে ত্রুটির জন্য আমি মরমে মরে যাচ্ছি। কিন্তু আমি নিরুপায়, আমায় মার্জনা করুন। আপনারা দেখলেনই তো সব স্বচক্ষে।

অকম্পন সবই দেখেছিল, কিন্তু বোধগম্য হয়নি কিছু। জিজ্ঞেস করল, কে এই ব্যক্তি?

—এঁকে চেনেন না? ইনি উপসেনাপতি দত্তসেন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ। ওরে বাবা রে, আর বলবেন না মহাশয়, নৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে। প্রতি মাসে এক দুই বার এই অত্যাচার, আর কতকাল যে এ দৌরাত্ম্য সহ্য করে ভোজন ব্যবসায় চালাতে হবে!

পান্থপাল উপসেনাপতির সম্মুখে কিছু বলতে পারেনি। এখন বিলাপ করে তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধ করতে লাগল। উপস্থিত সকলেই আগ্রহভরে তার কথা শুনছিল। কেউ বলল, কেন তুমি তাঁকে প্রশ্রয় দাও? কেউ পরামর্শ দিল, রাজাকে নালিশ করো। পান্থপাল বলল, কোনও লাভ নেই ভাই। দত্তসেনকে চটিয়ে আমাকে আর পান্থশালা চালাতে হবে না। তাই মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছি। হেনস্থার চূড়ান্ত হলেও আমার কোনও সহায় নেই।

একজন তাঁকে সান্ত্বনা দেয়, যাক গে যাক গে, সেনাপতি তো বললেন তুমি মূল্য পেয়ে যাবে।

পান্থপাল কপালে করাঘাত করে বলল, আরে, পনেরোজনের খাদ্যের মূল্য না হয় পাব। কিন্তু আরও বিশজনের খাবার যা নষ্ট হল, আর যা যা ক্ষয়ক্ষতি হল, সে কথা কি আমি উচ্চারণ করতে পারবো? তার কি হবে? ও—হো—হো—।

অকম্পন দেখল বেলা বেড়ে যাচ্ছে। মধ্যাহ্নের পূর্বে এস্থান ত্যাগ না করতে পারলে উড়ালি পৌঁছতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। একটু কুণ্ঠিতভাবে শোকগ্রস্ত ব্যক্তিটিকে আহার্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। পান্থপাল নিজেকে সংবৃত করে বারংবার মার্জনা ভিক্ষা করলো। তারপর শশব্যস্ত হয়ে সানুচর অতিথিদের আহার্যের ব্যবস্থা করতে নিযুক্ত হল।

আহার সমাধা হলে অকম্পন অল্প বিশ্রামান্তে ওঠার উপক্রম করছিল, তখনই দেখল আর এক ঘোড়সওয়ার এসে নামল সরাইয়ের দ্বারে। অকম্পনেরই সমবয়সী, বেশ শক্ত-সমর্থ কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ অসামরিক। তার সঙ্গে আরও কয়েকটি সঙ্গীও ছিল।

—সুপ্রভাত। আমি খুব ভুল না করলে, আপনিই নিশ্চয়ই আর্য অকম্পনদেব? রাজধানী থেকে আসছেন? আগন্তুক অকম্পনকে দেখে কাছে এসে বললে। মুখে তার অনপেক্ষিত পরিচিতকে আবিষ্কার করার বিস্ময়।

—আপনার অনুমান নির্ভুল। কিন্তু আপনি?

—আমি রবিস্তোত্র, শ্রেষ্ঠী কামোদকের সহকারী মিত্র।

—ভালো কথা। বলুন আমার সঙ্গে কী প্রয়োজন?

—প্রয়োজন অবশ্য তেমন কিছুই নয়। শ্রেষ্ঠী কামোদকের মুখে আপনার অনেক কথা শুনেছি। আপনার সঙ্গে আলাপের অভিপ্রায় ছিল। ভেবেছিলাম শ্রেষ্ঠীর বিয়ের সময় আপনার সাক্ষাৎ পাব। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, উত্তরাপথে গিয়েছিলাম। সময়মত ফিরতে পারিনি। শ্রেষ্ঠী নিশ্চয়ই বিলক্ষণ অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু আপনার সঙ্গে এখানে দেখা হয়ে বড় প্রীতিলাভ হল।

স্বভাবতই আগন্তুক গতরাত্রির ঘটনাক্রম অবগত নয়। অকম্পন অপরিচিতের নিকট সব কথা আর উত্থাপন করল না। তাছাড়া কামোদকের প্রতি অকম্পনের মন বিরূপই ছিল। গতরাত্রিতে কামোদকের আচরণে সে মর্মাহত হয়েছিল। বিবাহসভায় কন্যাপক্ষের দুর্দশার সময়ে তার আত্মীয়কৃত দুর্ব্যবহারের কামোদক কোনো প্রতিবাদ করেনি। তাদের দ্বারা পরিত্যক্ত পরিবারেই অকম্পনের কুটুম্বিতা স্থাপন কামোদকের বিশেষ আহ্লাদের কারণ না হবারই কথা। তাই কামোদকের পার্ষদ সম্পর্কেও সে বিশেষ উৎসাহ বোধ করল না।

তার মনের ভাব মুখে প্রকাশ না করলেও আগন্তুকের কাছে তা গোপন থাকেনি। কিন্তু রবি আত্মীয়তার স্বরেই প্রস্তাব করল, শ্রেষ্ঠীর বিয়েতে আপনি নিশ্চই উপস্থিত ছিলেন। আসুন না, একটু বসে সব কথা শোনা যাক।

অকম্পন একটু অসহিষ্ণু স্বরেই বলল, ও কথা এখন থাক। আপাতত সময়ের একটু অভাব আছে, এখনি না বেরলে সন্ধ্যার আগে উড়ালি পৌঁছতে পারব না।

—ও তাই নাকি, আপনি উড়ালি চলেছেন? আরে আমিও তো স্কন্ধাবারের দিকেই যাচ্ছিলাম। আপনিও যখন একই রাস্তায় যাবেন, একটু অপেক্ষা করুন না। তাহলে একসঙ্গেই যাওয়া যাবে।

অপরিচিত পথে একটা সাহচর্য পেলে মন্দ হয় না। কিন্তু রবিস্তোত্র এমন কিছু পরিচিত ব্যক্তি নয়। তাছাড়া সে বোধহয় একটু অতিরিক্ত অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করছে। তাই সৌজন্য দেখিয়েই প্রত্যাখ্যান করলো অকম্পন, আপনি ধীরেসুস্থে ভোজন সমাপন করুন। আমি আর বিলম্ব করব না। আমার এক আত্মীয়ের কাছে যাচ্ছি। তাঁরা অনর্থক উদগ্রীব হবেন।

—তা আপনি কি উড়ালি পর্যন্তই যাবেন?

অকম্পন দেখল, এ প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বললে তা রবির বিশ্বাসযোগ্য নাও হতে পারে। আরও প্রশ্ন করবে। কিন্তু তার যাত্রার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই অপরিচিতের কাছে ব্যক্ত করা চলে না। তাই সংক্ষেপে জানাল, তার আরো আগে যাবার আছে।

রবি বাকপটু, মনে হয় কথোপকথন চালিয়ে যেতে চায়। বলল, আমি আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কৌতুহল দেখাবার জন্যে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু আমার মনে হয় আপনি কালান গড়ের দিকেই যেতে চান। সে ক্ষেত্রে আপনি ইচ্ছা করলে আমরা তো একসঙ্গে যেতে পারি।

রবি অকম্পনের সঙ্গ নিতে কি একটু বেশিরকম উৎসাহী নয়? অকম্পনের মনে সন্দেহ হল, অন্তরঙ্গতার ছদ্মবেশে এ তাঁকে অনুসরণ করার ছল নয় তো? একটু দৃঢ়ভাবেই সে এইবার রবিকে জানাল, কিছু মনে করবেন না। আমি এখনই বেরিয়ে পড়তে চাই, আর বিলম্বে সমস্যা আছে।

অকম্পনের মনোভাব রবি নিশ্চই ধরতে পেরেছিল। আর কথা বাড়াল না। শুষ্কস্বরে বলল, যেমন আপনার অভিরুচি। উড়ালির আগে আর কোনও গৃহস্থের বাস আছে জানতাম না। আপনার আত্মীয়কে আমার অভিবাদন জানাবেন।

'আরো আগে' বলতে যে জয়স্কন্ধাবারই বোঝায়, সে কথা অকম্পন জানত না। রবির কথায় ছিল প্রচ্ছন্ন শ্লেষ। তারপরের বাক্যে আর প্রচ্ছন্ন নয়, ঋজু দৃঢ়তায় রবি জানালো, উড়ালির আগে সাধারণ নাগরিকের আর কোন গন্তব্য থাকতে পারে না, কেননা তা অতি দুর্গম ও বনাকীর্ণ। আচ্ছা, ক্ষুৎপিপাসার অনুভব হচ্ছে—আমি যাই। এই বলেই সে চলে গেল পান্থপালের নিকট আহার্য সংগ্রহে।

এতক্ষণ রবির অহেতুক অনুসন্ধিৎসা অকম্পনের ভাল লাগছিল না, এখন অজানিতে তাকে নিজের গন্তব্যের সন্ধান দিয়ে ফেলায় শঙ্কিত হল। রবিকে বন্ধু মনে করার কোনও কারণ নেই। তাই সন্তোষজনক কি প্রত্যুত্তরে তার সন্দেহ দূর করা যায় সেই চিন্তায় ইতস্তত করছিল অকম্পন। একটা বড় পাত্রে আহার্যদ্রব্য নিয়ে এসে রবি খানিক তফাতে এক প্রস্তরপট্টে অঙ্গরক্ষা করল। অকম্পনকে দেখে সহাস্যেই বলল, একি, আপনি এখনও বিলম্ব করছেন? আপনার আত্মীয় ব্যস্ত হবেন যে? আসুন।

রবির তির্যক বাক্যে বিব্রত অকম্পন তাড়াতাড়ি প্রস্থানোদ্যত হল। তখন তাকে শুনিয়ে রবি বলল, সাবধানে যাবেন, জানেনই তো, যুদ্ধকালীন নিরাপত্তার জন্য বিশেষ অনুমতি ছাড়া ওপথে জনসাধারণের যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা আছে। আপনার যাত্রা শুভ হোক।

নিষেধাজ্ঞার কথা অকম্পনের কিছুই জানা ছিল না। যাত্রাপথের জন্যে কোনরকম অনুমতিপত্রও সে সংগ্রহ করেনি। এতদূর পথ অতিক্রম করে তাহলে তার আসল উদ্দেশ্যই যে ব্যর্থ হয়ে যাবে। মনের সংশয় প্রকাশ না করে বলল, আপনি যাচ্ছেন কীভাবে?

—আমার কাছে তো অনুমতিপত্র আছে, কিছু পণ্য নিয়ে আমি সেখানেই যাচ্ছি। আচ্ছা নমস্কার!

এই বলেই রবি তার আহার্যে মনোযোগ দিল।

একটু আগেই রবিস্তোত্র একসঙ্গে যাত্রা করার প্রস্তাব দিয়েছিল। অকম্পন তা রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে। হয়তো সে কোনভাবে সাহায্য করতে পারতো। এখন আর তা ভেবে লাভ হবে না। রবিস্তোত্র বিলক্ষণ অসন্তুষ্ট হয়েছে, তার কাছ থেকে আর সাহায্যের আশা নেই। তা ছাড়া তার অসদুদ্দেশ্যও থাকা সম্ভব। অপরিচিত ব্যক্তিকে আর প্রশ্রয় দেওয়া সমীচীন বোধ করলো না অকম্পন। বিশেষত কাল থেকে বেশ কিছু অনুসন্ধিৎসু সন্দেহজনক লোক তার পদানুসরণ করছে বলে মনে হয়।

যা থাকে কপালে, দেখা যাবে, এই ভেবে আর প্রতীক্ষা না করে অকম্পন ত্বরিতেই অজানা পথের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো।

॥ ১০ ॥

মউলির নিদ্রাভঙ্গ হল বেশ বেলায়। গতরাতের ঘটনাগুলো বহুদূরের কতগুলো ছিন্নপট চিত্রের মত মনে আসতে লাগল। গভীর নিদ্রায় দেখা স্বপ্নের মতো।

ঘটনাবলী যেন সত্যই স্বপ্ন। কিভাবে কি হল কিছুই জানে না। স্বপ্নের মাঝেই যেন তার জীবনে এলো এক কল্পপুরুষ, তারপর তার সঙ্গেই বাঁধা পড়ে গেল তার ইহকাল-পরকালের অচ্ছেদ্য বন্ধন। কিন্তু রাত না পোহাতেই আঁধারের সঙ্গে সে স্বপ্নও বিলীন হয়ে গেল।

চমক ভাঙ্গলো দাসীর সম্বোধনে। রাজপ্রাসাদ থেকে মহারানি মউলিকে স্মরণ করেছেন। অধিবাস কল্পাদি সমাপ্ত হলে সে যেন অবশ্যই একবার মহারানির সঙ্গে দেখা করে।

এতক্ষণ মনে আসেনি, মউলি যেন অকূলে কুল পেল। অনুষ্ঠানাদি আর কিছু তেমন বাকি ছিল না। অনেক হৃদয়াবেগ অতি আয়াসে এতক্ষণ বুকের মধ্যে চেপে রেখেছিল মউলি, মহারানির আহ্বানে তা জলোচ্ছ্বাসের মতো তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। নববিবাহিতা কন্যার প্রকাশ্যে যেতে নেই, কিন্তু বিমাতাদের সরোষ বিরোধকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে মউলি বেরিয়ে পড়ল রাজপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে।

***

—নিজের ভবিষ্যৎটা একবারও ভাবলি না, হতভাগী? বিয়ের দিনে ঐভাবে পালিয়ে যেতে হয়?

মউলির বিবাহবৃত্তান্ত সব শুনে মহারানি ধ্রুবাদেবী কপট ধমক লাগলেন। আর কোনও ভয় নেই, বিপদ কেটে গেছে। তাই তাঁর আপাতরুষ্ট ভঙ্গিতেও রয়েছে কৌতুকের ছোঁয়া।

মউলি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইল। যেন বুঝতে পারছে না মহারানি তার কোন ভবিষ্যতের কথা বলছেন। নবপরিণীতার অঙ্গরাগের অবশেষ তখনও মুছে যায়নি, মউলির মুখমণ্ডলের অনিন্দ্য আভা জানিয়ে দিচ্ছে, সে বিবাহিতা। এক রজনীর ব্যবধানে অপরিণত বালিকার উত্তরণ হয়েছে রমণীয় নারীত্বে।

ধ্রুবাদেবী গভীরভাবে অবলোকন করলেন মউলির নিষ্পাপ মুখটি। সে দৃষ্টি অন্তর্ভেদী, মহারানির কাছে কিছুই জানতে বাকি রইল না। মউলি নারীত্বের সোপানে পা রেখেছে, কিন্তু এখনও সে বালিকা। নবরাগের কুসুমটি সবে ফুটেছে, তার কাঁটাটি লুকিয়ে আছে অপাপবিদ্ধ অজ্ঞানতায়। এখনো বালিকা সম্যক জানে না বিবাহবন্ধনের জ্বালা।

মউলির কবরীবন্ধনে বিবাহরাত্রের ফুলসজ্জা তখনও খুলে ফেলা হয়নি। রাত্রিযাপনে কুঙ্কুমের রক্তিমাভা সারা মুখে বিস্তৃত হয়েছে।

অনিন্দ্য সেই মুখখানি দেখে ধ্রুবাদেবী ক্ষণকাল বাক্যহারা হলেন। মনশ্চক্ষে কল্পনা করে নিলেন, আজকের মধুযামিনীর পরে ঐ নিষ্পাপ বালিকাটি কোন বরবর্ণিনী যুবতীতে রূপান্তরিত হবে।

—বেশ করেছিস মউলি, যেখানে পছন্দ নয় সেখানে বিয়ে করিসনি, ভাল করেছিস। মউলির চিবুকে হাত রেখে মহারানি বললেন, কিন্তু হ্যাঁরে, তোর মনের মানুষটিকে যে সেখানেই পাবি, তা তুই জানতিস?

মউলি অসহায়ভাবে মাথা নাড়ল। কাতরস্বরে বলল, বিশ্বাস কর রানিদিদি, আমি কিছুই জানতাম না। কোথা দিয়ে কি যে হয়ে গেল!

—লক্ষ্মী মেয়েদের সঙ্গে ঐরকমই হয়। তা যেটা হল, সেটা কিরকম হল, মউলি?

মউলি লজ্জারাঙা মুখে নীরব রইল। অনেক কিছুই বলতে ইচ্ছে হয়। রানিদিদির কাছে তার গোপনীয় কিছুই নেই। কিন্তু নারীহৃদয়ের পরম আকাঙ্ক্ষিত সত্যটি কি ভাষায় উদ্ঘাটন করতে হয় মউলি তা জানে না। এক অজানা ব্রীড়ান্বিত সংকোচ আজ মউলিকে আচ্ছন্ন করেছে। যা বলতে চায় তা পারছে না। আর তা ছাড়া আর তো কিছুই বলার নেই। কি বলবে, স্বামীর সঙ্গে তার পরিচয়ই হয়নি। কিন্তু যেটুকু তাকে দেখেছে আর যা পেয়েছে, তাতেই তার হৃদয় যে পূর্ণ, মউলির যৌবনালোকিত আরক্ত আননে তা স্পষ্ট।

মহারানি মনে মনে সব বুঝে নিলেন। মউলি যা চেয়েছিল, তাই পেয়েছে। সে ছেলে যেই হোক, যেমনই হোক, মউলির হৃদয়মন্দিরের চাবি খুঁজে নিয়েছে। আর মউলি যাকে গ্রহণ করেছে, সে মন্দ হতেই পারে না। মুখচুম্বন করে মউলিকে আশীর্বাদ করলেন রানি। নিজের কণ্ঠের সর্বোৎকৃষ্ট মণিহারখানি খুলে পরিয়ে দিলেন মউলির গলায়। খেলার ছলে প্রিয়সখী তাঁর যে বিপদ ডেকে এনেছিল, তা মধুরেণ সমাপ্ত হয়েছে। মউলি তার মনোমত জীবনসঙ্গী পেয়েছে, এর চেয়ে খুশি আর কী আছে?

কিন্তু সব কথা তখনও তাঁর শোনা হয়নি। মউলির ফিরে যাবার তাড়া নেই দেখে মহারানি তাকে নিয়ে গিয়ে বসলেন তাঁদের প্রিয় সেই সরোবরের ধারে রৌপ্যকলস শোভিত সোপানপট্টে। আজকের রাত্রিটা সখীর জীবনে তো বারে বারে আসবে না। সে রাত্রির এখনো কিছু বিলম্ব আছে। তার মাঝে অনেক কিছু জানা ও জানানোর আছে যে!

—হ্যাঁরে মউলি, তুই যে এখানে এসে বসলি, ঘরে তোর অন্য কাজ নেই তো? আর সে তোর পথে চেয়ে থাকবে না?

—কে রানিদিদি?

—তোর বর, আবার কে?

—সে তো নেই। সেই সকালবেলাতেই তো সে চলে গেছে।

—সেকি রে! আজকের দিনে সকাল সকাল তোকে ছেড়ে সে কোথায় চলে গেল?

কথায় কথায় সব প্রকাশ পেল। মহারানি ধ্রুবাদেবীর গোচরে এলো সেই কথা যা তিনি শুনতে চাননি। যখন জানতে পারলেন মউলির স্বামী বৈদ্যরাজের শিষ্য, ভোররাত্রেই দূরদেশে চলে গেছে, তাঁর বুকটা আশঙ্কায় দুলে উঠল। আরো প্রশ্ন করে জানলেন তাঁর সে আশংকা অমূলক নয়। সে অকম্পনই, নিয়তির নির্বন্ধে আজ মউলি যার জীবনসঙ্গিনী। মহারানির আদেশে সেই আজ দূরদেশের যাত্রী।

এসব কিভাবে হল? নিয়তির কোন নিষ্ঠুর খেলায় মউলির মধুচন্দ্রিমা আজ রাহুগ্রস্ত হল? কেন মউলির নুতন জীবন শুরু হল বিচ্ছেদের বেদনা নিয়ে? সে যে বালিকামাত্র? তাঁর নিজের জীবনে যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, ঘটনাচক্রে প্রিয়সখী মউলিকেও কি তা গ্রাস করল? কেন এমন হল?

আর হায় রে ভাগ্য, মউলির দুর্ভাগ্যের নিমিত্ত হলেন তিনি নিজে? কিন্তু এ তো তিনি চাননি?

মহারানির অন্তর্লোকে আলোড়িত হচ্ছিল নানা অশুভ চিন্তা। কিন্তু সে চিন্তায় ছেদ পড়ল। চারু এসেছে। তার সঙ্গে আর এক অল্পবয়সি কন্যা। চারুর ভগ্নী চিকা। বয়সে সে নবীনা, কিন্তু তার সুবভ্রু চক্ষের গভীরে বিলসিত চঞ্চলতা। গোধূমবর্ণা কিশোরীদেহে প্রাকযৌবনের উচ্ছ্বাস। চারুর স্বামী যদি শ্যালিকায় মজেছেন, তাহলে তাঁকে খুব দোষ দেওয়া যায় না।

চারু বলে, এই আপনার চরণে নিয়ে এলাম রানিজি। দেখুন আমার উদ্ধারের কোনও পথ আছে কিনা।

মহারানি একবার চিকাকে দেখলেন। আচ্ছন্ন মস্তিষ্কে সহসা ভেবে পেলেন না এই বালিকাকে তিনি কী বলে নিরস্ত করেন। মউলি এগিয়ে এসে বলল, তুমিই বুঝি চিকা? আমি তোমার এক বন্ধু। আমার নাম মউলি।

চিকার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হল। পরমানন্দে বলে, ওমা! তোমার তো বিয়ে হয়েছে। তাহলে তুমি আমার দিদি। আমার এখনও বিয়েই হয়নি।

মহারানি এবারে বললেন, হয়নি, হয়ে যাবে। কিন্তু তুই কি তোর চারুদিদির স্বামীকে বিয়ে করতে চাস?

—ওমা, তা কেন। সে তো জামাইদাদা। তাকে কেন বিয়ে করব?

—তাহলে জামাইদাদার সঙ্গে এত হাসাহাসি করিস কেন?

—জামাইদাদা যে ভারী মজার মজার কথা বলে। জানো সে কি বলেছে? আমার জন্যে সাত সাগর পার থেকে বর এনে দেবে!

মহারানি ও মউলি দুজনেই হেসে ফেললেন। চারুর স্বামীর কথা বলা যায় না, কিন্তু চিকার তরফে মদনদেব ঘটিত কোনও সমস্যা নেই। স্বভাবতই সে উল্লসিত থাকে। নারী-পুরুষ দেহতত্ত্বের জটিলতায় তার ভাবনা এখনও আবিল হয়নি। জামাতৃপ্রীতির কারণ সাহচর্যেই সীমিত, অগ্রজার দয়িতকে প্রণয়পাশে আবদ্ধ করার দুরভিসন্ধি তার থাকতে পারে বলে বোধ হয় না।

চারুর করুণ মুখ দেখে মহারানির দয়া হল। তিনি বললেন, চারু, তুই তোর বোনকে আমার কাছেই রেখে যা। ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমি মানুষ করে নেব।

চারু এত বড় সৌভাগ্যের কথা বুঝি কল্পনা করেনি। বিস্তৃত দন্তবিকাশের সঙ্গে আভূমি প্রণাম জানিয়ে আপন ভগ্নীকে শাসন করে বলল, এই ঠিক হয়েছে। রানিজি যেখানে যাবেন তাঁর সঙ্গে যাবি, যেমন বলবেন তেমন করবি। আর আমার কোনও চিন্তা রইল না।

হৃষ্টচিত্তে চারু প্রস্থান করলো। যাবার আগে বলে গেল, এবার সে তার স্বামীকে নিশ্চিন্তে বশ করে ফেলবে। চিকা প্রথমটা একটু হতবাক হয়ে গেল। দিদি ও তার প্রিয় জামাইদাদাকে আর কাছে পাবে না, এই নতুন ব্যবস্থা কেন বোধগম্য হল না। কিন্তু সে বেশীক্ষণ ম্রিয়মাণ হয়ে থাকতে পারে না। নতুন মানুষের মাঝে নতুন বন্ধু ও সাহচর্য নির্মাণ করার প্রকৃতিসিদ্ধ ক্ষমতা আছে তার। অল্পক্ষণেই মউলির সঙ্গে তার সখ্য গভীর হল। নতুন সখির দুই হাত ধরে চিকা বলল, চল না আমরা বাগানে গিয়ে খেলা করি।

মউলিরও চিকাকে ভাল লেগে গিয়েছিল। ধ্রুবাদেবীকে সে বলল, চিকাকে তোমার বাগান দেখিয়ে আনি রানিদিদি? তারপর ছাদে নিয়ে যাব?

ধ্রুবাদেবী দেখলেন এই বেশ ভালো হল। তিনিও একটু একাকী থাকতে চান। সুস্মিত হেসে বললেন, বেশ তো। অকম্পন আমার ভাই। তাই আজকে এই তোর শ্বশুরগৃহ। আমার কাছেই আজ তোর বউ-ভাত, বুঝলি? আমি তোর ঘরে লোক পাঠিয়ে জানিয়ে দিচ্ছি, সেই কথা।

লজ্জা পেয়ে মউলি চিকার হাত ধরে উদ্যানের গভীরে অদৃশ্য হল। কিন্তু মহারানি আকাশ-পাতাল ভেবেও মনের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেলেন না। রঙ্গিণীকে ডেকে বললেন, ও রঙ্গিণি! এ কী হল বল দেখি? তুই কিছু বুদ্ধি দিতে পারিস?

রঙ্গিণী সবই অবগত ছিল। বলল, কী করি বলো তো?

—কারওকে পাঠিয়ে এক্ষুনি অকম্পনকে ফিরিয়ে আন। আমার প্রয়োজন নেই দৌত্যে।

—কিন্তু ঠাকুর তো সেই কাকভোরে চলে গেছেন। এখন আর তাঁকে কোথায় পাবে? তাছাড়া আর কারওর কথায় কি তিনি ফিরবেন?

মহারানি জানেন সে কথা। অকম্পন আর কারুর কথায় তাঁকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না। তা হলে? কাতর হয়ে রঙ্গিণীকে বললেন, যা হয় কিছু একটা কর রঙ্গিণি। দেখ না একটু, আর কেউ ঐ পথে যাচ্ছে কিনা। যদি দেখিস, তাকে বলে দে একটু তাড়াতাড়ি গিয়ে যেন অকম্পনকে ধরে। তাকে চিঠির কথা বলিস না, বিপদ বাড়বে। শুধু বলিস বিপদে-আপদে সে যেন অকম্পনকে রক্ষা করে।

—আমি দেখছি গো রানি, বলে রঙ্গিণী চলে গেল।

সেদিন অপরাহ্নে রানিমহলের ছাদের কবুতরখানা থেকে একটা কপিশ-কৃষ্ণ পারাবত পক্ষপুট মেলে উড়ে গেল নভোনীলিমায়। তার পায়ে বাঁধা অকম্পনের উদ্দেশ্যে মউলির প্রথম প্রেমসন্দেশ।

বুদ্ধিটা যুগিয়েছে চিকা। সারাদিনের পরে অকম্পনের জন্যে বড় উতলা হয়েছিল মউলি। দিনের আলোয় ভাল করে তো মানুষটাকে দেখাই হল না। আবার কবে যে হবে তাও জানে না। চিকা তার আনচান করা দেখে বলল, কী হয়েছে দিদি? বরের জন্যে মন কেমন করছে তো?

এক রাত্রিতে অনেকটা বড় হয়ে গেছে মউলি। চিকাকে সক্ষোভে ধমক দেয়, তুই থাম তো চিকা। বিয়ে হলে বুঝবি।

—ওমা, আমি তো বিয়ে না হতেই বুঝি, চিকা মুখ টিপে হাসে। মউলির চিবুক ধরে লজ্জারুণ মুখখানা তুলে ধরে বলে, আহা রে, মুখটা শুকিয়ে গেছে গো। তোমার দুঃখ আমি খুব বুঝতে পারছি। আচ্ছা, বরকে চিঠি লিখবে দিদি?

—দূর বোকা। আমি কি লিখতে পারি?

—সে তুমি কিচ্ছু ভেবো না দিদি। নীচে ধীরু লিপিকরের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে। খুব ভালো লিপিকর, চারুদিদির অনেক চিঠি লিখে দেয়। আমি এখনই ডেকে আনছি।

অল্পক্ষণেই একটি বৃদ্ধের হাত ধরে চিকা ফিরে এলো। দ্বিপ্রহরের এই কয়েক ঘটিকায় চিকা অনেক রাজকর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ করে নিয়েছে। ধীরু লিপিকর, অম্বু রজক, মালিনী রেণুকা, সংবাহক কাড়ু, সকলের সঙ্গেই চিকার অন্তরঙ্গ সখ্য স্থাপিত হয়ে গেছে।

ধীরু সামান্য লিপিকর। দুই নবীনা কর্ত্রীর মাঝে পড়ে সসঙ্কোচে বলে, ছাড়ো ছাড়ো দিদি, করো কি? মহারানির অনুমতি বিনা, দেখো কাণ্ড—

—মহারানির অনুমতি আমি নিয়ে নিয়েছি, সে তোমায় ভাবতে হবে না, চিকা দৃঢ়স্বরে বলে, এখন একটা চিঠি লিখে দাও দেখি।

—দেখো কাণ্ড! পত্র এক্ষুনি কি লেখা যায়? কার পত্র, কী লিখতে হবে কিছুই জানিনা। তা ছাড়া মসী-লেখও সঙ্গে নেই যে, ধীরুর কণ্ঠে করুণ মিনতি।

চিকা চক্ষু গোলাকার করে ধমক দেয়, মসী-লেখ সঙ্গে থাকে না, কেমন লিপিকর তুমি?

ধীরু লিপিকর কিছু বলবার আগেই তাকে একরকম বলপ্রয়োগেই নীচে পাঠায় চিকা, লেখার সরঞ্জাম নিয়ে আসতে। তারপর মউলিকে বলল, চলো দিদি, ততক্ষণ আমরা চিঠিতে কী লিখবে ঠিক করে নিই।

এর পরেই গড়গড় করে চিকা বলে যেতে লাগল, আর্য অকম্পনদেবের প্রতি বহু প্রণিপাত পুরঃস্বর পত্নী মধুমল্লিকার নিবেদন এই যে—

মউলি অবাক হয়ে বলে, ওমা, এসব কী বলছিস চিকা?

—পত্রে ঐরকমই লিখতে হয় দিদি, চিকা বিজ্ঞের ন্যায় জ্ঞাপন করে, জামাইদাদা বলেছে। জানো, তার এক কুটুম্ব রাজসভায় করণিকের কাজ করে? হ্যাঁ, তারপর লিখতে হবে, ওগো প্রিয়তম...

—প্রিয়তম?

—হ্যাঁ, নতুন বিয়ে হওয়া স্বামীকে ঐরকমই বলতে হয়। জ্ঞানগর্ভ উপদেশের ভঙ্গিমায় চিকা বলে চলে, লিখবে, ওগো প্রিয়তম, এই পত্রদ্বারা দাসী তোমার নিকট তার হৃদয়ের শত-সহস্র প্রেমবার্তা প্রেরণ করিতেছে। প্রাণেশ্বর, তুমি কি তাহা শুনিতে পাইতেছ? হে স্বামী, নবানুরাগের প্রকোপে আমি জ্বরজ্বর হইয়া তোমারই চরণে আপনাকে নিবেদন করিতে চাই। কিন্তু হে আমার প্রাণসখা, তুমি আর কতদিন আমাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিবে? এ বিরহের জ্বালা যে একমাত্র তোমারই আলিঙ্গনে আরোগ্য হইবে। তোমার অধরসুধা বিনা...

দেখা যাচ্ছে চিকার বয়স অল্প হলে কি হয়, পরিপক্কতায় সে কোনও অংশে কম নয়। মউলি অস্থির হয়ে বলে, এসব কি বলছিস চিকা আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—তুমি নবোঢ়া পত্নী, এইসবই তো লিখবে। নয়? আচ্ছা, তাহলে তুমিই বলো কি লিখতে চাও।

—আমি? পত্রে কি লিখবে মউলি তার কিছুই ভাবেনি। একটা ঢোক গিলে বলল, লিখব, সেই কালকের পরে আর তোমায় দেখতে পাইনি। তুমি কোথায় চলে গেলে স্বামী। তোমায় বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে গো... এইসব লিখে দিলে হয় না?

মউলি ভয়ে ভয়ে চিঠির বার্তা ব্যক্ত করে চিকার অনুমোদনের অপেক্ষায় চুপ করে। চিকা বিরক্ত হয়ে বলে, তুমি বড়ই ছেলেমানুষ দিদি। নববিবাহিত স্বামীকে প্রেমের জাল বিছিয়ে বশ করতে হয়!

এই বলে চিকা অটল গাম্ভীর্যে আরও কয়েক পংক্তি পত্রের বয়ান করল। মউলি বড় অসহায় বোধ করে। ক্ষীণস্বরে বলে, এইসব কি না লিখলেই নয়? উনি যদি বুঝতে না পারেন?

—ঠিক বুঝতে পারবেন, চিকা মউলিকে নিশ্চিন্ত করার জন্য বলে, এভাবেই যুগে যুগে দয়িতার আহ্বানে...

ইতিমধ্যে ধীরু লিপিকর তার লেখার সরঞ্জাম নিয়ে এসে পড়ে। চিকা তৎক্ষণাৎ তাকে আদেশ করে, লিপিকর, লেখো—

—দেখো কাণ্ড! অনুলিপি কোথায়? ধীরু আকাশ থেকে পড়ে, মুখে বললে কি আমি লিখতে পারি?

—কেন লিখতে পার না?

—দেবভাষা আমি জানি নাকি?

—দেবভাষার প্রয়োজন নেই। মুখের ভাষাতেই লেখো তুমি।

—অমন যে হয় না দিদি।

ধীরুর কাতর প্রার্থনায় কোন লাভ হয় না। চিকাকে প্রতিরোধ করা যায় না। অবশেষে লিপিকরকে একটি পটকখণ্ডে লিপিবদ্ধ করতে হয় পত্র, চিকা যেমন বলে। তারপর তাকে অব্যাহতি দিয়ে কুড্ডসংলগ্ন কবুতরখানা থেকে একটি পাখি বের করে আনে চিকা। ক্ষুদ্র পত্রখানি তার পায়ে বেঁধে নিম্নস্বরে 'যা পাখি, কালিঙ্গড়ে আর্য অকম্পনদেবকে এই বার্তা পৌঁছে দিস' বলে আকাশে উড়িয়ে দেয়। বল্গিতপক্ষে বিহঙ্গ মস্তকোপরি এক চক্র লাগিয়ে ঋজু উড়ান ভরে চলে যায় দূর দিগন্তের পানে। মউলি সেই দিশায় অপলকে চেয়ে থাকে।

মহারানি ধ্রুবাদেবী ছাদে প্রবেশ করে দেখতে পান বালিকাদের কাণ্ড। চিকাকে প্রশ্ন করেন, কী উড়িয়ে দিলি চিকা?

—দিদি পত্র পাঠালেন গো তাঁর স্বামীকে।

—ওমা, এই ভর সন্ধেবেলা? মহারানি এবার মউলিকে জিজ্ঞাসা করেন, এখন কি পাখি অত দূর যায় বোকা? ও তো কোনও গাছে আশ্রয় নেবে রাত্রির জন্যে আর সকালে সব ভুলে যাবে। পারাবত-বার্তা সকালে পাঠাতে হয়। তাও শেখানো কবুতর হলে।

মউলির চক্ষু ছলছল করে আসে। মৃদুস্বরে বলে, তাহলে ঐ চিঠি কি পৌঁছবে না রানিদিদি?

ধ্রুবাদেবীর বড় মায়া হয়। এই অপাপবিদ্ধ মানবীর ব্যথা তাঁর বুকেও বাজে। এক হাতে মউলির কণ্ঠবেষ্টন করে গাঢ়স্বরে রানি বললেন, পৌঁছবে মউলি। নিশ্চই পৌঁছবে। আজ না হোক, কাল না হোক, একদিন না একদিন ঠিক তোর সব কথা অকম্পনের কাছে পৌঁছে যাবে।

চিকার উৎসাহের অন্ত হয়েছে, আপাতত অন্যত্র তার আকর্ষণ। সে বলল, আমি তাহলে এখন যাই রানিজি? মালিনীমাসি সন্ধের পরে একসঙ্গে মালা গাঁথার জন্যে ডেকেছে।

মহারানি সম্মতি দিতেই ত্বরিতে চিকা প্রস্থান করল। মউলিকে সঙ্গে করে রানি নীচে সরোবরের কিনারে এসে বসলেন। আজ তাঁরা দুইজনেই এক বিচ্ছেদের সম্মুখীন। কে কাকে স্বান্তনা দেয়? অনেকক্ষণ নীরবে থেকে একসময়ে মহারানি বললেন, তুই যাবি মউলি তোর বরের কাছে?

—তুমি কী করে জানবে সে কোথায়?

—আমি যে সব জানি, মউলি। দু'দিন বাদে আমিও তো যাচ্ছি সেখানেই। তোর সঙ্গে আর হয়ত আমার দেখা হবে না।

—একথা কেন বলছ, রানিদিদি? সে কোন জায়গা যেখানে গেলে তুমি আর ফিরবে না? মহারাজ তোমায় যেতে দেবেন সেখানে?

—তোদের মহারাজই পাঠাচ্ছেন আমায় সেখানে। কিন্তু সেখানে গেলে আমি আর বাঁচব না।

মউলি শিহরিত হয়ে মহারানির মুখে হাতচাপা দিল। তার হতবুদ্ধি মুখপানে চেয়ে ধ্রুবাদেবীর মায়া হল। দু'হাতে তাকে আলিঙ্গন করে বললেন, এখনি ভয় পাস না, মউলি। আমাকে বাঁচাতে পারে এমন

একজন আছে। তোর বর আমার চিঠি নিয়ে তার কাছেই গেছে। সে যদি চিঠি ঠিক জায়গায় পৌঁছতে পারে—

—কোথায় কার কাছে গেছে সে, আমাকে সব কথা বলো না রানিদিদি, আমার যে বড় ভয় করছে...

মউলি জানতে চাইছে রানির মনের কথা। কিন্তু তাঁর মনে যা আছে আর তিনি যা ভাবছেন তা কি মউলিকে এখন বলা যাবে? মউলি তো জানে না অকম্পন এখন কোথায়, কিন্তু তিনি তো জানেন। এবং নিয়তির বিধানে শীঘ্রই তাঁকেও যেতে হবে সেখানেই। কয়েক মুহূর্ত নিলেন মহারানি মনস্থির করতে।

তারপর তিনি বললেন সব কথা। গতরাত্রির কথা এবং সেইসঙ্গে তার আনুপূর্বিক ঘটনাবলী।

ধ্রুবাদেবী লিচ্ছবি রাজবংশ সম্পর্কিতা অতি সুলক্ষণা কন্যা। মহারাজ রামগুপ্তের সঙ্গে তাঁর পরিণয় দু'টি রাজপরিবারের রাজনৈতিক মৈত্রীবশে নির্বাচিত হয়েছিল, তাতে হৃদয়ের যোগাযোগ ছিল না। তাঁদের বয়সের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। পারিপার্শ্বিক যুদ্ধবিগ্রহে ব্যতিব্যস্ত রুক্ষস্বভাব মহারাজ রামগুপ্তের সঙ্গে সম্ভ্রান্তমনা মহারানি ধ্রুবাদেবীর বিবাহবন্ধন অচিরেই শুধু এক রাজকীয় শিষ্টাচারের অভিনয়ে পর্যবসিত হয়েছিল।

মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের প্রতিনিধিস্বরূপ বিবাহপ্রস্তাব নিয়ে উপঢৌকন সামগ্রীসহ কনিষ্ঠ কুমার চন্দ্রগুপ্তই গিয়েছিলেন লিচ্ছবিতে। সেখানেই প্রথম তাঁর সাক্ষাৎ পান ধ্রুবাদেবী। দেবরের মাঝে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কল্পনা করে নিয়েছিলেন তিনি।

শ্বশুরগৃহে উপনীত হয়ে সে কল্পনা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। দুই সহোদরের প্রকৃতিগত পার্থক্য ধ্রুবাদেবীর অন্তঃকরণে তাঁর স্বামী ও দেবরের স্থান নির্দিষ্ট করে দেয়। অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবহারকুশল ও সুদর্শন কুমার চন্দ্রগুপ্তের ব্যক্তিত্বে ধ্রুবাদেবী আকৃষ্ট হন। চন্দ্রগুপ্তও মহারানির পারিবারিক জীবনের বিড়ম্বনায় সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, তা সত্ত্বেও রাজকীয় মর্যাদানুসারে নিজস্ব দূরত্ব বজায় রেখেই চলতেন। কিন্তু নিষিদ্ধ সম্পর্কের বেড়া ভেদ করে দুটি আকাঙ্ক্ষিত হৃদয়ে কখন যেন এক অনুরঞ্জিত বন্ধুত্বের কলি উন্মুকুলিত হয়েছে। পারস্পরিক সখ্য এই আকর্ষণ তারপর কিভাবে যে অন্তরঙ্গ প্রণয়ে রূপান্তরিত হয়েছে তা দু'জনের কেউই জানতে পারেননি।

তাঁদের সম্পর্কের দুর্বলতা বেশিদিন মহারাজ রামগুপ্তের দৃষ্টি এড়ায়নি। বর্তমান যুদ্ধের সুপরিচালনার অছিলায় তিনি কুমারকে জয়স্কন্ধাবারে প্রেরণ করেন। তা যে নিতান্তই অজুহাত, তাতে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ ছিল না। যুদ্ধের পরিণাম তখন প্রায় নির্ধারিত হয়েই গেছে। চন্দ্রগুপ্তের শেষমুহূর্তের সকল রণকৌশল ব্যর্থ হয়, তিনি পরাজয় রোধ করতে পারেননি।

শক সত্রাপ প্রেরিত সন্ধিপত্রে মহারাজ সম্মত হয়েছেন। এ পর্যন্ত যুদ্ধ পরিণাম মহারানির অগোচরেই ছিল, পরশু সন্ধিপত্র হস্তান্তরিত হওয়ার পর তা তাঁকে জানানো হয়। তখনই তিনি অসুস্থ হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। কেননা সন্ধিপত্রের অন্যতম শর্ত ছিল রাজ্যের উক্ত জয়স্কন্ধাবারের সঙ্গে মহারানিকেও হস্তান্তর করার! নির্লজ্জ শকটা উপঢৌকনস্বরূপ আর কিছু চায়নি, দাবি করেছিল গুপ্তরাজবংশের কুললক্ষ্মীকে।

ধ্রুবাদেবী প্রথমে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেননি যে, মহারাজ এমন শর্তে রাজি হয়েছেন। কিন্তু এই ছিল নিদারুণ সত্য, যুদ্ধশান্তির শর্তস্বরূপ সুমহান রাজকুলবধূকে হতে হবে এক ম্লেচ্ছ লম্পটের কামনার শিকার। ধ্রুবাদেবী নির্বাসিত হবেন শত্রুপুরীতে! সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে মহারাজ স্বয়ং সেই শক দুর্বৃত্তের হাতে তুলে দিতে সম্মত হয়েছেন নিজের পট্টমহিষীকে। যার শালীনতারক্ষার নিমিত্ত সহাস্যে প্রাণ দিতে পারে, এ রাজ্যের আপামর ক্ষত্রিয়, সেই ধ্রুবাদেবীর অমর্যাদায় অকুণ্ঠিত আজ তাঁরই ভর্তা।

কিন্তু কুমতিসম্পন্ন মহারাজের সম্মতি যে পরোক্ষে তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধি, হলই বা তা গুপ্তরাজকুলের কলঙ্কস্বরূপ, একথা অনুধাবন করতে মহারানির বেশি সময় লাগেনি। প্রথমটা ভেঙে পড়লেও, তিনি দিশাহারা হননি। তিনি জানতেন, এখন তাঁর একমাত্র ভরসা চন্দ্রগুপ্ত। তাঁর কাছে রাজকুলমর্যাদা মহারাজের চেয়ে অনেক বেশি, বিশেষত সে মর্যাদা যখন ধ্রুবাদেবীর সঙ্গে জড়িত।

কিন্তু মহারাজের অগোচরে চন্দ্রগুপ্তের কাছে বার্তা প্রেরণ সম্ভব নয়। অনেক ভেবে বিশ্বস্ত রাজবৈদ্যের মাধ্যমে তাঁর শিষ্যের সাহায্যপ্রার্থনা, যেহেতু তিনি জানতেন একমাত্র প্রভাকর মিশ্রই তাঁর উপর যথেষ্ট স্নেহশীল এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। অকম্পনের উপর ভার পড়ল সে বার্তা নিয়ে যাবার। মহারানি বার্তায় তাঁর দুর্ভাগ্যের সংবাদ এবং অকম্পনের পরিচয় দিয়ে লিখেছিলেন, এই সংবাদবাহকের বার্তায় অবজ্ঞা কোরো না, আমার জীবন-মরণ তোমার হাতে সমর্পণ করলাম।

তিনি জানেন না চন্দ্রগুপ্ত সে বার্তা পেয়েছেন কি না, এবং পেলেও তিনি কিভাবে মহারানিকে রক্ষা করবেন। কুমারের উপর অগাধ আস্থায় মহারানি বুক বেঁধে আছেন। কুমার অবশ্যই কোন পন্থা উদ্ভাবন করবেন, যাতে তাঁর বংশ কলঙ্কিত না হয়।

অবশ্য তিনি সফল না হলে জীবনান্ত করার অন্যান্য সাধন তো আছেই।

অকল্পনীয় দুঃসংবাদ সহসা একবারে মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হয় না। ক্ষণকাল পরে অনুভবের মূলে গিয়ে তা নাড়া দেয়। মউলিরও সবকিছু অনুধাবন করতে একটু সময় লাগলো। তারপর ধীরগতি বিস্ফোরণের মত তা চেতনার স্তরে স্তরে প্রকীর্ণ হতে লাগলো। যুদ্ধ-সন্ধির শর্ত! নির্বাসন! শত্রুপুরী! শব্দগুলি বড় জটিল বোধ হয় মউলির। কিন্তু এ শর্তই বা কেমন? মহাদেবীর নির্বাসন! মহান গুপ্তরাজবংশের এ অভাবনীয় কলঙ্কের পরিমাপ মউলি করতে পারে না। রাজনৈতিক কূটনীতি তার অবোধ্য বিষয়। কিন্তু এমনটা কি আদৌ সম্ভব?

মউলি স্তব্ধ হয়ে ছিল। মহারানি বললেন, আমার কথা জানি না। আমি যে কলঙ্কিনী রে, পরকীয়ার পাপ করেছি। তাই হয়তো আজ আমার এই দণ্ড। কিন্তু আমার মন বলছে তোর কোনও ক্ষতি হবে না। তোর প্রেম পবিত্র, তা তুই ঠিক ফিরে পাবি।

শুনতে শুনতে মউলি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। রানিদিদি তার কাছে দুনিয়ার সম্রাজ্ঞী, তিনি পারেন না এমন তো কিছুই নেই। সেই রানিদিদির বুকের মধ্যে জমা হয়ে আছে এত কষ্ট? কই, সে তো কখনো জানতে পারেনি? মহারানি তাকে জানতেই দেননি। রানিদিদি না থাকলে তো তার জীবনও যে অর্থহীন হয়ে যাবে। আকুল হয়ে সে ভাবতে লাগলো, অকম্পন কি পারবে কুমারের সঙ্গে মিলিত হতে? কুমার কি পারবেন?

—কাল বাদে পরশু আমি চলে যাচ্ছি মউলি। তুই যাবি আমার সঙ্গে?

মহারানি যে এ প্রস্তাব দেবেন তা মউলি কল্পনাও করেনি। এর তো একটাই উত্তর জানে মউলি। সে অবশ্যই যাবে রানির সঙ্গে। তাকে যেতেই হবে, সে কিছুতেই মরতে দেবে না তার রানিদিদিকে।

তারপরে রাতের প্রহর গড়িয়ে চলল। দুই সখীর মাঝে কিছু বাক্যে কিছু নিরুচ্চার অভিব্যক্তিতে আরও কত ভাবের বিনিময় হল এখানে তার আর বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা নেই। মউলির সে রাতে আর গৃহে ফেরা হল না। পুনরায় সংবাহক প্রেরিত হল তার গৃহে।

॥ ১১ ॥

মহারানি অকম্পনকে সতর্ক করে বলেছিলেন, পথে বিপদ আসতে পারে। কিন্তু সে বিপদ যে এতো শীঘ্র ও এমন অতর্কিতে আসবে তা জানা ছিল না।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে যখন অকম্পন উড়ালিয়া গ্রামের নিকটবর্তী হল তখন দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত। পথে আরও দুটি জনপদ পার হতে হয়। তাছাড়া কয়েকটি জলসত্র, বিহার ও আশ্রমও পড়ে। সেসব জায়গায় অশ্বাবতরণ করে জয়স্কন্ধাবারের পথনির্দেশ নিতে নিতে সে অগ্রসর হয়েছে। অবশেষে গন্তব্য সন্নিকট হয়, অকম্পনের মনে অভীষ্টসিদ্ধির প্রসন্নতা।

গ্রামে প্রবেশ করার আগেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে কিন্তু পশ্চিমাকাশে লালিমার রেশ মুছে যায়নি। দূরে দেখা যাচ্ছে কাল-নৈয়া শিরি। পথ দক্ষিণাভিমুখে ঘুরে উড়ালি গ্রামে

গিয়ে পড়েছে। মূল জনপদের বাইরে এসে গেছে অকম্পন। গ্রাম আর বেশি দূর নয়। দুই একটি কুটির দেখা যাচ্ছে। দিনের শেষে কয়েকজন কৃষক গৃহাভিমুখে চলেছে।

হঠাৎ সে শুনতে পেল তার পিছনে দ্রুত ধাবমান অশ্বখুরের শব্দ। মুখ ঘুরিয়ে দেখে ধুলোর ধূম্রজাল উড়িয়ে তিনটি অশ্বারোহী তীব্রগতিতে তার দিকেই ধেয়ে আসছে।

অকম্পন আগেই থেমে গিয়েছিল, অল্পক্ষণেই ধাবমান অশ্বারোহীরা সম্মুখের পথরোধ করে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। লোকগুলোর মুখমণ্ডল বস্ত্রাচ্ছাদিত, শুধু চক্ষু অনাবৃত। একজন আর একজনের দিকে প্রশ্নের ভঙ্গিতে দেখলে অপরজন সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করল। তখন প্রথম ব্যক্তি অশ্বাবতরণ করে অকম্পনের দিকে এগিয়ে এল, মুখের বস্ত্রখণ্ড সরিয়ে কর্কশস্বরে বলল, তুমি গুপ্তচর!

প্রথমটা তাদের দস্যুই মনে হয়েছিল। এখন অনাবৃত শিরোভূষণের তকমা দেখে অকম্পন অনুমান করলো তারা রাজকর্মচারী। কিন্তু আশ্বস্ত হবার সুযোগ না দিয়েই লোকটি আবার প্রশ্ন করল, আজ সকালে কী বার্তা নিয়ে নগরী পরিত্যাগ করে এসেছ?

এরা কিভাবে এসব জানতে পারল তা চিন্তা করে হতবাক হল অকম্পন। বিস্ময়ের ধাক্কা কোনমতে কাটিয়ে সে বলল, আমি ব্রাহ্মণ, উজ্জয়িনীর বাসিন্দা। আমার গন্তব্য আপাতত উড়ালি গ্রামে এক আত্মীয়ার গৃহে। কিন্তু আমি গুপ্তচর হলাম কীভাবে?

—বিশ্বাস করি না। লোকটি উগ্রভাবেই জানালো, তোমার সামগ্রীর তল্লাশ করতে হবে।

এই কথার পর আর দ্বিরুক্তি না করেই সে অকম্পনের সারা শরীর স্পর্শ করে সন্ধান শুরু করে দিল। অন্য দু'জন এগিয়ে এসে তার ঘোড়ার উপর পোট্টলিতে অন্যান্য যে সামগ্রী ছিল, তা নামিয়ে টেনে খুলে ফেলতে লাগল।

প্রমাদ গুনল অকম্পন। সর্বনাশ! মহারানির বার্তা তো আর গোপন থাকবে না! কিন্তু দেখল বাধা দিয়েও কোনও লাভ হবে না। অসহায় উৎকণ্ঠা নিয়ে দ্রুত ভাবার চেষ্টা করতে লাগলো কি অজুহাতে এই আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

বেশী সময় লাগলো না। বস্ত্রাদি, তৈজস, ওষধির পাত্র ইত্যাদি তছনছ করে অবশেষে সেই পুলিন্দাটি নিয়ে বিজয়গর্বে উঠে দাঁড়ালো একজন। অকম্পন লক্ষ্য করলো পুলিন্দাটি পেয়েই তারা হর্ষোৎফুল্ল হয়ে তল্লাশ বন্ধ করে দিল। মুদ্রা ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি তারা স্পর্শ করেনি। এমন কি, মহারানি প্রদত্ত অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়টি অকম্পন কনিষ্ঠায় ধারণ করেছিল, মুদ্রাঙ্কিত দিকটি মুঠির ভিতর করে। সেটাও তারা ভ্রূক্ষেপ করল না।

তিনজনের মধ্যে যাকে দলপতি বলে মনে হয়, সে শ্লেষমিশ্রিত বক্রদৃষ্টিতে অকম্পনের দিকে চাইল। ভাবখানা, তবে যে বলেছিলে তুমি চর নও? অকম্পন একবার শেষ চেষ্টা করে কাতরভাবে বলল, ওতে কি আছে জানি না, আমি বাহক মাত্র। কিন্তু দয়া করে ওটির কোনও অনিষ্ট কোরো না।

তিনজনের কেউই দয়ার্দ্র হল না। জতুলাঞ্ছিত গ্রন্থিমোচন করে চক্ষের নিমেষে পুলিন্দাটি খুলে ফেলা হল। বাইরের আবরণটি ফেলে দিলে বেরিয়ে এলো কতকগুলি ভাঁজকরা বহুবর্ণের রেশমী বস্ত্রখণ্ড। সেগুলি সম্পূর্ণ শূন্য, তাতে কোনও বার্তা অথবা লিপি অঙ্কিত ছিল না। তাছাড়া আর কোনও পত্রাংশের চিহ্নমাত্রও সেখানে নেই!

স্তম্ভিত অকম্পন! মহারানির কথাগুলি তার মনে এলো। তাঁর সেই অনুনয়পূর্ণ নির্দেশ, সে কি অর্থহীন রসিকতা মাত্র? তা কখনওই সম্ভব নয়। তাহলে?

লোকগুলিও নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে, দৃষ্টিতে সকলেরই অকৃত্রিম বিমূঢ়তা। অনুমানে বোঝা যায় তারা যে বস্তুর সন্ধান করছিল, তা পাওয়া যায়নি। অকম্পনও কম বিস্মিত নয়। কিন্তু আপাতত এক সমূহ বিপদ কেটে গেছে এটুকু অনুধাবন করে নিজেকে একটু সংবৃত করে নিল সে। শুষ্কস্বরে বলল, দূরদেশ থেকে

প্রিয়জনের জন্য প্রেরিত উপহার বিনষ্ট করার কি কোনও প্রয়োজন ছিল?

অপরাধের কোনও প্রমাণ পাওয়া না যেতে সৈনিক সর্দারও কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হয়েছিল, বলল, আমরা রাজাজ্ঞা পালন করেছি মাত্র। কিন্তু তুমি এখনও সন্দেহের ঊর্ধ্বে নও। তারপর তার এক সঙ্গীর উদ্দেশ্যে বলল, বার্তা পাইনি বটে, কিন্তু প্রমাণস্বরূপ এই বস্ত্রখণ্ডগুলোই নিয়ে চল।

হতবুদ্ধি অকম্পনকে পরিত্যাগ করে তারা সেই রেশমবস্ত্রগুলি নিয়ে ত্বরিতে নগরীর দিকে ফিরে গেল। অকম্পনের ব্যবহারসামগ্রী সব পথের উপর ধুলোধুসরিত হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পড়েছিল। ভগ্নহৃদয়ে নীচু হয়ে একে একে সেগুলি পুনরায় সংগ্রহ করে অকম্পন তার পোট্টলিকা আবার বেঁধে নিতে প্রবৃত্ত হল। মহারানি যে পট্টবস্ত্রে পুলিন্দাটি বেঁধে দিয়েছিলেন, তস্করেরা তা ফেলে দিয়ে গেছে। সেটা তুলে নিতে গিয়ে অকম্পনের বুকটা হু-হু করে উঠলো। ভিতরে যাই থাক না কেন, অকম্পন ব্যর্থ হয়েছে দৌত্যকার্যে। মহারানি কী ভেবে বস্ত্রখণ্ডগুলি পাঠিয়েছিলেন জানা নেই, কিন্তু তা যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং কোনও সংগত কারণেই, এব্যাপারে অকম্পনের কোনও সন্দেহ নেই।

পথের ধারে নিরাশ হয়ে বসে পড়েছিল সে। একবার তার মনে হল আর অগ্রসর হয়ে কি লাভ? সবই তো ব্যর্থ হল। কিন্তু এতখানি পথ পেরিয়ে এসে অবশেষে শূন্য হাতে ফিরে যেতে হবে? ব্যর্থতার গ্লানি মাথায় নিয়ে স্বরাজ্যে ফিরে যেতে তার বাসনা হল না। নিজের কাছেই তার কোনও সান্ত্বনা ছিল না। তদুপরি এখন আর একজন বিশেষ মানুষ যে তার পথ চেয়ে আছে। তার কাছে সে অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যাওয়ার লজ্জা গোপন করবে কীভাবে?

ফিরে যাওয়ার ভাবনা ত্যাগ করে সে অশ্বের বল্গা হাতে পায়ে হেঁটেই উড়ালির দিকে অগ্রসর হল। কতক্ষণ চলেছিল জানে না। আনমনা পথ চলতে থাকায় বুঝতে পারেনি তার পশ্চাতে আরও গুটি কয় অশ্বারোহী আসছে। নিকটবর্তী হয়ে তাদের মধ্যে প্রথমজন ঘোড়া থেকে নেমে অকম্পনের পিছনে হাত দিয়ে ডাকল, অকম্পনদেব, আপনি?

চকিতে পিছন ফিরে অকম্পন দেখে, রবিস্তোত্র! তারাও কালানের পথে যেতে এতক্ষণে উড়ালি এসে পৌঁছেছে।

সাময়িক উত্তেজনার অবসান হয়ে অকম্পনের বর্ধিত হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল, কিন্তু তার পথ চলার নিরুৎসাহ শ্লথগতি দেখে রবি অনুমান করে নিল এরই মাঝে নিশ্চই অকম্পনের জীবনে ঘটে গেছে কোন অঘটন। কুশলপ্রশ্ন করে জিজ্ঞেস করল, আপত্তি না থাকলে কী হয়েছে আমাকে বলুন না। যদি আমি কিছু সাহায্য করতে পারি।

সর্বস্বান্ত অকম্পনের এখন আর বলতে কী বাধা? বরং স্বল্পপরিচিত একজনকে দেখে মনে খানিক বল পেল। তাছাড়া সত্যিই হয়তো সে কোন সাহায্য করতে পারে। রবির কাছে অনুমতিপত্র আছে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই রবি তাকে একথা জানিয়েছিলো। এখন তাকে দেখে যেন অনেকটাই বিশ্বাসযোগ্য মনে হল। আর একটা অবলম্বন এখন অকম্পনের অত্যন্ত প্রয়োজন। পূর্বের সাক্ষাতে নিজের ব্যবহারে লজ্জিত বোধ করল সে। অথচ এখন রবির আচরণে তার জন্য কোনও বৈরিতা দেখা গেল না।

আজ পান্থশালায় অকম্পন যখন রবিকে রূঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিল তখন তার সামনে ছিল প্রাপ্তির আশ্বাস আর এখন সে বসে আছে হারানোর হুতাশে। তাই সংকোচ সরিয়ে একটু অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করলো সে, আপনি সঠিক অনুমানই করেছিলেন। আমাকে জয়স্কন্ধাবারেই যেতে হবে, একটা বিশেষ কাজে। কিন্তু একটা মূল্যবান বস্তু হারিয়ে ফেলে বিপাকে পড়ে গিয়েছি। আমি কি আপনার সঙ্গে আসতে পারি?

—তা তো সম্ভব নয়, আমার সঙ্গে যে অনুমতিপত্র আছে তা শুধু আমারই নামে। এই দেখুন।

রবি তার অনুমতিপত্রটি বের করে দেখাল, রাজকীয় মোহরাঙ্কিত পত্রে শুধু তারই নাম এবং যে সামগ্রী সে নিয়ে যাচ্ছে তার বর্ণনা। এও বলা আছে যে অন্য কোনো ব্যক্তি বা সামগ্রী সে তার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না।

—তবে আপনার কাজটি কি জানতে পারলে পরামর্শ করে দেখা যাতে পারে আমার দ্বারা তা সম্ভব কি না। রবির স্বরে আন্তরিকতার অভাব ছিল না। বোঝা যায় সে মনে অসন্তোষ জমিয়ে রাখেনি।

অকম্পন দেখল, রবি তাকে সত্যিই সাহায্য করতে আগ্রহী। ভাল করে দেখেও একজন কর্মক্ষম ব্যবসায়ী ছাড়া আর কিছু মনে হয় না তাকে, প্রবঞ্চক তো নয়ই। তাছাড়া অকম্পন বর্তমানে নিরুপায়। পথ এবং রাজকীয় কার্যকলাপ সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতাও তার নেই। অথচ রবি এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞ। রবির সাহায্য ছাড়া সে কিছুতেই কুমার চন্দ্রগুপ্তের কাছে পৌঁছতে পারবে না। এইসব খানিক ভেবে অকম্পন সব কথা রবিকে জানাল। তারপর এও জানালো কিভাবে মহারানির সে পত্র তার কাছ থেকে লুণ্ঠিত হয়েছে।

সব শুনে রবিস্তোত্র গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বলল, আপনি যে কাজের ভার নিয়েছেন তা কিন্তু বিপজ্জনক। এ জন্য প্রয়োজনীয় কি সতর্কতা আপনি অবলম্বন করেছেন জানিনা, অনুমান করছি কিছুই করেননি। আপনার অজ্ঞাতসারে চর আপনার পশ্চাদ্ধাবন করবে, এটা কিন্তু খুবই স্বাভাবিক ছিল।

অকম্পন অপ্রস্তুত হয়ে কাষ্ঠহাসি হাসল। সত্যই সে এ বিষয়ে কিছুই চিন্তাভাবনা করেনি। যদিও রাজপ্রাসাদ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই তার সন্দেহ হয়েছে কিছু লোকের দৃষ্টি যেন তাকে অনুসরণ করছে। এখন যদিও দেরি হয়ে গেছে, তাও একবার এদিক-ওদিক দেখে নিল, কিন্তু উপস্থিত সন্দেহ করার মতো আর কারওকে সে দেখতে পেল না।

—কিভাবে আপনার কার্যসিদ্ধি সম্ভব, সেটা এখনই বুঝতে পারছি না। এক কাজ করা যাক, আপাতত উড়ালি পর্যন্ত যাওয়া তো যাক, রবি পরামর্শ দিল, সেখানে অধিকারীদের সঙ্গে কথা বলে দেখতে হবে যদি বিশেষ অনুমতিপত্র আদায় করা যায়। কিন্তু সাবধান, মহারানির বার্তা নিয়ে আপনি যাচ্ছেন, একথা কোনভাবেই যেন প্রকাশ না হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে একমাত্র রাজাজ্ঞা ব্যতীত কোনও বার্তা নিয়ে যাওয়া অপরাধ, একথা প্রকাশ হলে তৎক্ষণাৎ আপনি বন্দি হবেন। চলুন।

উড়ালির পান্থনিবাসটি সামরিক ও অসামরিক প্রয়োজনে সর্বস্তরের অতিথিরা ব্যবহার করে থাকে, তার সংলগ্ন একটি প্রশাসনিক কার্যালয়ও ছিল। যাত্রীদের পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র প্রদান এইখানেই করা হয়। স্থানটি বহিরাগত পথিকের সমাগমে পূর্ণ। তাদের অধিকাংশ যে মূলত রাজকার্যেই এসেছে, তাদের বেশবাসেই সে পরিচয় আছে। কেউ আসছে যুদ্ধক্ষেত্রের দিক থেকে রাজধানীর পথে। কেউ বা বিপরীতমুখী, রাজধানী থেকে সমরাঙ্গনমুখী। দীর্ঘকাল বসবাসের উদ্দেশ্যে কেউই এ পান্থনিবাসে আসে না। এর মাঝে অকম্পনেরই শুধু গন্তব্যের কোনও স্থিরতা ছিল না। সুস্থির নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত সে, পরিস্থিতির এইরকম অদ্ভুত ঘূর্ণাবর্তের সম্মুখীন কখনও হয়নি। শূন্যমনে পথিকদের আনাগোনা লক্ষ করে চলেছিল সে।

সম্মুখের একটি কক্ষে বৃষস্কন্ধ এক মহাধিপ আগন্তুকদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে চলেছে। তার কয়েকজন সঙ্গী যাত্রীদের পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশি ও তদনুসারে জিজ্ঞাসাবাদ ইত্যাদি করছে। এদের দৃষ্টি এড়িয়ে অগ্রসর হওয়া একপ্রকার অসম্ভব, এই দেখে অকম্পন আরও বিমর্ষ হয়ে গেল।

হতাশ হয়ে তারা দুইজনে পান্থনিবাসের পিছনদিকে অঙ্গনপীঠিকায় এসে বসল। ইতিমধ্যেই রবি কিছু আহার্য সংগ্রহ করে এনেছিল। একত্রে বসে তারই সদ্ব্যবহার ও বিশ্রামের ফাঁকে তারা আলাপ আলোচনা করছিল। আর এক শ্রেষ্ঠীর দল কিছুক্ষণের মধ্যেই আসবে। তাদের সঙ্গে রবি আজ রাত্রেই রওয়ানা হবে। কালান গড় এখান থেকে চার ক্রোশ। ব্যবসায়ীদের পরিচিত পথ, ছয় দণ্ডের মধ্যেই পৌঁছন যায়। অকম্পন সে রাত্রি কাটিয়ে প্রভাতেই যেতে চায়, যদিও কীভাবে তা এখনও স্থির হয়নি।

আলোচনা ঘুরে ফিরে আবার অকম্পনের উপর সৈনিকদের আক্রমণে ফিরে এল। রবিস্তোত্র একসময়ে বলল, আপনি বলছেন কোনও পত্র রক্ষীরা পায়নি? আপনি ঠিক দেখেছিলেন?

—রক্ষীরা আমার সামনেই রেশমি বস্ত্রগুলো পরীক্ষা করেছিল। তাতে কিছুই ছিল না।

—পুলিন্দায় আর কিছু ছিল না তো? খোলবার সময় পড়ে গেছে হয়তো?

—না, তাহলে আমার দৃষ্টি এড়াতো না।

—আমাকে একবার দেখাবেন, কীভাবে ওটা বাঁধা ছিল?

—দেখুন না, বলে অকম্পন সেই হরিৎবর্ণের পট্টবস্ত্রখানা বার করে রবিকে দেখাল। সেটা খানিক পর্যবেক্ষণ করে রবি বলল, উত্তরদেশের পণ্য, এই বস্ত্র আমরা অনেক সরবরাহ করে থাকি।

তারপর আকাশের দিকে চেয়ে বেশ খানিকক্ষণ কি ভেবে রবি হঠাৎই বলল, আর্য অকম্পন, আমার বিচারে আপনার বোধহয় রাজধানীতে ফিরে যাওয়াই মঙ্গল।

ফিরে যাবার পরিকল্পনা অকম্পন ত্যাগ করেছিল, কিন্তু কিসের বিচারে রবিস্তোত্র এই পরামর্শ দিচ্ছে জানবার জন্য প্রশ্ন করতেই যাবে, এমন সময়ে শুনতে পেল কর্কশ স্বরে কেউ তাঁকে প্রশ্ন করছে, তুমি কি রাজধানী থেকে আসছ?

পিছন ফিরে অকম্পন দেখে এক নাতিস্থূল খর্বাকৃতি ব্যাক্তি তাঁকে প্রশ্ন করছে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ লোকটার মাথায় এক বিশেষ ধরণের বস্ত্রের শিরোভূষণ। এদের অকম্পন জানে, এরা স্বরবাহ।

স্বরবাহ বলা হতো এক শ্রেণির উপজাতীয় মানবগোষ্ঠীকে, যারা সেকালে মৌখিক সংবাদ পরিবহণ করে নিয়ে যেত দূরদূরান্তরে। এদের সঙ্গে থাকতো না কোনও পত্র বা লিপি। এরা সভ্যভাষা জানত না, নিজেদের নিম্নবর্গের ভাষায় তারা কথাবার্তা বলতো। কিন্তু উচ্চবর্গের, এমনকি দেবভাষার বার্তাও এরা বহন করে নিয়ে যেত। অর্থ না বুঝেই বার্তা এরা মুখস্থ করে নিত, উচ্চারণভিত্তিক এক সাংকেতিক পদ্ধতিতে। সে পদ্ধতি এমন নির্ভুল ছিল যে সংস্কৃত ভাষার সংবাদও এরা প্রাপকের নিকট হুবহু উদ্ধৃত করতে সক্ষম ছিল। সম্রাট অশোকের আগে, যখন লিপি আবিষ্কৃত হয়নি, তখন প্রধানত স্বরবাহ দিয়েই বার্তা আদানপ্রদান চলতো। লিপির প্রচলন হলেও সেই প্রথা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়নি। পুরুষানুক্রমে স্বরবাহের কয়েকটি ধারা এখনও অব্যাহত আছে। আজও সহজে অল্পকথার বার্তা প্রেরণ করতে সাধারণ্যে তো বটেই, এমন কি রাজন্যবর্গও স্বরবাহের ব্যবহার করে থাকে।

ইতিবাচক উত্তর পেয়ে স্বরবাহক বলল, গন্তব্য?

অকম্পনকে হতবুদ্ধি দেখে পুনরায় বলল, কালান গড়ে যাচ্ছ কি?

এই অপরিচিত তাকে এ প্রশ্ন করে কেন? এর সঙ্গে মিলিত হলে অকম্পনের গন্তব্যে পৌঁছোবার কোনও উপায় হতে পারে এই ভেবে অকম্পন সরাসরি তাকে প্রত্যাখ্যান না করে বলল, কেন বলো তো?

—একবার এদিক পানে এসো দেখি, এই বলে লোকটা ইশারায় তাকে অপেক্ষাকৃত একটু জনহীন স্থানে নিয়ে যেতে চাইল। এক অজানা সম্ভাবনার আভাস পেয়ে রবির সঙ্গে আলোচনা স্থগিত রেখে অকম্পন তাকে অনুসরণ করল।

কিছুদূরে এসে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে সন্তর্পণে লোকটি বলল, আমার নাম কুলিক। স্বরবাহ। যুদ্ধক্ষেত্রের বার্তা আছে। কিন্তু আমায় কাল সকালের মধ্যেই উজ্জয়িনী ফেরার আদেশ হয়েছে। তাই বার্তাটুকু যদি তুমি সেনানী দত্তসেনের কাছে দিয়ে দাও, তাহলে আমার সময় কিছু সংক্ষেপ হয়। এখন বলো, তুমি যদি ওইদিকেই যাচ্ছ তো আমার এই উপকারটা করতে রাজি আছ কিনা।

এতক্ষণে ব্যাপার স্পষ্ট হল। লোকটা অকম্পনকেও আর এক স্বরবাহ মনে করেছে। অকম্পনের মনে পড়ল তার মাথাতেও গাঢ়বর্ণের শিরবস্ত্র। অল্পালোকে তার গাত্রবর্ণ লোকটি ভাল করে দেখেনি। কিন্তু এ তো মন্দ হল না। এই পথে কি কালানে পৌঁছোবার কোনও উপায় হতে পারে? একটু ভেবে অকম্পন বলল, আমি কালানেই চলেছি। কিন্তু আমাকে কী করতে হবে?

—সামান্য কাজ। একটা গোপনীয় বার্তা উপনায়ক দত্তসেনকে দিতে হবে। তুমি উপনায়কের নিযুক্ত লোক তো? তোমার মন্ত্রকূট বলো।

মন্ত্রকূট! কী সেই বস্তু? শব্দটা অকম্পনের মস্তিষ্কে একটা মৃদু তরঙ্গের সৃষ্টি করলো, সহসা মনে করতে পারল না কোথায় সে এই শব্দ শুনেছে। তারপর অকস্মাৎ রঙ্গিণীর মুখচ্ছবি তার স্মৃতিপটে ভেসে এলো। রঙ্গিণী তাকে বলেছিল এক মন্ত্রকূটের কথা। খানিক অজান্তেই যেন তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, বরেণ্যম্!

বলেই অকম্পনের মনে হল কিছু ভুল হল না তো? এই বুঝি সব পণ্ড হয়! কিন্তু দৈব অকম্পনের সহায়, লোকটির সন্তোষজনক শিরঃসঞ্চালনে বোঝা গেল মন্ত্রকূট মিলেছে। নিরুদ্বেগে এবার সে বলল, শোনো।

এরপর লোকটি আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে যা বলল তার অর্থ, পথের কাঁটা অপসারণের অস্ত্র আছে পূর্বদ্বারের পঞ্চকর্ণের কাছে। এই বার্তা দেবে স্বয়ং উপনায়ক দত্তসেনকেই।

অকম্পন এবার বিস্ময়ে চমৎকৃত হল, কেননা বার্তার ভাষা ছিল সংস্কৃত! শুদ্ধ নয়, দেবভাষার কথ্য অপভ্রংশ। তদুপরি যুক্ত হয়েছে অনার্য জিহ্বার জড়তা। কিন্তু তা সত্ত্বেও অকম্পনের বুঝতে অসুবিধে হল না। সে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, এর অর্থ কী?

—অর্থে তোমার কি দরকার হে? যেটুকু কাজ তাই করো। হ্যাঁ, বলো দেখি কি বলবে?

বার্তা পুনরাবৃত্তি করতে অকম্পনের কোনও সমস্যা হল না। লোকটি সন্তুষ্ট হয়ে বলল, আমি এখানে যাত্রাভঙ্গ করে ফিরে যাচ্ছি। মহাধিপ আমার পরিচিত, তার অনুমতি নিয়েছি। তুমি আমার নাম করে বাকি পথের জন্য তোমার নামটা লিখিয়ে দিও। ও হ্যাঁ, কি যেন নাম তোমার?

অকম্পন অবচেতন মনে অনেকটা আলোর আভা দেখতে পেল। নিজের প্রকৃত নাম না বলে একটা অনার্য নাম বলে দিল। তা শুনেই আর অপেক্ষা করল না কুলিক। হাত তুলে একটা ইশারা করেই গিয়ে নিজের অশ্বে আরোহণ করে দ্রুত অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

অকম্পন আর সময় নষ্ট না করে সোজা মহাধিপের কার্যালয়ে চলে এল। একটু ইতস্তত করে নিজের সেই কল্পিত নাম উদ্ধৃত করে জানাল, কুলিকের অসম্পূর্ণ যাত্রা তাকে সম্পূর্ণ করতে হবে। তার নিজের পরিচয়পত্র দস্যু হরণ করেছে। তাঁকে বিশেষ অনুমতি প্রদান করা হোক।

মহাধিপ তার খাতায় কুলিকের প্রবিষ্টি পরীক্ষা করে নিল। তারপর একপ্রস্ত অকম্পনের অপাঙ্গ নিরীক্ষণ করে বলল, প্রমাণপত্রের জন্য বিশেষ তদন্ত আবশ্যক। তোমাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

অকম্পন একবার চিন্তা করল রবিস্তোত্রের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করে। কিন্তু মহাধিপের কখন তাকে প্রয়োজন হয় ভেবে কার্যালয়ের নিকটেই একটি বটবৃক্ষের তলায় স্থান নির্বাচন করে বসে পড়ল। গন্তব্যে পৌঁছনোর যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাতেই অকম্পনের অনেকটা স্বাচ্ছন্দ বোধ হল। তার ক্লান্ত শরীর বোধহয় এইটুকুরই প্রতীক্ষায় ছিল। হেমন্তের শীতল বাতাস অল্পক্ষণেই তার চক্ষে এনে দিল এক অনভিপ্রেত তন্দ্রার আবেশ।

যখন নিদ্রাভঙ্গ হল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। রাত্রির প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত। ইত্যবসরে তাকে কেউ জাগায়নি। রবিস্তোত্রও নয়। কিন্তু তখনও তার কোনও সন্দেহ হয়নি। অতি সত্বর সে মহাধিপের নিকট গিয়ে তার যাত্রার ছাড়পত্র প্রার্থনা করলো। মহাধিপ বললেন, কোনও শাসকীয় প্রমাণ আছে যে সে গুপ্তচর নয়?

অকম্পন অনুমান করল, মহারানি প্রদত্ত অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়টি প্রদর্শনের এই প্রকৃষ্ট সময়। ত্বরিতে নিজের কনিষ্ঠা থেকে সেই অঙ্গুরী খুলে নিতে গিয়েই সভয়ে আবিষ্কার করল সে যে তার সর্বনাশের আর অবশিষ্ট কিছু নেই। কনিষ্ঠা থেকে অন্তর্হিত হয়েছে তার শেষ সম্বল সেই রাজকীয় অভিজ্ঞান! সন্দিহান মহাধিপের দৃষ্টির সম্মুখে কাতরভাবে সে জানাল তার দুর্ভাগ্যের কথা। মহাধীপ কি বুঝলেন তিনিই জানেন। নিরাসক্তভাবে অকম্পনকে আবার প্রতীক্ষা করার নির্দেশ দিলেন।

উদ্ভ্রান্ত অকম্পন তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করেও রবিকে আর কোথাও দেখতে পেল না। নিজের সামগ্রী সে যেখানে রেখেছিল সেখানে ফিরে গিয়ে দেখে তার সে পোট্টলিরও আর কোনও চিহ্ন নেই। আক্ষরিক অর্থে সে এখন সর্বস্বান্ত!

রাজকার্যে অনভিজ্ঞ অকম্পন ভাবতে বসল কোথায় তার ভুল হল, কোথায় গেল সেই মহার্ঘ অভিজ্ঞান? এটুকু বুঝতে তখন আর বাকি নেই, যে গুপ্তচরের কথা রবি বলেছিল, তা আর কেউ নয়, স্বয়ং রবি। বড় সহজে সে বিশ্বাস করেছিল রবিকে, এছাড়া আর কোনও ত্রুটি তো তার হয়নি। কিন্তু সেই ভুলের মূল্য এখন জীবন দিয়েও অকম্পন পূরণ করতে পারবে না। মহারানি ধ্রুবাদেবীর কাতর চক্ষুদ্বয় তার মনে পড়ল, ভ্রাতৃসম্বন্ধে তিনি ভরসাস্থাপন করেছিলেন হতভাগ্য অকম্পনের উপর। সে বিশ্বাসের মর্যাদা সে রাখতে পারেনি। তার ওপর এখন যোগ হল চৌর্যাপরাধের কলঙ্ক! অকম্পন অবসাদে একেবারে ভেঙে পড়ল।

কিন্তু তখনও সে বুঝতে পারেনি, দুর্ভাগ্যের অবশিষ্ট কলাটি তখনও সম্পূর্ণ হতে বাকি ছিল। অবসন্ন মস্তিষ্ক একাগ্র করে কোনওমতে অকম্পন যখন ভাবতে চেষ্টা করছে এর পর কী করা যায়, কয়েকজন সামরিক রাজ-কর্মচারী এসে তাকে জানাল, সন্দেহজনক কার্যকলাপের ফলে তাকে বন্দি করা হচ্ছে। মহারাজ রামগুপ্তের কাছে বার্তা প্রেরিত হয়েছে, তাঁর আদেশের জন্য অকম্পনকে কারাগারে প্রতীক্ষা করতে হবে।

রবি তার কাজে কোনও ত্রুটি রাখেনি।

॥ ১২ ॥

এক অবসন্ন আচ্ছন্নতায় গ্রস্ত ছিল অকম্পন, সামান্য কোনও শব্দে সে আচ্ছন্নতা কেটে গেল। ধীরে ধীরে চেতনায় ফিরে বুঝল, সে কারাগারে। তারপর সব মনে পড়ে গেল। রাজনৈতিক অপরাধে বিচারাধীন বন্দি সে, ভাগ্যে কী আছে কে জানে।

সারাদিন আজ পথ চলেছে অকম্পন, এত দীর্ঘপথ চলার অভ্যাস তার ছিল না। কারাকক্ষের এক স্তম্ভে হেলান দিয়ে তার দু'চক্ষু বুজে এলো। সুষুপ্তির উপকরণে কোনও অভাব ছিল না। পথশ্রমের ক্লান্তি তো ছিলই, তদুপরি ছিল অকৃতকার্যতার গ্লানিবোধে মানসিক অবসাদ। নিদ্রাকর্ষণে দু'চোখের পাতা ভারী হয়ে ছিল। কিন্তু অজানা এক আশঙ্কা অবসন্ন মনের আধিপত্য গ্রহণ করল, অকম্পনের নিদ্রা এল না।

অনেক বড় মুখ করে গুরু তাকে সর্বাপেক্ষা সমর্থ বলে নির্বাচিত করেছিলেন। মহারানি অগাধ বিশ্বাসে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়ে ভ্রমিত আশায় এখনও কাল গুনছেন। কিন্তু সব ব্যর্থ। তার অনভিজ্ঞতায় সব নষ্ট হয়েছে। শুধু অনভিজ্ঞতাই নয়, এ নির্বুদ্ধিতা। মনে পড়ল বিদায় নেওয়ার আগে মহারানির বলা কথাগুলি। হঠাৎই যেন কিছু মনে পড়েছে এইভাবে তিনি বলেছিলেন, কুমারকে বোলো যে অন্তরঙ্গ নয়, বহিরঙ্গেই সব। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে চিঠিটা তাঁকে দিয়ে এই কথাটাই বোলো কিন্তু। বাইরের বস্তুকে তিনি যেন অবহেলা না করেন।

কথাটা অকম্পনের একটু যেন অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল। সেই সময়ে সে কথার অর্থও সঠিক ধরতে পারেনি অকম্পন। ভেবেছিল বহিরাগত অকম্পনের পরিচয়ে গৌরব অর্পণ করতেই একথা বলেছেন সম্রাজ্ঞী। এখন তার মনে হল, বস্তুই বটে, সত্যই অকর্মণ্য পৌরুষহীন নিতান্তই এক জড়বস্তু সে।

অকস্মাৎ কারাদ্বার খুলে যাওয়ার ধাতব ঝঞ্ঝনায় চমকিত হয়ে অকম্পনের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। বাইরের হালকা আলোয় বুঝতে পারল, রাত্রি অবসানে উষার অগমন আসন্ন। দু'টি ছায়ামূর্তি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে অকম্পনের লৌহশিকল খুলে দিল। একজন ইশারায় অকম্পনকে তাদের সঙ্গে আসতে নির্দেশ দিল। কোথায় যেতে হবে জিজ্ঞেস করায় তারা জানাল, জয়স্কন্ধাবারে কুমারের সমক্ষে তাকে উপস্থিত করার আদেশ হয়েছে।

আবার রহস্য, কে এই আদেশ দিল? সে কি কুমার চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং? কেন তিনি তাকে স্মরণ করেছেন? আর কিভাবেই বা তিনি জানলেন যে, অকম্পন এই কারাগারে আছে? তবে কি সামরিক বিচারসকল কুমারই করে থাকেন? কিংবা হয়তো রাজধানীর পথ দূর বলেই তাকে নিকটস্থ কুমারের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সে যাই হোক, কুমার চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভবনায় অকম্পন আশান্বিত হয়ে উঠল। মহারানি তাকে কুমারের কাছেই পাঠিয়েছিলেন। সে বার্তা আর তার কাছে নেই, কিন্তু মৌখিক বিবৃতিতে যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করবে অকম্পন। কুমার তাকে বিশ্বাস হয়তো করবেন না। হয়তো প্রণিধি সন্দেহে দণ্ডবিধান করবেন। কিন্তু কেন কে জানে, মহারাজ রামগুপ্তের বিচার অপেক্ষা কুমার চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষাৎকার তার বেশি নিরাপদ মনে হল। মহারানির মুখে শুনে সে যা বুঝেছে তাতে মনে হয় কুমার বিচক্ষণ এবং সংবেদনশীল। আশা হয়, সব কথা খুলে বলার অনুমতি সে পাবে। আর সব শুনে কুমার নিশ্চয় তাকে ক্ষমা করবেন।

কিন্তু অবিলম্বে কুমার চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে অকম্পনের সাক্ষাৎ হল না। জয়স্কন্ধাবারের দুর্গাভ্যন্তরে এসে অকম্পন আশ্চর্যান্বিত হয়ে লক্ষ করল, তাকে আর যেন রাজবন্দি বলে মনে করা হচ্ছে না। তাকে শৃঙ্খলিত করে নিয়ে আসা হয়নি, রক্ষীরা শুধু পথনির্দেশ করতেই তার সঙ্গে চলেছে। যুদ্ধাবাসে উপস্থিত হলে কুমার চন্দ্রগুপ্তের নিজস্ব যুদ্ধসচিব স্বয়ং এসে তাকে অতিথিভবনে নিয়ে গেলেন। মনে মনে অকম্পন ন্যূনপক্ষে কিছুকাল কারাবাসের জন্যে প্রস্তুত ছিল, পরিবর্তে রাজ-আতিথ্য তো আশাতীত। সচিব জানালেন, কুমার চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে শীঘ্র সাক্ষাৎ সম্ভব নয়, আপাতত এক অতিগোপনীয় রাজকার্যে তিনি বিশেষ ব্যস্ত। রাজকার্য সমাধা করেই অবশ্য তিনি অকম্পনের সঙ্গে আলাপ করতে আগ্রহী।

অকম্পন অবাক হল এই শুনে যে, কুমার তার সঙ্গে আলাপে আগ্রহী, তার বিচার করতে নয়।

—আমি কি তাহলে আর বন্দি নই? সে জিজ্ঞেস করে।

—আজ্ঞে না। কুমারের আদেশ অনুসারে আপনি এখন মুক্ত।

অকম্পন হতবুদ্ধি হয়ে চেয়ে রইল। কুমার চন্দ্রগুপ্ত তাকে জানলেন কখন, কখন তার বিচার করলেন এবং কখনই বা তাকে মুক্তি দিলেন কিছুই বোধগম্য হল না। সচিব আবারও বললেন, কুমার আপনার সব কথাই জানেন। আপনি মুক্ত বটে, তবে তাঁর সঙ্গে দেখা না করে কিন্তু আপনার ফিরে যাওয়া হবে না।

—কীভাবে আমি তাঁর পরিচিত হবার সৌভাগ্যলাভ করলাম, তা তো ঠিক বুঝতে পারলাম না।

এর উত্তরে সচিব অল্প হেসে বললেন, আপনার আগমনের কথা কুমার যথাসময়েই পেয়েছিলেন। কিন্তু আপাতত এর চেয়ে বিশদে আর কিছু বলতে পারব না। কুমারের সাক্ষাৎ পেলে তাঁর কাছেই সব জানতে পারবেন।

অকম্পনের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে চায় না। উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞেস করল, আপনাদের কোনও ভুল হচ্ছে না তো? আমার সঠিক পরিচয় কি আপনি জানেন?

সচিব এবার অকম্পনকে একবার অপাঙ্গে দেখে স্মিতস্বরে বললেন, আমাদের কোনও ভুল হয়নি। আপনি আর্য অকম্পনদেব, উজ্জয়িনীতে বৈদ্যরাজের আশ্রমের প্রশিক্ষু চিকিৎসক। কী তাই তো? কিন্তু এখন আপনি ক্লান্ত। আসুন, আপনার বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়েছে।

অকম্পন তবুও বলবার চেষ্টা করল, দেখুন কুমারের নিমিত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা...

—আপনার সে বার্তাও কুমার পেয়েছেন। আসুন।

দেখা গেল সচিবটি অল্প কথার মানুষ। আর কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়েই তিনি অতিথিভবনের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। পুঞ্জীভূত বিস্ময় বুকে চেপে অকম্পন তাঁর অনুবর্তী হল।

অতিথির রাজকীয় সৎকারে কোনও ত্রুটি হল না। অকম্পন তার নির্দিষ্ট কক্ষটিতে এসে গবাক্ষে দাঁড়িয়ে চিন্তামগ্ন হল। জলাধারের মধ্যে উৎপন্ন জলোচ্ছ্বাস স্তিমিত হয়ে এলেও তার অভিঘাত ছোট ছোট তরঙ্গরূপে অনেকক্ষণ অবধি তীরে গিয়ে লাগতে থাকে। গতরাত্রের বিপর্যয়ের রেশ তখনও অকম্পনের মনে বিলুপ্ত হয়নি। কিন্তু কালকের ঘটনাবলীর সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির যোগসূত্রটি কিছুতেই আয়ত্ত হচ্ছিল না।

স্নানাদি ও মধ্যাহ্নভোজন সমাধা করে দ্বিপ্রহরের শেষে অকম্পন যখন দুগ্ধফেননিভ শয্যায় পুনরায় কিঞ্চিৎ বিশ্রামের উদ্যোগ করছে, এমন সময়ে দ্বারে কারওর করাঘাত শোনা গেল।

আগন্তুক অকম্পনের অপরিচিত, কিন্তু তার মুখমণ্ডলে এক অমায়িক হাসি। যেন অতিপরিচিত পরমাত্মীয়কে সম্ভাষণ করছে, এইরকম মধুক্ষরিত স্বরে আগন্তুক বলল, সমরাঙ্গন আপনার শুভাগমনে ধন্য হল। অধমের প্রণাম স্বীকার করুন আর্য অকম্পনদেব।

লোকটির দৈর্ঘ্য অনুপাতে প্রস্থ কিছু বেশী। রাজকর্মচারী নিশ্চয়ই, কটিতে চর্মনির্মিত কোমরবন্ধে ময়ানবদ্ধ একটি ক্ষুদ্র ছুরিকা। পায়ে চর্মপাদুকা। নিম্নাঙ্গের পরিচ্ছদ সাধারণ সৈনিকের মতো হলেও উর্ধ্বাঙ্গ আবৃত করে ঘোর কৃষ্ণবর্ণের এক বিসদৃশ পরিধান দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মাথায় রুক্ষ কেশরাশি বাঁধা একখণ্ড রক্তবর্ণের বস্ত্রে। আগন্তুকের বহিরাবরণে সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্টটি হল তার একটা চোখ। কোনও

ক্ষুরধার অস্ত্রাঘাতে তার দক্ষিণ চক্ষুটি বিনষ্ট। একটা পুরাতন কিন্তু গভীর ক্ষতচিহ্ন কপাল থেকে দক্ষিণ গণ্ড পর্যন্ত চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। অতীত আক্রমণের সাক্ষীস্বরূপ একক দৃষ্টিতে বামচক্ষুটি জ্বলজ্বল করছে।

নিরালা দ্বিপ্রহরে এই মূর্তির দর্শন মোটেই প্রসন্নতা উদ্রেক করে না। তবুও যথাসাধ্য শিষ্টস্বরে অকম্পন প্রশ্ন করল, আপনার পরিচয়?

—অধমের পিতৃদত্ত নাম চঞ্চরীক। এই দুর্গেরই এক নগণ্য রক্ষী মাত্র। কিন্তু আজ ভদ্রকে সাহচর্য দেবার আদেশ পেয়ে ধন্য হয়েছি।

নামের সঙ্গে লোকটির আকৃতি সুসমঞ্জস নয়। অবশ্য চঞ্চরীক যে খুব সুদর্শন প্রাণী তা নয়, কিন্তু তার মধুকরবৃত্তির মধ্যে একটি মাধুর্য আছে। এই লোকটির আকারে কোনওরকম মনোহারী গুণ কল্পনা করা বেশ দুষ্কর। চঞ্চরীকের সাহচর্যের প্রস্তাব অকম্পনের খুব রুচিকর না লাগলেও কিছু কৌতূহল নিরসন করতে দুর্গেরই একজন কর্মচারীকে পেয়ে খুব অনাগ্রহও বোধ হল না। অকম্পন প্রশ্ন করল, তুমি কি আমাকে এই দুর্গের অভ্যন্তরে কী আছে দেখাবে?

—অবশ্যই আর্য। আপনাকে দুর্গাভ্যন্তরের পরিচয় করিয়ে দিতেই আমাকে পাঠানো হয়েছে। যদি আপনার বিশ্রাম সমাধা হয়ে থাকে, তাহলে চলুন এখনই আমরা বেরোতে পারি।

দিবাবসানের কালে হেমন্তের রোদে তেজ কমে আসে, অবশিষ্ট মৃদু আতপটুকু বড় মনোরম। অকম্পন উত্তরীয়খানা জড়িয়ে নিয়ে চঞ্চরীকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

চঞ্চরীকের সাহচর্যে একটু সহজ হয়ে নিতে অতিথিশালার অঙ্গন পেরিয়ে এসে অকম্পন বলল, চঞ্চরীক, তোমার নাম বড় সুন্দর। কিন্তু সম্বোধনের পক্ষে খুব সহজ নয়।

এ কথায় সলজ্জ হাসিতে চঞ্চরীক বলে, বুঝেছি, আর্য আমার আকৃতি দেখে ভ্রমিত হয়েছেন। দেখতে যেমনই হোক, আমিও কিন্তু কিছু আহরণ করি। হয়তো তা মধুর চেয়ে নিকৃষ্ট। সবাই কি মধু আহরণ করতে পারে?

অকম্পন মনের কথা পাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাই শশব্যস্ত হয়ে বলে, না না আমি তা বলিনি। বহিরঙ্গ তো ঈশ্বরদত্ত, তাতে মানুষের হাত নেই। আমি শুধু বলতে চাইছিলাম, তোমার নামটি নিত্য ব্যবহারের পক্ষে কিঞ্চিৎ গুরুভার।

—অধমের আরও একটি নাম আছে আর্য। বন্ধুরা স্নেহবশে আমাকে পঞ্চকর্ণ বলে থাকে। আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে পঞ্চকর্ণ অথবা আরও সংক্ষেপে পঞ্চক নামেই স্মরণ করতে পারেন।

পঞ্চকর্ণ হাসতে হাসতে এগিয়ে চলে। তার এই নামটি অকম্পনের অন্তরচেতনায় একটা ছোট্ট তরঙ্গ তোলে। কোথায় যেন শুনেছে সে এই নাম। তখনই মনে পড়ে না।

কালান দুর্গটি কোনও একখণ্ড পরিসর নয়। একটি অনুচ্চ টিলার চূড়াখণ্ডটি ব্যবহার করে এর অভিনব নির্মিতি। পাথরের অনেকগুলি গুহা ও কন্দরে রচিত হয়েছে এর অনেকগুলি ভবন, সৈন্যাবাস, কার্যালয় ইত্যাদি। এছাড়া পর্বতের বিভিন্ন তলে প্রস্তরগাত্রের ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে দারুনির্মিত প্রাসাদগুলি, যেখানে প্রধান সভাকক্ষ ও বসতাবাস। টিলার পিছন দিকে অনেকটা সমতল প্রাঙ্গণ। এই সমস্ত ঘিরে রয়েছে একটা ঢেউখেলানো প্রাচীর, সমগ্র দুর্গের সুরক্ষার জন্য। তাতে আছে বেশ কয়েকটা দ্বার। হস্তিনখশীর্ষ অমরকোষগুলি এখন প্রহরীশূন্য। বিজিত দুর্গে কঠোর প্রহরার আর প্রয়োজন নেই।

দুর্গাভ্যন্তরের বিভিন্ন ভবন ও পথ পার হয়ে প্রাচীরের পূর্বদ্বার দিয়ে বেরিয়ে এসে ঢালু পথে তারা দুইজন নেমে এল। পঞ্চক দেখতে যেমনই হোক, মনে হয় কাজে সুদক্ষ এবং অতিশয় বাকপটু। তাকে দেখলে মনে হয় না সে নগণ্য এক দ্বাররক্ষক। এই কালানের দুর্গে সে বহু প্রাচীন। পথ দেখিয়ে অকম্পনকে নিয়ে চলল সে, সঙ্গে অনর্গল বলে চলল দুর্গের ইতিহাস। খুঁটিনাটি বর্ণনায়, বচনের পারিপাট্যে সে যেন এক অন্য মানুষ। পথ চলতে চলতে নগরবধূ কলাবতীর আমবাগান, সেনানায়ক উগ্রদেব ও কলাবতীর প্রণয়ক্ষেত্রের ভগ্নাবশেষ, মহারাজ ঘটোৎকচগুপ্তের সমাধিক্ষেত্র, পুরাতন বধ্যভূমি ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গা দেখাতে দেখাতে পঞ্চকর্ণ অকম্পনকে নিয়ে এসে পড়ল এক সমতলে।

পিছন ফিরে অকম্পন দেখে তারা দুর্গ থেকে অনেকটা দূরে এসে গেছে। সূর্য তখনও সম্পূর্ণ অস্ত যায়নি কিন্তু দুর্গের পিছন দিকে চলে গেছে। আলোর প্রেক্ষাপটে দুর্গের অভ্যন্তরীণ নকশা আলাদা করে আর বোঝার উপায় নেই। মনে হয় যেন মস্ত এক কৃষ্ণদানব পর্বতচূড়া আঁকড়ে শুয়ে আছে আর তার চারদিকে আলোর ছটা ছড়িয়ে আছে। দুর্গের ছায়ায় এই পথে রৌদ্র নেই। পাথুরে রুক্ষতার মাঝে অনেক গাছপালার মধ্য দিয়ে এরপরে চড়াইয়ের পথ।

অভিভূতস্বরে অকম্পন বলে, এত তুমি কোথা থেকে জানলে পঞ্চক? কার কাছে এত পুরনো কথা শুনলে?

—অধম মূর্খ সেবক, কিন্তু চোখ-কান খোলা রাখি, তাতেই আমার যা শিক্ষা। লোকে আমাকে পঞ্চকর্ণ বলে, তা নিতান্ত অকারণ নয় দেব।

—আচ্ছা পঞ্চক, একশো বছর আগে সেই ডাকাতদলের কথা তুমি জানো? শুনেছি তারা দুর্গ লুঠ করে অনেক ধনরত্ন নিয়ে পালিয়েছিল?

—পালাতে পারেনি আর্য, তৎকালীন মহারাজ তাদের সলিলসমাধি দিয়েছিলেন। শিরি নদীতে, তখন নদী অনেক নিকটে ছিল। তবে হ্যাঁ, লুণ্ঠিত ধনরত্নের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। সে এক রহস্য বটে, আজও তার কিছু জানা যায়নি। আসুন, আপনাকে সেই জায়গাও দেখিয়ে দিই।

অতীতের সেই নারকীয় ঘটনা অকম্পনের আদৌ রুচিকর নয়, কিন্তু এতো নিকটে এসে সে ঐতিহাসিক স্থান প্রত্যক্ষ করার অমোঘ আকর্ষণও অস্বীকার করতে পারে না। ওদিকে পঞ্চকের মুখে এক রহস্যময় হাসি। অকম্পনের মনে দ্বিধা, এ কি শুধুই এক বেতনভুক দ্বারপাল? বন্ধুর চড়াইয়ের পথে পদক্ষেপ করে অকম্পন বলল, পঞ্চক, তুমি তো দ্বারপাল। তবে যে বললে তুমিও আহরণ কর? তুমি কি বস্তু আহরণ কর?

উত্তর দিতে মুখ খুলেও পঞ্চক সহসা থেমে গেল। শরীরটা সামনে একটু ঝুঁকিয়ে সে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে সম্মুখের একটা গুল্মের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। অকম্পন কী হল না বুঝে অগ্রসর হতেই হাতের ইশারায় তাকে নিরস্ত করে পঞ্চকর্ণ। নিকটস্থ কয়েকটি পাখি যেন অস্থিরভাবে ডাকাডাকি করছে। অধরোষ্ঠে তর্জনী স্পর্শ করে অকম্পনকে কোনও শব্দ না করার ইঙ্গিত করে পঞ্চক সন্তর্পণে এক-পা এক-পা করে গুল্মটার দিকে এগিয়ে চলল।

বেশী সময় লাগল না, শ্লথপিচ্ছিল গতিতে একটা বিশাল সরীসৃপ গুল্ম থেকে বেরিয়ে এসে ফণাবিস্তার করে স্থির হয়ে গেল। একটা বিষধর গোক্ষুর সর্প! মাথাটা অল্প-অল্প সামনে পিছনে দুলছে আর প্রবল আক্রোশে থেকে থেকেই দ্বিখণ্ডিত জিহ্বা প্রকট করে হিস হিস শব্দ করছে।

অকম্পন শঙ্কায় আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পঞ্চকর্ণের আচরণে ভয়ের লেশ দেখা গেল না। অথচ সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতের থেকে তার দূরত্ব পাঁচ হাতের বেশি হবে না। ধীর পায়ে সে সরীসৃপটার একপাশে সরে যেতে লাগল। নাগালের মধ্যে শিকারকে পেতেই অহিরাজ তীব্রগতিতে ছোবল দিল। আর অবাক কাণ্ড, তার চেয়েও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পঞ্চকর্ণ হাত প্রসারিত করে অসাধারণ কুশলতায় সরাসরি সেই উদ্যত ফণাটাকে ধরে ফেলল। অকম্পন শিহরিত হয়ে দেখল, সাপের মাথাটা পঞ্চকর্ণের মুষ্টিবদ্ধ। যেটুকু বেরিয়ে আছে তাতে দংশন করা সম্ভব নয়, প্রবল জিঘাংসায় নাগরাজ তাই লেজ দিয়ে তার বাহুটাকে পেঁচিয়ে ধরেছে।

পঞ্চকর্ণ কোমরবন্ধস্থিত একটা বস্তিকোষের মধ্যে সাপটাকে বন্দী করল। থলের মুখটা ভাল করে বেঁধে সে সহাস্যে অকম্পনের দিকে চাইল। যেন বিশেষ কিছুই হয়নি, কিন্তু তার অমসৃণ ললাটে ফুটে ওঠা স্বেদবিন্দু জানিয়ে দিচ্ছিল, এই কাজে তাকে কতোটা মানসিক শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছে। পুনরায় পথ চলতে ইশারা করে বলল, আশ্চর্য হচ্ছেন ভদ্র? আমি এক সামান্য দ্বারপাল, কিন্তু এই আমার আসল পেশা। বংশের পরম্পরায় এই বিদ্যা আমি রপ্ত করেছি।

অকম্পন আতঙ্কে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, নীরবে জড়পুত্তলির মতো পঞ্চকর্ণকে অনুসরণ করে চলল। বিষাক্ত সরীসৃপটা তার কোমরেই সংলগ্ন আছে, কিন্তু নিশ্চিন্তে পথ চলতে চলতেই পঞ্চকর্ণ বলল, আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন না, আমি কী আহরণ করি। আমি গরল আহরণ করি। সাপের বিষদাঁত থেকে বিষ নিষ্কাশন করার বিদ্যা আমার অধিগত।

হা হা হা—বেশ মজার কথা, তাই না? চঞ্চরীক নাম আমার। কিন্তু ফুলের মধু নয়, সাপের বিষ আহরণ করাই আমার পেশা। হা হা হা—

পঞ্চকর্ণের রসিকতায় আমোদ নয়, কী যেন এক অশুভ ব্যঞ্জনা। তার সঙ্গে হাসিতে যোগ দিতে পারল না অকম্পন। নীরবে অনুসরণ করে চলল। আরও খানিক চলার পরে তারা টিলার চূড়ার নিকট এসে উপস্থিত হল। সেখান থেকে টিলার অপরদিকে শিরিনদীর উপত্যকা গভীরে নেমে গেছে। কিছুদূরে নদীও দেখা যাচ্ছে, আসন্ন সন্ধ্যার কুহেলি তার তটরেখাকে ক্রমশ ধূমিল করে তুলেছে। তারা যেখানে দাঁড়িয়েছিল তা সংশ্লিষ্ট জমির চেয়ে হাত খানেক অবদমিত, দশ হাত পরিমাণ বর্গাকৃতি এক ভূখণ্ড। চারদিকে একটি নির্মিতির ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে, মনে হয় প্রাচীনকালে এটা কোনও এক ভবনকক্ষ ছিল। এখন তার দেওয়াল ধ্বসে গেছে।

—আমরা এখন যেখানে আছি, মহারাজ শ্রীগুপ্তের কালে এখানেই ছিল বধ্যভূমি। শিরি নদী তখন দুর্গের তলা দিয়ে বইত। এখন খাত পরিবর্তিত হয়ে খানিক দূরে চলে গেছে। ঐ দেখা যায় সেই নদী, পঞ্চকর্ণ নদীর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলল, ভাল করে দেখুন আর্য, কিছু দেখতে পান কি?

অকম্পন করতল ভ্রূদ্বয়ের উপর স্থাপন করে লক্ষ্যস্থির করতে চেষ্টা করল, কিন্তু বিশেষ কিছুই ঠাহর হল না। তখন পঞ্চকর্ণ বলল, একটু অপেক্ষা করুন, এখনি দেখতে পাবেন।

এই বলে সে ঐ বর্গাকার ক্ষেত্রের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। একটা অর্ধভগ্ন দেওয়ালের পিছনে গিয়ে সেখান থেকেই বলল, আর্য অকম্পনদেব, সলিলসমাধির সরল পথটা স্পষ্টভাবেই দেখে নিন। আপনাকে যে পথে প্রেরণ করছি, শতবর্ষ আগে সেই পথেই একদল ডাকাত তাদের অন্তিমযাত্রা করেছিল।

পঞ্চকর্ণের বাক্য সম্যক উপলব্ধি করার সময় আর পেল না অকম্পন। কথা শেষ করার আগেই 'কড়াৎ' করে এক বিকট শব্দে তার পায়ের তলার ভূমি সরে গেল। একমুহূর্তের জন্য পঞ্চকর্ণের ক্রূর হাস্যের আভাস পেল অকম্পন, তারপরেই শিরোপরি একটা আলোকিত চতুষ্কোণ একবারের জন্য দৃশ্যমান হয়েই অতল অন্ধকারের গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

॥ ১৩ ॥

একটা জান্তব চীৎকার করে উপনায়ক দত্তসেন আচম্বিতে নিদ্রোত্থিত হলেন। ভয়াবহ স্বপ্নদৃশ্য বাতাসে মিলিয়ে গেল। কি ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন!

এই চলছে। গত কয়েক রাত্রি দত্তসেনের অতিবাহিত হয়েছে প্রায় বিনিদ্রায়। ক্লান্তি ও অবসন্নতায় নিদ্রা এসেছে। তখনই কোনও না কোন দুঃস্বপ্ন! মৃত মানুষেরা এসে হানা দিয়েছে দত্তসেনের অবচেতনার স্তরে, কখনও মহামাত্য বিশঙ্কদেব, কখনও রাবেলা হূণ, আর প্রতিবারই সবশেষে এসেছে নীলাঞ্জনা! কালরূপী প্রেতিনীবেশে।

মানুষের মৃত্যুতে বিচলিত হন না উপসেনাপতি। বহু মানুষ হত্যা করেছেন তিনি। ধর্মে ও অধর্মে। কখনো এমন হয়নি, কোনও অনুশোচনা বা পশ্চাত্তাপে কখনও তাঁর অন্তঃকরণে অনাবশ্যক পীড়া অনুভব করেননি। কিন্তু নীলাঞ্জনা!

মুশকিল হয়েছে নীলাঞ্জনাকে নিয়ে। রাজাদেশ পালন করবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে প্রয়োজনীয় মনঃসংযোগ আর কিছুতেই সংগ্রহ করতে পারছেন না উপনায়ক দত্তসেন। শয়নে স্বপনে এক জোড়া ধূসর মৃত চোখের দৃষ্টি তাঁকে অনবরত শাসাচ্ছে, এসো, এসো, আরও কাছে এসো, আমি যে তোমার অপেক্ষায়...

নীলাঞ্জনার সঙ্গ অপ্রিয় ছিল না তাঁর। তার অঙ্গটিও ছিল বড়ই লোভ্য। মধুভাণ্ডের পাশে মধুকরের মতো দত্তসেন নীলাঞ্জনাকে ঘিরেই গুঞ্জরণে মত্ত ছিলেন। কিন্তু সেই নীলাঞ্জনা কিনা তাঁর বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করে! আর নিজের থেকে প্রিয় তো আর কেউ হয় না। তাই নীলাঞ্জনাকে স্তব্ধ হতে হল।

নীলাঞ্জনার মৃত্যুতে অনুশোচনাও হয়েছে দত্তসেনের। কিন্তু বরতনু গণিকার অভাব হবে না। দত্তসেনের কাছে নীলাঞ্জনার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সে তার কাজ মৃত্যুর পূর্বেই সমাধা করে গেছে। তার প্রেরিত বার্তানুসারে পঞ্চকর্ণ নিজেই দত্তসেনের নিকট এসে যোগাযোগ করেছে। কাজের লোক। তার কাছে তিনি পেয়ে গেছেন যা চাইছিলেন। এখন শুধু অস্ত্রপ্রয়োগের সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও নির্বাহটুকু বাকি।

অস্ত্র প্রস্তুত, শিকারও নিকটেই। এখন শিকারির প্রয়োজন শুধু একটা সুযোগের। সেই সুযোগটাই কীভাবে নির্মাণ করা যায়, আপাতত তাই দত্তসেনের চিন্তা। এদিকে মহারাজ সত্বর আসছেন। তাঁর আদেশ, তিনি আসার আগেই কাজ হওয়া চাই। গোলযোগ বাধাবে সেনানায়ক। পদাধিকারে সে দত্তসেনের অভ্যধিক। এই লোকটার সহায়তা পেলে সহজেই কার্যোদ্ধার হত। কিন্তু লোকটা আবার নিষ্কপট প্রভুভক্ত। তাই তাকে না সরালে ঘটনার পরবর্তী গতি নিয়ন্ত্রণ করা শক্ত। মহারাজ উপস্থিত থাকলে দত্তসেনের কোনও সমস্যা ছিল না। দত্তসেন সর্বদা সুযোগ সন্ধান করে ফিরছে।

সন্ধ্যার পরে এসে পঞ্চকর্ণ জানিয়ে গেছে, রাজধানী থেকে আগত গুপ্তচরটাকেও সে শেষ করেছে। সে অবশ্য কোনও বড় সমস্যা ছিল না, নিতান্ত সামান্য এক চর। রাজধানী থেকে কোনও বার্তা বহন করে কালানে এসে পৌঁছেছে, এইরকম সংবাদই পেয়েছিলেন দত্তসেন। কিন্তু লোকটা কুমার চন্দ্রগুপ্তের আশ্রয়ে ছিল। দুর্গাভ্যন্তরে সহসা তার মৃত্যু হলে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারত। দত্তসেন যাচাই করে নিতে প্রশ্ন করলেন, তার দেহ লোকচক্ষে আসার আশঙ্কা নেই তো?

—সে পথ রাখিনি দেব। পরিত্যক্ত বধ্যভূমির পারে পুরাকালে যে জলসমাধির ব্যবস্থা ছিল, তাকে সেই পথেই প্রেরণ করেছি।

—সে কী? সেই বধ্যমঞ্চ কি এখনও কাজ করে?

—যন্ত্র এখনও কার্যক্ষম। আমি ছাড়া তার ব্যবহার আর কেউ জানে না। আমার পূর্বজরাই এই যন্ত্র চালাত। আমি সেই বিদ্যা বংশপরম্পরায় পেয়েছি।

—তাই নাকি? কিন্তু শিরি নদী তো এখন দূরে সরে গেছে। ঐ পাতাল সুড়ঙ্গ কি এখনও কার্যকর আছে?

—তা না থাকলেও ঐ অন্ধকূপ থেকে বেরোবার কোনও পথ নেই। সলিলসমাধি না হলেও মৃত্যু আসতে বিলম্ব হবে না, দেহটা পচে গলে বিনষ্ট হবে।

পঞ্চকর্ণের কথায় আশ্বস্ত হলেন দত্তসেন, একটা উটকো ঝঞ্ঝাট থেকে সহজেই নিষ্কৃতি পাওয়া গেছে। অতিথির অন্তর্ধান হয়তো জানাজানি হবে কিন্তু ততদিনে সে নিয়ে তেমন কোলাহল হবে না বলেই মনে হয়। হলেও তা সহজেই রোধ করা যাবে। দত্তসেন গুম্ফে হাত বুলিয়ে ভাবলেন, পঞ্চকর্ণ কাজের লোক, তার দ্বারা যে কার্য সম্পাদন করার ছিল তা হয়ে গেছে। এক হিসেবে তারও প্রয়োজন ফুরিয়েছে!

রাত্রির বোধহয় অন্তিম প্রহর। স্বাভাবিক হতে বেশ কিছু সময় লাগল উপসেনাপতির। তিনি ভীরু স্নায়ুরোগী নন। কিন্তু গত কয়েক রাত্রির বিনিদ্র উদ্বেগ তাঁর স্নায়ুতন্ত্রকে দুর্বল করেছে। শয়নে স্বপনে বিভীষিকা দেখছেন। তিনি উঠে শিরস্থিত অমৃতকুণ্ডিকা থেকে জলপান করলেন। সিক্ত হাতে চক্ষু ও মুখমার্জনা করে আবার শয্যায় এসে শয়ন করলেন। কিন্তু তখনও স্বস্তি নেই। অন্তর্চেতনায় এক অদ্ভুত অনুভূতিতে বড় বিক্ষিপ্ত লাগছে। মনে হচ্ছে তিনি যেন কারুর প্রতীক্ষা করছেন। কেউ যেন আসবে—না, আসবে নয়, কেউ যেন এসেছে তাঁকে নিয়ে যেতে। কক্ষের দ্বার অবরুদ্ধই ছিল। কিন্তু দত্তসেন স্পষ্ট অনুভব করলেন, দ্বারোপরান্তে এক রমণী তাঁকে আহ্বান করছে তার সঙ্গে যাবার জন্য।

দত্তসেন শয্যায় উঠে বসলেন। 'কে—কে—' বলে কপাটের অপরপ্রান্তে কে আছে জানতে চাইলেন। কোন উত্তর পাওয়া গেল না। কিন্তু অমোঘ সে আহ্বান যেন তাঁর অভ্যন্তর থেকে উদ্গত হতে লাগলো। সে আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারা যায় না! দত্তসেন শয্যাত্যাগ করে দুয়ার খুলে দিলেন। একটা শীতল হাওয়ার পরশ তাঁর শরীরে রোমাঞ্চ জাগালো। দুয়ারে কেউ ছিল না। কিন্তু কোন এক মায়াবিনী যেন স্বপ্নজগৎ থেকে বিলসিত লাস্যে উপসেনাপতিকে আকাঙ্ক্ষিত করে তুলেছে। এই প্রলোভন কি এড়াতে পারবেন তিনি? দুয়ার উন্মুক্ত রেখেই একাকী কক্ষত্যাগ করলেন।

কোথায় যাচ্ছেন জানেন না, কি আছে পথের শেষে তাও জানা নেই।

তখন রাত্রি শেষ হয়নি, পথ নির্জন। তাই কেউ দেখতে পেল না, উন্মত্তের মতো মশাল হাতে রাজপুরুষ ছুটে চলেছেন শিরি নদীর তীরে! কাল-নদী—যার করাল গ্রাসে পতিত হয়ে অনেক জীবন বলিদানের কথা আজ ইতিহাস হয়ে আছে। তবে কি আজ আবার কালা-নৈয়ার তরঙ্গে নেচে উঠেছে রক্তের পিপাসা?

নদীর প্রায় কিনারায় এসে সংবিত ফিরে এলো দত্তসেনের। ফিরে দাঁড়ালেন তিনি। এখনও কানে বাজছে রাক্ষসীর অট্টহাসি আর কামনাকুটিল আহ্বান, এসো এসো এসো...

কিন্তু আর নয়, একটা পা তাঁর জলে ছিল। জল থেকে পা তুলে নিয়ে মন শক্ত করলেন তিনি। একটা কুৎসিত গালাগালি করলেন প্রেতিনীর প্রতি। সে অট্টহাসি বন্ধ হল, কামনার স্রোতে এলো ভাঁটার টান। দত্তসেন সন্তর্পণে ফিরে চললেন তাঁর আবাসের দিকে।

কিন্তু ও কি দেখা যায়? নদীর তটের লাগোয়া যে খাড়াই অধিত্যকা উঠে গেছে তারই এক কন্দর থেকে বেরিয়ে আসছে একটা মূর্তি। মানুষেরই আকৃতি, কিন্তু মানুষ নয়! নিকষ কালো, স্থূল, কদাকার, বিকৃতচলন প্রাণীটা স্খলিত পদক্ষেপে শনৈ শনৈ তাঁর দিকেই যেন এগিয়ে আসছে। প্রেতিনী নীলাঞ্জনা তার উদ্দেশ্যে অকৃতকার্য হয়ে এই পিশাচকে দিয়ে তার কার্যসিদ্ধি করতে চায়!

দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে উপনায়ক বিপরীত দিকে দৌড়তে শুরু করলেন। আর পিছন পানে দেখতে সাহস করলেন না। করলে দেখতে পেতেন সেই পিশাচ ততক্ষণে ভূমিশয্যা নিয়েছে!

দত্তসেন নিরাপদেই তাঁর আবাসে এসে উপস্থিত হতে পেরেছিলেন। সশব্দে দ্বাররুদ্ধ করে অর্ধমৃতের ন্যায় শয্যায় পতিত হলেন। বাইরে উষার আলো ক্রমশ ফুটে উঠছে, রাত্রির বিভীষিকা আর নেই। পত্রবিতানে বাতাসের চলাচল মৃদুস্বরে একটি দুটি করে পাখিদের নিদ্রাভঙ্গ করছে। সে হাওয়ার শব্দে কি ছিল নীলাঞ্জনার দীর্ঘশ্বাস? অচরিতার্থ প্রতিহিংসায় নীলাঞ্জনার অতৃপ্ত আত্মা কি অদম্য রোদনে গুমরে ফিরছে? উপকথার নায়িকা কলাবতী মরণের পরপার থেকে এই কালানের দুর্গপরিসরেই নিজের হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিল সেনানায়ক উগ্রদেবের প্রতি। নীলাঞ্জনার অভিশাপ কি আজ ব্যর্থ হবে?

***

সূর্যাস্তের পর রাজ্যের সীমানুবর্তী গভীর উপত্যকায় তখন সন্ধ্যার আঁধার। জনহীন উপত্যকার মাঝে এক ক্ষীণ জলধারা প্রায় নিঃশব্দেই বয়ে চলেছে, দূরে কোথাও গাছের পাতা থেকে টিপটিপ করে ঝরে পড়ছে জলবিন্দু, সেই শব্দটুকুই শুধু চারপাশের অখণ্ড নিস্তব্ধতার মাঝে একাকী প্রহর গুনছে। এ যেন এক মৃত্যুপুরী, আশেপাশে বসতির কোন চিহ্নমাত্র নেই। তাই শীর্ণ সেই নদীর জনমানবশূন্য উপকূলে একটি যুবকের সংজ্ঞাহীন দেহ কিছুটা বিস্ময়করই বটে। যুবকের দেহ অবশ, একটি পা পাদুকাশূন্য। পরিধানের পরিধেয়ে অঙ্গাবরণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন। শোণিতলিপ্ত অঙ্গ ও মাথায় আঘাতের চিহ্ন সুস্পষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে যেন মৃত্যু-উপত্যকার মাঝে জীবনের এক ক্ষীণ উপস্থিতি। যুবক যে মৃত নয়, কিছুপূর্বেই তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। সারাদিন সংজ্ঞাহীন থাকার পরে দিনান্তে অল্প নড়ে উঠেছিল দেহটি। তারপর দেহ নিশ্চল হয়ে এলেও চক্ষুদুটি সম্পূর্ণ নিমীলিত হয়নি। হতাশাপূর্ণ শূন্যদৃষ্টিতে সে কি চিন্তা করছিল কে জানে, নিশ্চিত মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করছিল কি?

বোধহয় তাই, কেননা অল্প ব্যবধানে যে প্রাণীটি এসে উপস্থিত হয়েছিল, অন্য সময় হলে তার সম্মুখে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা সম্ভব হত না। শ্বেতবর্ণ সরীসৃপটার অপলক অক্ষিপটে ছিল নিশ্চিত মৃত্যুর করাল হাতছানি। শঙ্খচূড়! জনমানবহীন এই স্থানে এক ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর সম্ভাবনা বোধহয় নাগরাজকেও বিস্মিত করে থাকবে। তাই হাতকয়েক দূর থেকে সেও নিশ্চল উদ্যতফনায় প্রায় নিঃশব্দেই যুবককে অবলোকন করছিল। অল্প হিসহিস শব্দ বাতাসের সঙ্গে বয়ে আসছিল আর থেকে থেকেই খণ্ডিত জিহ্বা মুখের বাইরে প্রকাশিত হয়ে জানাচ্ছিল আসন্ন শিকারের প্রতি হিংস্রলোলুপ জিঘাংসা।

প্রচলিত আছে, সর্পের দৃষ্টিতে থাকে সম্মোহনী শক্তি। সে দৃষ্টি থকে চক্ষু সরিয়ে নেওয়া দুষ্কর। কিন্তু সম্মোহন নয়, এ বোধহয় জীবনের সকল আশা নিঃশেষ হওয়ায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া। আত্মরক্ষার প্রয়াস যুবক করেছে। কিন্তু সামান্য প্রচেষ্টাতেই জেনে গেছে, আপন শক্তিতে তার পক্ষে আত্মরক্ষা দূরে থাক, নড়াচড়া করাও আর সম্ভব নয়। সারা শরীর যন্ত্রণায় অবশ হয়ে আছে, তাই অমোঘ মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া ভিন্ন আর কোন পথ নেই। যুবকের চক্ষু নিমীলিত হয়ে এল।

নির্জন উপত্যকার কোলে মুমূর্ষু যুবকটি অকম্পনই বটে। কর্দমাক্ত অঙ্গ শুষ্ক হয়ে তাকে আর চেনার উপায় ছিল না।

না, অকম্পন মরেনি। কেন মরেনি, সে এক রহস্য। বিধাতা জন্মের সময়ে মানুষের আয়ু নির্ধারণ করে দেন নিশ্চই, অন্যথায় অকম্পনের জীবন কীভাবে রক্ষা পায়? কোন আরব্ধকর্ম সম্পন্ন করতে বিধাতা তার পরমায়ু বৃদ্ধি করলেন কে জানে, কিন্তু আরও একবার প্রমাণিত হল, অঘটন আজও ঘটে!

বোধহয় এই কারণেই যে সে সরাসরি উল্লম্বভাবে যেখানে পতিত হয়েছিল তা খুব গভীর ছিল না। সেই ভূমি প্রস্তরময় হলেও তা আচ্ছাদিত ছিল বহুবছরের উদ্গত নিবিড় পয়োধি ও গুল্মে। তারপর সেখান থেকে গড়িয়ে ছোট ছোট পতনে এসে পড়েছে একেবারে নীচে, যা শিরি নদীর অববাহিকার প্রায় সমতলে। আকস্মিক আঘাতে অকম্পনের পঞ্চেন্দ্রিয় তখন অসাড় হয়ে আছে, অপাঙ্গে সে শুধু অনুভব করতে চাইছিল তার নিজের অস্তিত্বের। কতক্ষণ সে অচেতন ছিল জানা নেই। সংজ্ঞা ফিরে আসার পরেও অবচেতনার স্তরগুলি ভেদ করে চেতনায় আসতে তার বেশ সময় লাগল। মনের পটে ফুটে উঠলো পঞ্চকর্ণের একচক্ষু মুখখানা। ক্রূর হেসে সে দুই হাতে আকর্ষণ করছে এই হত্যাযন্ত্রের কীলক। নরাধম জল্লাদটা তাকে হত্যার অভিলাষে নিক্ষেপ করেছে এই পাতালপুরির যমালয়ে। কিন্তু কেন? তার সঙ্গে পঞ্চকর্ণের কিসের বৈরিতা? জানা নেই। গত দুই দিন ধরে অকম্পনের জীবনরথ যে কত অজানা পথে বিচরণ করছে, তার ইয়ত্তা কোথায়?

এই পরিবেশে নিজেকে জীবিত পাওয়ার আশ্বাস অকম্পনকে বিশেষ উজ্জীবিত করতে পারে না। শরীরে তার অজস্র ক্ষত, অন্ধকূপের বিষাক্ত রসায়নের সংস্পর্শে তা ক্রমেই সংক্রমিত হচ্ছে। জ্বরোত্তাপে অবসন্ন চেতনা। সে নিজে চিকিৎসক। শারীরবিদ্যার যেটুকু অভিজ্ঞতা তার ছিল তাতে বুঝতে অসুবিধা হল না যে, পতনে যে জীবন অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়েছে তা খুব দীর্ঘায়িত হবার সম্ভাবনা নেই। এ মৃত্যুপুরী, এখানকার বিষবাষ্পে তার অশক্ত জড়শরীর থেকে অনতিবিলম্বেই প্রাণ বহির্গত হবে।

মৃত্যু যখন দূরে থাকে তখন মানুষ তাকে ভয় করে। সহসা নিকটস্থ হলে সে ভয় কেটে গিয়ে এক নির্বিকারত্ব এসে যায়। অকম্পন দেখল তার আর তেমন ভয় করছে না। হঠাৎ তার হাতের ঘর্ষণে উঠে এলো একখণ্ড মাটি। ঠিক মাটি নয়, কোন এক বস্তু যা ঐ শ্যাওলার কাদায় প্রোথিত ছিল। অতি আয়াসে চোখের কাছে এনে দেখতে গেল অকম্পন। লাভ হল না, এই আঁধারে চক্ষু অপারগ। অনুভবে বুঝল, বস্তুটি এক চ্যাপ্টা গোলাকার ধাতবখণ্ড। অকম্পন আগ্রহ বোধ করলো না। ছুঁড়ে ফেলে দিল সেটি। কিন্তু খানিক পরে আরও একটি একইরকম ধাতুখণ্ড হাতে এলো। কি এগুলো? মুদ্রা? এই সুপ্রাচীন গুহাকন্দরে মুদ্রা কোথা থেকে এল?

অকম্পনের অন্তরাত্মা সহসা আকুলিবিকুলি করে উঠল। এইরকম অসহায় জড়পিণ্ডের মতো মৃত্যুবরণ করবার আগে অন্তিম প্রচেষ্টায় সে একবারের জন্য জীবনকে আঁকড়ে ধরতে চাইল। দুই হাতের ভরে উঠে বসে পড়ল সে। এ শক্তি এতক্ষণ কোথায় ছিল জানা নেই। অকম্পন দেখল দুই পায়ে সে উঠে দাঁড়িয়েছে! কিভাবে কে জানে, অকম্পন এক পা এক পা করে এগিয়ে চলল। কোথায়, কোনদিকে যেতে হবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না, কতক্ষণ চলেছিল সে কে জানে। পরনের পরিচ্ছদ ক্লেদাক্ত হয়ে ভারী হয়ে গেছে, পিচ্ছিল পথে একাধিকবার ভূপাতিত হয়েছে, সমগ্র শরীর কর্দমলিপ্ত কদাকার হয়ে গেছে। তাও এক অমোঘ শক্তিতে টলায়মান পদক্ষেপে অকম্পন এগিয়ে চলে।

অবশেষে এক ঝলক শীতল হাওয়া এনে দেয় বহির্জগতের বার্তা। উপর দিকে চেয়ে দেখে অকম্পন, একখণ্ড আকাশের আলো দেখা যায়।

সূর্যোদয়ের বিলম্ব আছে, প্রাকপ্রত্যুষের অমল আভায় সে আকাশ অকম্পনকে দেয় জীবনের আশ্বাস। গন্ধহীন নির্মল বাতাসে দীর্ঘশ্বাস নেয় সে। কর্দমাক্ত পথ ক্রমে শুষ্ক হয়ে আসে, বন্ধুর উপলখণ্ডে পা ফেলে সে ধীরে ধীরে উঠে আসে সমতলে। কানে আসে নদীর কলস্বর। দূরে যেন দেখা যাচ্ছে একটা কম্পমান আলোর বিন্দু—ওই তো দেখা যাচ্ছে শিরি নদীর তট—

মৃত্যুর দুয়ার পেরিয়ে জীবনকে এত নিকটে পেয়ে আর পারে না অকম্পন, মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে।

সেইভাবেই ব্যতীত হল সারাদিন। দিবসের রৌদ্রাতপ অকম্পনের জীবনীশক্তির শেষবিন্দুটিকে বোধহয় নিভে যেতে দেয়নি। সূর্যাস্তকালে তার সংজ্ঞা ফিরে আসে। কিন্তু সকল দৈবাপ্তি ও প্রাকৃতিক উপচার বোধহয় এবার ব্যর্থ হতে চলল। চক্ষুরুন্মীলন করেই তার গোচর হয় সেই মৃত্যুদূতের আবির্ভাব।

শিকারকে বহুক্ষণ একই ভঙ্গিতে নিশ্চল দেখে সন্তুষ্ট হলেন অহিরাজ। তারপর ধীর সর্পিল উরগমনে অনড় লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হল সরীসৃপটি...

॥ ১৪ ॥

কালিঙ্গড়ের সংলগ্ন পার্বত্যভূমিতে নিমাড় সম্প্রদায়ভুক্ত এক উপজাতির বাস। তাদের বনজ সংস্কৃতি নাগরিক সভ্যতা থেকে দূরে গিরিকন্দরে প্রচ্ছন্ন এক নিজস্ব ভুবনে সমাহিত ছিল। বহির্জগতের সঙ্গে প্রায় বিচ্ছিন্ন এই গোষ্ঠী এক প্রধানের অভিভাবকত্বে এক রহস্যময় জীবন যাপন করত। নাগরিক তাদের অস্তিত্ব জানত না। তারাও কখনও সে অপরিচয়ের গণ্ডি অতিক্রম করে আত্মপ্রচারের ঔৎসুক্য দেখায়নি।

অর্ধ শতাব্দীর বেশ কিছু আগে অকস্মাৎ এক আগন্তুক এসে তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনধারায় হিল্লোল তুলেছিল। আগন্তুকের বয়স বেশী নয়, যুবকই বলা চলে। কিন্তু বড়ই দীনদশা। বাহ্যিক অবভাসে এক চালচুলোহীন সঞ্চারজীবী বলেই মনে হয়, কিন্তু তার সুপ্ত প্রতিভা প্রকাশ পেল যখন সে গোষ্ঠীপ্রধানের কঠিন রোগে পীড়িত পুত্রকে তৎকাল নিরাময় করে দিল! চমৎকৃত হয়ে প্রধান বললেন, কে তুমি? কী চাও?

—আমি এক জীবন-সন্ধানী। উত্তর দিয়েছিল আগন্তুক, তোমাদের পল্লিতে ভরণপোষণ চাই। পরিবর্তে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে পারি।

পুত্রের আরোগ্যে গোষ্ঠীপ্রধান বড়ই প্রসন্ন ছিলেন। বললেন, গ্রাসাচ্ছাদন তুমি এমনিই পাবে। কিন্তু তুমি আমার পুত্রের জীবনদান করেছ। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই। বল আর কী পুরস্কার তুমি চাও।

কিঞ্চিৎ ভেবে আগন্তুক বলেছিল, আপাতত আমার কিছু চাইবার নেই। কিন্তু আমার জীবনের একটি বিশেষ লক্ষ্য আছে। তার জন্য আমার কয়েকজন কর্মী চাই। আমি তাদের প্রশিক্ষিত করব।

এতে গোষ্ঠীপ্রধানের কোনও আপত্তি হল না। বললেন, বেশ তাই হবে। আমাদের সমাজে চিকিৎসা প্রণালী বলে সেরকম কিছু নেই। তুমি আমাদের যুবগোষ্ঠীকে নিয়ে সেই প্রণালী নির্মাণ করবে। এখন তোমার পরিচয় দাও।

—আমার নাম দারুকল্প। নাগরিক, কিন্তু আর নগরে ফিরে যাব না। আমার আর কোনও অতীত নেই।

যুবকের আচরণ অদ্ভুত, কিন্তু গোষ্ঠীপ্রধান নিশ্চই বুঝেছিলেন এ সাধারণ নয়। তিনি তাকে কাছছাড়া করতে চাননি। আর কিছু জানতেও চাননি। তার মধ্যে তিনি দেখেছিলেন ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। তাই তার অতীত নিয়ে আর কৌতূহল দেখাননি।

দারুকল্প সেই থেকে নিমাড়-পল্লীতেই মিশে যায়। জীবনদান যে করতে পারে, মানুষ তাকে ঈশ্বরের কাছাকাছিই মনে করে। দুরারোগ্য ব্যাধি উপশমনের অলৌকিক ক্ষমতা ছিল দারুকল্পের। অচিরেই সে তাদের সমাজে জনপ্রিয় হয়। কয়েকটি যুবক উৎসাহের সঙ্গেই তার আনুগত্য স্বীকার করে। সকলেই অনুমান করেছিল দারুকল্প তাদের চিকিৎসাবিদ্যায় প্রশিক্ষিত করতে চায়। বাহ্যত তাই করত সে। কিন্তু সঙ্গোপনে সে তাদের যুদ্ধবিদ্যার শিক্ষাও দিতে থাকে।

দারুকল্পের প্রকৃত পেশা যে কি কেউ জানে না। চিকিৎসাবিজ্ঞান ছাড়াও ধাতুবিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা, কৃষি ও স্থাপত্যেও তার অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি ছিল। অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ও কঠোর পরিশ্রমী সে একাধারে পুরো গোষ্ঠীর চিকিৎসা, পশুপালন, কৃষি ও নির্মাণকার্যের তত্ত্বাবধান করে। দূরাগত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগ সাধন করে আমদানি করে অস্ত্রাদি ও নগরায়নের অন্য সামগ্রী। তারপর সেইসব দিয়ে বনে-কান্তারে নির্মাণ করায় গহীন দ্রুমকক্ষ, গিরিকন্দরের মাঝে গুপ্ত আবাস। প্রচ্ছন্ন থেকে যুবশক্তিকে অভ্যাস করায় অস্ত্র ও অশ্বচালনা। অল্পদিনেই দারুকল্প তাদের তরুণ সম্প্রদায়ের অবিসংবাদিত সর্বাধিনায়ক হয়ে যায়।

গোষ্ঠীপ্রধান তিরোধানকালে দারুকল্পকে ডেকে বলে, তুমি তোমার পুরস্কার আজও চেয়ে নাওনি। আমি তোমাকে এই গোষ্ঠীর প্রধান নিযুক্ত করে গেলাম।

এ বিষয়ে তখন আর বিশেষ মতদ্বৈধ ছিল না। এমন কি প্রধানের পুত্রও এতে কোনও আপত্তি করেনি। সে ততদিনে দারুকল্পের একনিষ্ঠ সহকারীতে পরিণত হয়েছে।

প্রধানের কার্যভার নিয়ে প্রথমেই একদিন দারুকল্প তার সহকর্মীদের একত্র করে বলে, আমার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। তার জন্যই আমি এতদিন তোমাদের প্রশিক্ষিত করেছি। তোমরা শপথবদ্ধ হও এই কাজে আমৃত্যু আমার সহায়তা করবে।

সম্পূর্ণ জনসমবায় বিনা প্রশ্নে সহর্ষ সম্মতি জানায়। তখন দারুকল্প প্রশ্ন করে, তোমরা আজ সংখ্যায় কত হয়েছ জানো? প্রায় পাঁচ হাজার। কিন্তু আমার অভীষ্টের জন্য এই সংখ্যা যথেষ্ট নয়। আমি কর্মীসংগ্রহ করছি, তোমরাও এই কাজে যেখান থেকে পারো আর যোদ্ধা একত্রিত করো।

উপজাতীয় বর্ষীয়ানগণ বুঝে যায় দারুকল্প যুদ্ধের প্রস্তুতি করছে। প্রতিপক্ষ কে কেউ জানে না। কিন্তু যুদ্ধের এক উন্মাদনা আছে। যুবসমাজ তো বটেই, বয়স্করাও প্রবল উৎসাহে লোকসংগ্রহে ব্রতী হয়। সকলেই মেতে ওঠে সংগঠনের মন্ত্রে।

ওদিকে ততদিনে মগধে চন্দ্রগুপ্তের শাসন সমাপ্ত হয়, তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সবার অলক্ষ্যে পার্বত্য ও বনের সব উপজাতীয় যুবকেরাও ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়। দারুকল্প তখন পঞ্চাশোর্ধ বৃদ্ধ, কিন্তু তার প্রাণশক্তিতে বিন্দুমাত্র ঘাটতি নেই। সে যেসব আহত ও মুমূর্ষু রোগীদের আরোগ্য করে তাদের প্রতিজ্ঞা করায়, যে তারা এই কাজে যোগদান করতে প্রতিবদ্ধ। এমনকী যেসব বিদেশিদেরও সে সুস্থ করে, তাদেরও নিজের দলীভূত করে নেয়। লোকচক্ষুর অন্তরালেই প্রস্তুত হয়ে যায় দশ সহস্র যোদ্ধার এক সংগ্রামলোলুপ বাহিনী। প্রতীক্ষা কেবল তাদের অধিনায়কের আদেশের।

তারপর দারুকল্প একদিন তার বরিষ্ঠ নায়কদের সম্বোধন করে বলে, এইবার তোমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যের কথা জানাবার সময় হয়েছে। শ্রবণ করো। আমার শত্রুর উচ্ছেদ নিমিত্ত তোমাদের সংগঠিত করেছি।

উৎসুক নায়কদের সপ্রশ্ন দৃষ্টির সম্মুখে দারুকল্প দুই বাহু বক্ষবদ্ধ করে ঘোষণা করে, গুপ্তরাজ আমার শত্রু। আমার সংকল্প হল গুপ্ত বংশের উচ্ছেদ!

নায়কেরা স্তম্ভিত হয়ে একে অপরের মুখাবলোকন করে। এ অসম্ভব পরিকল্পনা কেউ করেনি। তখন দারুকল্প বলে, আমরা যথেষ্ট সংগঠিত কিন্তু তবুও জানি সম্মুখসমরে গুপ্তদের সামরিক শক্তি পরাস্ত করা যাবে না। তার উপায় আমি নির্ধারণ করেছি। শত্রু দ্বারা শত্রুর উচ্ছেদ। আমরা শকদের সাহায্য নেব।

—শকেরা কি আমাদের সাহায্য করবে?

—করবে। মগধের সিংহাসন তাদের কাছে যথেষ্ট প্রলোভন। মনে রেখো, আমাদের উদ্দেশ্য মগধের সিংহাসন নয়, শুধু গুপ্তদের পরাজয়। আমরা কোনও শক নেতাকে গুপ্তদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা করব। তারা বিজেতা হবে, আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি। আমরা কোনও প্রতিষ্ঠিত রাজ্য নই, রাজ্য প্রতিষ্ঠারও কোনও অভিলাষ নেই। তাই প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে না। আমাদের অগ্রসর হতে হবে সঙ্গোপনে।

উজ্জয়িনীর দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে এক শক তস্কর কিছুদিন যাবৎ নগর-

সভ্যতার অগোচরে শক্তিসঞ্চয় করছিল। সমুদ্রগুপ্তের শাসনে নগরীর দিকে যাবার সাহস ছিল না তাদের। এক অজানা প্রান্তিক শক্তি হয়ে পার্বত্য ও জঙ্গল অঞ্চলে লুঠতরাজ করে তারা সম্পদবৃদ্ধি করছিল। দারুকল্প সেই শকাধিপতিকে উৎকোচে বশীভূত করে দলবৃদ্ধি করে। তার দ্বারাই নিজের অভীষ্টসিদ্ধির পথ করে নেয়।

সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ও পূর্বোত্তর দিকে সমতট ও কামরূপে সাম্রাজ্যবিস্তারে ব্যস্ত ছিলেন। বনজ উপজাতি অধ্যুষিত মধ্যভারতে তাঁকে দৃষ্টি দিতে হয়নি। এই ভূমি শাসনযোগ্য বলে মনেই হয়নি। করদ রাজ্য নয়, নৈসর্গিকভাবেই তা সম্রাটের অধীন ধরে নেওয়া হয়েছিল। সেখানে যে এক অগ্নিগর্ভ একনায়কতন্ত্র সৃষ্টি হয়েছে, শাসক রাজপুরুষেরা কেউ সে সংবাদ পাননি। ইতিহাসও তা জানায় না। এমন অনেক কথাই ইতিহাসে লেখা হয়নি, নিয়তি নির্দেশে তারা আলোকবৃত্তের উপচ্ছায়াতেই রয়ে গেছে। মহাকালের ইচ্ছা অপরিজ্ঞাত।

আঘাত হানার প্রস্তুতি নিয়েও দারুকল্প শকরাজাকে অপেক্ষা করতে বলে। সমুদ্রগুপ্ত বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু তিনি বর্তমান থাকতে উজ্জয়িনী আক্রমণ করা হঠকারিতা। অধৈর্য শক সেনাপতিকে নিরস্ত করে দারুকল্প বলে, সঠিক সময়ের প্রতীক্ষা করো। দেরি নেই, সে সময় আসবে। সমুদ্রগুপ্তের পরেই আসবে সুযোগ। এ রাজ্যের ভিত টলে যাবে।

অর্ধশতাব্দীকাল ব্যতীত হয়েছে, অতীত হয়েছে প্রায় তিন প্রজন্মের কাল। খদ্যোৎচক্ষু নিয়ে দারুকল্প লক্ষ্যস্থির করে প্রতীক্ষা করে আছে। একই সংকল্পে স্থির। স্পর্ধাও বটে! এককসামর্থ্যে সে প্রত্যাহ্বান জানায় আর্যাবর্তের সুমহান রাজশক্তির বিরুদ্ধে। কেন? গুপ্তরাজবংশের সঙ্গে কি তার বৈরিতা?

সে বলেছিল তার কোনও অতীত নেই, কিন্তু তা সত্য নয়। তারও অতীত ছিল।

তখন জ্যেষ্ঠ চন্দ্রগুপ্তের শাসনের আদিকাল। অবশ্য নামেই তাঁর শাসনকাল, বস্তুত তিনি প্রতীকী রাজা মাত্র। রাজ্যের মূলসূত্রগুলি ধরা আছে লিচ্ছবিদের হাতে। তারা সম্রাটের শ্বশুরকুল। মহিষী কুমারদেবী তাদের প্রতিভূ। সকলেই জানে মহারাজ নয়, মহাদেবীই কর্ত্রী। রাজাদেশ আসে অন্দরমহলের অন্তরাল থেকে। রাজমুদ্রায় মহারাজের সঙ্গে আছে মহাদেবীর নাম। অভিমানে চন্দ্রগুপ্ত নীরবে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করেন। লোকচক্ষুর সমক্ষে তিনি ব্যসন, সুরা ও মৃগয়াতেই অধিক সময় ব্যয় করেন।

এদিকে মহারানি কুমারদেবীর হয়েছে জ্বালা। পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের টানাপড়েনে তিনি জেরবার। বালকপুত্র সমুদ্রগুপ্তকে নিয়ে একদিকে এই মহীয়সী নারী রাজকার্য পালন করেন। অপরদিকে নিভৃত অবসরে বিক্ষুব্ধ স্বাভিমানী স্বামীকে নিজের পুরুষকারে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টায় সদাব্যাপৃত থাকেন।

এইরকম এক সন্ধ্যায় রাজ অবরোধের সামনে আনীত হয় এক যুবক। তার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। মহারাজ মৃগয়ায়, সুতরাং অবরোধ অন্তরালবর্তিনী কুমারদেবীকেই শুনতে হয় সেই অভিযোগ। নগরপাল যা ব্যক্ত করেন, তা এই...

যুবকের নাম অনঙ্গ। উচ্চকুলোদ্ভব কেউ নয়, নিম্নবর্গীয় ক্ষত্রিয় সে। কিন্তু যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেনি, সে রাজবৈদ্যের শিষ্য। স্বভাবে দাম্ভিক, উদ্ধত ও দুর্বিনীত। আশ্রমে আচার্যের উপদেশাবলী সে গ্রহণ করত তাচ্ছিল্যভরে। উপদেশ ও অনুশীলনে অমনোযোগী। নিদান ও উপচারে সে প্রচলিত রীতিনীতি মেনে চলতে চাইত না। বলত, এসব নিতান্তই গতানুগতিক চিকিৎসা-প্রক্রিয়া। তার মতে প্রাণীর চৈতন্যসত্তার সাক্ষাৎ পাওয়াই সব। তার দাবি, ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের প্রতিভায় সে রোগীর প্রাণসত্তার স্তরে উপচার করতে পারে।

অনঙ্গ বাল্যকাল থেকেই কিঞ্চিৎ স্বল্পধৈর্য ছিল। কিন্তু তার প্রতিভাও ছিল। আশ্রমে সে নিজস্ব পদ্ধতির প্রয়োগ করত। সত্য বলতে কী, এর ফলও দেখা যেত। কিছু অসামান্য সাফল্য সে অর্জন করেছিল। প্রতিভাবানদের জেদ হয় অধিক এবং স্থৈর্য সেই অনুপাতে কম। অনঙ্গও তার ব্যতিক্রম নয়। বাধা পেলেও সে নিজের সংকল্প থেকে বিচ্যুত হত না। দুষ্প্রচারে সহজেই রুষ্ট হত। এই থেকেই তার আচরণে অপ্রকৃতিস্থতা আসতে থাকে।

বর্তমান ক্ষেত্রে তার উপর আরোপ এই যে, সে রাজপুরুষ অম্ভীর কন্যাকে অসদুদ্দেশে অপহরণ করে পলায়ন করে। অম্ভী কন্যার উদ্ধারকল্পে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে রাজ্যের প্রান্তে এক বিহড়ে তাদের দেখা পায়, কিন্তু অনঙ্গ কন্যাকে ফেরত দিতে অস্বীকার করে। তারা পুনরায় পলায়ন করতে গেলে অম্ভীর অনুচরবৃন্দ শরক্ষেপ করে অনঙ্গকে বাধা দিতে চায়। দুর্ভাগ্যবশত তির কন্যাটির পায়ে বিদ্ধ হয়। অনঙ্গ আর পালাতে পারেনি, আত্মসমর্পণ করে।

অম্ভী দু'জনকেই গৃহবন্দি করে কন্যার উপচার শুরু করেন। অনঙ্গ চেয়েছিল সেই চিকিৎসা করবে। অম্ভী তাকে বিশ্বাস করেনি। বরিষ্ঠ চিকিৎসকেরা কন্যার উপচার করছে। কিন্তু তার পায়ের ক্ষত সংক্রমিত হয়ে বিষাক্ত হয়ে গেছে। তাই চিকিৎসায় বিশেষ ফললাভ হয়নি।

অনঙ্গ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গেছে সন্দেহ হয়। গতরাতে সে এক অসতর্ক মুহূর্তে নিজের কক্ষ থেকে বেরিয়ে অম্ভীর কন্যাকে হত্যার প্রয়াস করে। গোপনে সে এই কাজ করতে গিয়েছিল, বৈদ্যের অনুমতির অপেক্ষা না করেই সে রোগিণীর কক্ষে প্রবেশ করে। সৌভাগ্যক্রমে এক প্রহরীর সতর্কতায় তার অভীষ্টসিদ্ধি হয়নি, সে বন্দি হয়।

গুরুতর অভিযোগের উত্তরে দণ্ডপাশিকের মাধ্যমে তার যে কথোপকথন হল তা এইপ্রকার...

—তুমি কন্যাকে নিয়ে পালিয়েছিলে কেন মহাদেবীকে বল।

—রুক্মিণী আমার প্রণয়িনী। তাকে বিবাহ করতে চাই।

—রুক্মিণীর সম্মত কি?

—সেও সম্মত।

—তাহলে কন্যার পিতার কাছে প্রস্তাব দাওনি কেন?

—সম্মতি মিলত না বলে। আমি কুলীন নই, অম্ভী সম্পন্ন —

দণ্ডপাশিক ও নগরপালের মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় হয়। নগরপাল জানান, এ কথা মিথ্যা নয় তা যাচাই করে দেখা হয়েছে। অম্ভী এ বিবাহ অনুমোদন করেননি। দণ্ডপাশিক আবার শুরু করেন,

—তুমি কাল রুক্মিণীর কাছে কেন গিয়েছিলে?

—ওরা রুক্মিণীকে মেরে ফেলবে রানিমা। আমি ওকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম।

—বাঁচাতে? তুমি তাকে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে গিয়েছিলে।

—না। রুক্মিণীর পা বিষাক্ত হয়ে গেছে। পা বিচ্ছিন্ন না করলে বিষক্রিয়া সারা অঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে। ওরা তা জানে না। আমি তাকে আরোগ্য করতে পারি।

—কী প্রলাপ বকছ? রোগীকে খঞ্জ করে আরোগ্য করবে?

—সম্ভব। এ ছাড়া এ রোগীর প্রাণরক্ষার আর কোনও পন্থা নেই। এই চিকিৎসায় রোগী জীবিত থাকবে, পদবিহীন হয়েও কর্মক্ষম থাকতে পারবে।

—তুমি বৈদ্যকে সে কথা জানাতে পারতে।

—বহুবার বলেছি। আমার কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি। কেউ বিশ্বাস করছে না এ সম্ভব।

—তুমি কিভাবে জানলে এ সম্ভব? এমন ভয়ংকর চিকিৎসার কথা কেউ শোনেনি।

—এজন্য প্রয়োজনীয় অধ্যয়ন অনুধ্যান কেউ করেনি। কিন্তু আমি জেনেছি এ সম্ভব। ভবিষ্যতে সকলেই জানবে।

—তোমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। তাই প্রলাপ বকছ।

অনঙ্গ আরও অনুনয় করে বলে, এ তার প্রলাপ নয়। এরকম বিস্তর প্রক্রিয়া ও রসায়ন সে আবিষ্কার করেছে, যা প্রথানুগ নয়। কিন্তু ফলদায়ী। বহু দুরারোগ্য ব্যাধি সে তার নিজের পদ্ধতিতে নিরাময় করেছে। বরিষ্ঠ চিকিৎসকদের এগুলি যথেষ্ট বিরক্তির কারণ ছিল। তাঁরা ক্ষণবুদ্ধি, মূর্খ, ঈর্ষান্বিত। তাই তাঁরা প্রচার করছেন অনঙ্গের বিকৃত মস্তিষ্কের কথা। কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষী, সে সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে বিচার করেই বলছে, রুক্মিণীকে চিকিৎসা করে সে সুস্থ করে তুলতে পারে। কিন্তু তার পা বাদ দেওয়া ভিন্ন পথ নেই। তাকে এই মুহূর্তে যেন রুক্মিণীর উপচার করতে দেওয়া হয়, অন্যথায় তার জীবন রক্ষা হবে না।

বলা বাহুল্য, আর তার কথায় কেউ কান দেয়নি। রোগিণীকে সুস্থ

করে তুলবে, তার এই দাবিও গ্রাহ্য হয়নি। সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ বলে তার নির্বাসন দণ্ডবিধান হয়। তাকে কারাগারে প্রেরণ করবার কালেও সে বলতে থাকে, তার রুক্মিণীকে হত্যা করা হচ্ছে। একদিন সে এই অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করবে।

অনঙ্গকে কারাগারের বন্ধনে বেশিদিন বেঁধে রাখা যায়নি। দুই দিবস পরে শেষরাতে কারাগারের পাগলা-ঘন্টি বেজে ওঠে। রক্ষীদের ফাঁকি দিয়ে অনঙ্গ পলাতক হয়েছে। লোক-লস্কর, হাতি-অশ্বে তার অনেক অনুসন্ধান হয়েছিল, কিন্তু রাজধানী অথবা তার আশেপাশে আর তাকে দেখা যায়নি।

দিনকয়েক পরে ভিনদেশ থেকে অশ্বক নামে এক বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী আসছিল উজ্জয়িনীর পথে। নগরীতে প্রবেশ করবার আগেই তার আসন্নপ্রসবা পত্নী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। পথিপার্শ্বস্থ এক পান্থশালায় পত্নীকে রেখে বিহ্বল হয়ে অশ্বক ভিষজের সন্ধানে তার লোকজন পাঠায় নগরীতে। কিন্তু পত্নীর অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। গর্ভস্থ শিশু নির্গমপথে কিছু বাধা পেয়ে এক জটিল বন্ধনে আটকে গেছে। গর্ভিণীও অত্যধিক যন্ত্রণায় মুমূর্ষু হয়ে পড়ে। অবিলম্বে ব্যবস্থা না হলে মাতা ও শিশু, উভয়েরই জীবন সংশয়, এই অবস্থায় এক যুবাবয়সী ভবঘুরে সেখানে উপস্থিত হয়ে বলে, নগরীর কোনও বৈদ্য এ জটিলতায় কিছু করতে পারবে না। কিন্তু সে এখনই দু'জনেরই প্রাণ রক্ষা করতে পারে।

লোকটির বহিরঙ্গ বড়ই হতশ্রী এবং তার চালচলন ততোধিক অপ্রকৃতিস্থ। অশ্বকের সকল সঙ্গী পরামর্শ দিল, এ ব্যক্তি অশিক্ষিত উন্মাদ। তাকে সাহস করে এই দায়িত্ব দেওয়া যায় না। কিন্তু সময় ব্যতীত হয়ে চলেছিল। এমনিতেই রোগিণীর অবস্থার ক্রমিক অবনতি হচ্ছিল। সংকটের এই দ্বৈধে অশ্বক সত্বর ঐ ব্যক্তির সহায়তা নিতে সম্মত হয়। লোকটি তার ঝোলা থেকে যৎসামান্য অস্ত্রাদি ও ঔষধির সাহায্যে দক্ষ চিকিৎসকের নিপুনতায় রোগিনীকে সংজ্ঞাহীন করে তার উদরে শল্যবেধ করে এবং সতর্ক ক্ষিপ্রতায় দুই দণ্ডকালের মধ্যেই জীবিত ও সুস্থ শিশুটিকে মাতৃজঠর থেকে বার করে আনে। তারপর রোগিণীর উদর জুড়ে দিয়ে কিছু ওষধিপ্রয়োগ করে পট্টি বেঁধে দেয়। অভূতপূর্ব এই সমগ্র প্রক্রিয়া মাত্র দুই ঘটিকার মধ্যেই সমাপ্ত করে সে বলে, মধ্যরাত্রের মধ্যেই রমণী সংজ্ঞা ফিরে পাবে। এখন আমাকে আমার পারিশ্রমিক দিয়ে বিদায় দিন।

অভিভূত অশ্বক তার সম্মুখে নিজের ধনাধার খুলে দিয়ে বললেন, কে তুমি ধন্বন্তরি, জানি না কিন্তু তোমার ইচ্ছামতো পারিশ্রমিক নিয়ে নাও।

লোকটি নিজের পরিচয় দিল না, গুণে-গুণে কুড়িটি স্বর্ণমুদ্রা তুলে নিয়ে প্রস্থান করল। রাত্রি প্রভাতে নগরীর এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্যকে নিয়ে অশ্বকের সেবকেরা যখন ফিরে এলো, মাতা ও সন্তান তখন সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত ও দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার পথে। বৈদ্য পরীক্ষা করে জানালেন, বড় সাংঘাতিক সংকট কেটে গেছে। কিভাবে তা তিনিও বলতে পারলেন না। কেননা প্রসবের এই প্রক্রিয়া অতি জটিল ও সময়সাপেক্ষ, তিনি সেসময়ে উপস্থিত থাকলেও সম্ভবত তা সম্পন্ন করতে পারতেন না।

কে ছিল এই অজ্ঞাত ঐন্দ্রজালিক? কেউ তাকে চেনে না। অবশেষে পান্থপাল তার সন্দেহ জানায়, এ সেই উন্মাদ রেবট দারুকল্প তো নয়?

অশ্বকের পত্নী ও সন্তানের জীবন রক্ষাকারী এই রেবট দারুকল্প কিনা সে মীমাংসা হয়নি। অশ্বক রাজধানীতে পৌঁছে অনুসন্ধান করেছিল। অদ্ভুত উপচারের সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল। তখন সে ফিরে এলে অবশ্যই পুরস্কৃত হত। কিন্তু রহস্যময় সেই নিরাময়ক আর দেখা দেয়নি। মহাকালের ইচ্ছা তিনিই জানেন।

অনঙ্গ পলাতক হবার তিন দিনের মধ্যেই অনঙ্গের প্রণয়িনী রুক্মিণীর মৃত্যু হয়। নিয়মিত চিকিৎসাতে তার স্বর্গবাস রোধ করা যায়নি। ইহলোকে অনঙ্গের সঙ্গে আর তার মিলন হল না। কোথায় গেল অনঙ্গ? আজ বহু শতাব্দীর পরে সে হয়তো পেয়ে গেছে তার ইপ্সিতা প্রেমিকার ঠিকানা। কিন্তু ইহজগতে কি হল তার ব্রতের উদযাপন?

রুক্মিণি, তোমাকে ওরা বাঁচতে দেবে না। আমি জানি, তোমাকে ওরা বাঁচতে দেয়নি। কোন অন্তরীক্ষে, কোন নীহারিকাপুঞ্জের নক্ষত্রলোকে তুমি চলে গেলে জানি না। আর তোমাকে আমি দেখতে পাব না। বুকের মাঝে বড় জ্বালা রুক্মিণি। সেই দহনেই আমি তোমার চিতা সাজাব। সে চিতায় এই সাম্রাজ্য জ্বলে ছারখার হয়ে যাবে। বহ্নিমান শিখার আগুন আমার চোখে রইল রুক্মিণি। সেই চোখের আলোয় তোমার নক্ষত্রলোকের পথ একদিন ঠিক খুঁজে নেব।

শীতল অঙ্গারসদৃশ দু'চোখে ধ্বকধ্বক করে জ্বলা প্রতিশোধের আগুনে পথ খুঁজে ফেরে রুক্মিণীর প্রেমিক। সে কি অনঙ্গ? না দারুকল্প?

***

অকম্পনের সংজ্ঞা ফিরে এল মুখমণ্ডলে শীতল জলের স্পর্শে। রাত্রি তখন ঘন হয়েছে, কিন্তু অসম্পূর্ণ চন্দ্রকলার জ্যোৎস্নায় আঁধার নীরন্ধ্র ছিল না। মায়াময় সেই স্বল্পালোকে চক্ষু মেলে এক ঝাঁক নক্ষত্রখচিত আকাশটার দিকে শূন্যদৃষ্টি মেলে খানিক চেয়ে রইল সে। প্রথম জ্ঞানোদয়ের ধুসর অনুভূতিতে অকম্পন বুঝতে পারলো তখনও তার মৃত্যু হয়নি। কিন্তু জীবিত থাকার অনুভূতি হর্ষ বা বিস্ময় কিছুই জাগলো না। কেননা পূর্বের বিভীষিকার স্মৃতি আর তার ছিল না।

কিন্তু একখণ্ড ভোরের আকাশ সে দেখেছিল সে স্মৃতিটুকু আছে। তারপর কি হল? এ তো রাত্রির আকাশ। মেঘমুক্ত আকাশে বৃষ্টি ছিল না, তাহলে জল এলো কথা থেকে? নিজের প্রাণরক্ষা হওয়ার স্বস্তি অতিক্রম করে সব চিন্তাভাবনা তার গুলিয়ে গেল।

তারপর যে দৃশ্য সম্মুখে দৃশ্যমান হল, তা কোন বিভীষিকার চেয়ে কম ছিল না।

একটা মুখ তার দিকে ঝুঁকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। একটি বৃদ্ধ, বলিরেখাপূর্ণ মুখ, তাতে হনুদুটি অস্বাভাবিক উঁচু। সহসা মানুষ কিনা সন্দেহ হয়, এমন একটা অমানবীয় গঠন সে মুখের। আধো অন্ধকারেও তার কোটরগত দু'চোখের মর্মভেদী দৃষ্টি অকম্পন স্পষ্ট অনুভব করল। বৃদ্ধের দেহ শীর্ণ, মস্তক বিরলকেশ কিন্তু মুখ শ্মশ্রুমন্ডিত।

প্রকাশ্য দিবালোকেও প্রেতসদৃশ এই মনুষ্যমূর্তি খুব প্রীতিকর নয়, রাত্রির জনমানবশূন্য চরাচরে ঘননীল আকাশের প্রেক্ষাপটে তা অকম্পনের মস্তিস্কে এক সাগরতরঙ্গের মতো এসে আঘাত করল।

কিন্তু তার ফল হল আশ্চর্য। চেতনার স্তরে স্তরে পূর্বস্মৃতির উপর বিস্মরণের যে পর্দাগুলি আচ্ছাদিত করে রেখেছিল, আকস্মিক তীব্র মানসিক আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় তা যেন একের পর এক সরে যেতে লাগলো। তার মনে পড়ে গেল অন্ধকূপে গড়িয়ে পড়ার সুবাদে তার শরীর আহত হয়েছে। তারপর কোনও অলৌকিক প্রাণশক্তি তাকে সেই মরণফাঁদের বাইরে নিয়ে আসতে সহায়তা করেছে।

প্রতিবর্তী উপবেশে উত্থানের প্রয়াস করতেই তার শরীরে যন্ত্রণার বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল। একটা বিকৃত নিষ্টন করে স্থির হল সে। তৎক্ষণাৎ কানে এলো চাপা স্বরে মৃদু ভর্ৎসনা, এখনই নড়াচড়া করো না মূর্খ। তোমার ডান হাতের অস্থিভঙ্গ হয়েছে। দক্ষিণ স্কন্ধ ও পঞ্জরাস্থির নীচে আছে গভীর ক্ষত। রক্তক্ষরণও কম হয়নি। হাতের অস্থিসংস্থাপন করে আমি তোমার শরীরের কয়েক জায়গায় বাঁধন দিয়ে দিয়েছি।

কয়েকটা ছায়াশরীরের উপস্থিতি যেন অনুভব করছিল অকম্পন। তার চেতনা জাগ্রত হয়েছে কিন্তু অবসাদে চক্ষুরুন্মীলন করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না। অনুমানে বুঝল তার দেহের স্থানে স্থানে লতাগুল্মের সাহায্যে কাষ্ঠখণ্ড বাঁধা, যাতে ভগ্নাস্থির স্থানচ্যুতি না ঘটে। ঐ প্রেতাকৃতি বৃদ্ধ কি তার উপচার করছে? মস্তিষ্কের জটিলতা মুক্ত করতে অকম্পন চক্ষু বুজেই ক্ষীণস্বরে বলল, আমি কোথায়?

আবার সে শুনতে পেল সেই স্বর, তুমি এখন শিরি নদীর বিরান অববাহিকায়। এখনই তোমাকে স্থানান্তরিত করা সম্ভব নয়। রাত্রি প্রভাত হলে আশুষ্ক আসবে তোমার স্থানান্তরণের প্রবন্ধন করে। ততক্ষণ এই প্রান্তরের মাঝেই শান্ত হয়ে প্রতীক্ষা কর।

এবার প্রমীলিত চক্ষু উন্মোচন করে সেই বৃদ্ধের মুখ আবার দেখতে পেল অকম্পন। তার কণ্ঠ শুষ্ক হয়েছিল। বৃদ্ধ তার মুখে কিঞ্চিৎ জল দিলেন। জলসিক্ত হয়ে কণ্ঠের জ্বালা কিছু প্রশমিত হল। অকম্পন জিজ্ঞেস করল, একটা ভীষণ সাপ দেখেছিলাম, আমার দিকেই আসছিল—

—তাতেই তোমার সংজ্ঞালুপ্ত হয়, তাই তো? তাকে বিদায় করা গেছে। শকলজ্যোতি কি জলবোড়া হলে ক্ষতি ছিল না, দংশনে উপকারই

হত। কিন্তু ওটা জাতসাপ ছিল, দংশবিষ তোমার হৃদ্‌যন্ত্র সহ্য করত না।

সর্পদংশনে যে উপকারও হয়, এমন কথা অকম্পন কখনও শোনেনি। সর্পবিষ সম্বন্ধে অশঙ্কিত নির্লিপ্তি, কে এই রহস্যময় ব্যক্তি জানা প্রয়োজন। অকম্পন জিজ্ঞেস করলো, আপনি কে ঠাকুর?

—তোমাকে সাপের মুখ থেকে বাঁচিয়েছি, আপাতত তোমার কাছে এইটাই আমার পরিচয়, বৃদ্ধ তাকে থামিয়ে বললেন, তোমাকে বরং আমার কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল।

অকম্পন দেখল সেই অতিজর মুখাবয়ব পুনর্বার তার নিকটস্থ হল। একটা হ্রস্ব তীক্ষ্ণ স্বর শুনতে পেল সে, শ্রীগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা তুমি কোথায় পেলে যুবক?

॥ ১৫ ॥

অকম্পনের শরীরে বেদনার আরাম হয়নি, কিন্তু আর কোন পঙ্কিলতা নেই। সেই নরককুণ্ডের দুর্গন্ধ বিদূরিত হয়েছে সর্বাঙ্গে চন্দনের লেপনে। শরীরে বলবর্ধক বাতগ্নীর অনুভব, জিহ্বায় মধুসন্ধানের চনমনে স্বাদ। দুঃস্বপ্ন বুঝি শেষ হয়েছে। কিন্তু এ অতিথিভবনের সেই পরিচিত কক্ষ নয়। উন্মুক্ত আকাশের নীচে এ কোনও বাজিকরের ভোজবাজি বলেই মনে হচ্ছে।

মধ্যরাত্রের ভৌতিক পরিবেশে এক অপরিচিত ব্যক্তি, কোনও প্রেতাত্মা নয়, হয়তো তাকে সুস্থ করে তুলতে চাইছে, এই কথা ভেবে অকম্পনের মনে বল এসেছে। মনেপ্রাণে অনুভব করছে, তার এই একান্ত অসহায় অবস্থাতেও সে এই বৃদ্ধের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারে।

শুরু হল মধ্যরাত্রির এক অলৌকিক পরিমণ্ডলে দুই নাতিপরিচিত অসমবয়সির এক অনাবিল আলাপন।

অকম্পনের শরীর আঘাত ও ওষধির প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ রেখে কাহিনি শুনতে মন্দ লাগছিল না। প্রধানত বৃদ্ধই বলে চললেন, অকম্পন শুনতে লাগল। তার মনে রইল না পরিচয় শুধু কয়েক দণ্ডের। শুধু অনুভব করল বৃদ্ধ অসাধারণ মেধাবী এবং তাঁর কথায় জাদু আছে। অল্পক্ষণেই অকম্পনের দৈহিক কষ্ট কমে এল, আরোগ্যের অনুভব হতে লাগল।

বৃদ্ধের আচরণ বেশ অদ্ভুত। কে ইনি এখনও জানা যায়নি। তাঁর আচরণে উন্মাদের প্রক্ষিপ্ততা বিশিষ্টরূপে বর্তমান। কিন্তু কণ্ঠস্বরে আছে কর্তৃত্বব্যঞ্জক ব্যক্তিত্বের পরিচয়। ইনি কি কোনও চিকিৎসক? দেখে তো তেমন বোধ হয় না। অথচ কথার মাঝেই কখনও কখনও হঠাৎই তিনি অকম্পনের আঘাতপ্রাপ্ত স্থানগুলির এক এক জায়গায় স্পর্শ করে নিমীলিতনয়নে কী যেন অনুভব করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু অকম্পন সবিস্ময়ে দেখলো, বৃদ্ধ তার আহত স্থানটি স্পর্শ করা সত্ত্বেও তার তেমন ব্যথা অনুভব হচ্ছে না। যেন কোনও অদৃশ্য শক্তিবলে তিনি জানেন ব্যথার উৎসটিকে। সেটি সন্তর্পণে পরিহার করে রোগীকে এমন নিপুণভাবে পরীক্ষা করা কি কোন চিকিৎসকের পক্ষেও সম্ভব?

আলোচনার সূত্রপাত মহারাজ শ্রীগুপ্ত প্রচলিত প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে। বৃদ্ধ বললেন, যখন তোমাকে উদ্ধার করি, তোমার সারা শরীরে ছিল কাদার প্রলেপ, তাতে অনুলগ্ন ছিল কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা। সেগুলো তুমি কোথায় পেলে?

অকম্পন কোনও উত্তর দিতে পারল না। প্রশ্নের অর্থই তার বোধগম্য হল না। বৃদ্ধ তখন আপন পরিচ্ছদের কটিবন্ধ থেকে কিছু বার করে সম্মুখে তুলে ধরে বললেন, তুমি এইগুলো কোথায় পেলে?

অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। বৃদ্ধ সেইগুলো অকম্পনের হাতে দিলেন। কয়েকটা শীতল গোলাকার ধাতবখণ্ড। অকম্পন অনুভবে বুঝল এগুলো সেই অন্ধপুরীতে পাওয়া মুদ্রারই অনুরূপ, যেগুলো সে সেখানেই ফেলে দিয়েছিল!

—কী এগুলো? এবার অকম্পন জিজ্ঞাসা করে।

—মহারাজ শ্রীগুপ্তের প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা, বৃদ্ধ উত্তর দিলেন।

—ও আমার নয়। আমি ঐ পাতালপুরীর অন্ধকূপে এইরকম মুদ্রা আরও কয়েকটা পেয়েছিলাম। জানতাম না ওগুলো স্বর্ণমুদ্রা, ওখানেই ফেলে দিয়েছি।

—পাতালপুরী! ঐ গুহার মধ্যে? বৃদ্ধের প্রশ্নে কৌতূহলের সঙ্গে অল্প উত্তেজনার আভাষ, কোন পথে সেখানে গিয়েছিলে?

এ কথার উত্তর দিতে অনেক কথাই বলতে হবে। অকম্পনের সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা, শরীরের তাপমাত্রাও বেশি। উপঘাতে মুহ্যমান নিশ্চল হয়ে সে বেদনা থেকে পরিত্রাণ চাইছিল। বেশি কথা বলতে ইচ্ছা ছিল না। তাকে নীরব দেখে বৃদ্ধ পুনরায় বললেন, তোমার কি কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে? তাহলে থাক।

ক্ষিপ্রহাতে তিনি তার মুখে কিছু ওষধি ঢেলে দিলেন। কষায়স্বাদের ঔষধ কোনমতে গলাধঃকরণ করার অল্প সময়ের মধ্যেই অকম্পনের শরীরের বেদনাবোধ খানিক স্তিমিত হয়ে এলো। বৃদ্ধ বললেন, এবার কথা বলার মতো স্থিতি কি তোমার হয়েছে? যদি আয়াস করেও খানিকক্ষণ আরও চেতনায় থাকো, তাতে তোমার মঙ্গলই হবে। কথা বললে জেগে থাকতে সুবিধে হত।

কী বলবে অকম্পন? কোথা থেকে শুরু করবে? তার নিস্তরঙ্গ অতীত যেদিন শেষ হয়ে গেল, সেখান থেকে? নাকি এযাবৎ তার জীবনের সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক যে অভিজ্ঞতা আজ হোলো শুধু তাই এই অপরিচিতের নিকট ব্যক্ত করবে? সে কি বলবে, পর্বতচূড়া থেকে তার আপনা-আপনি পদস্খলন হয় নি? তার জীবননাশের উদ্দেশ্যে তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

—আমার কাছে নিঃসংকোচে সব কথা তুমি বলতে পারো। তবে বেশি কষ্ট হলে থাক, অকম্পন চুপ করে আছে দেখে বৃদ্ধ আবার বললেন।

অকম্পনের সম্মুখে অনাগত অজানা ভবিষ্যৎ। তাই তার আলোড়িত অতীতের উদ্ঘাটনে সংকোচের কিছুই নেই। জ্বরতপ্ত শুষ্ককণ্ঠে সে বলল, কষ্ট তো এখন আর শুধু আমার নেই ঠাকুর, তুমিও যে তা ভাগ করে নিয়েছ। তাই আমার কথা বলায় কোনও ক্লেশ নেই। আসলে কী যে ছাই বলব ঠিক বুঝতে পারছি না।

—অর্থাৎ বলার অনেক কিছুই আছে, বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত গলায় বললেন, কিন্তু মাথায় সব অবিন্যস্ত হয়ে গেছে। তা তোমার অতীতের কথায় আমার কাজ নেই। এই গুহায় কোন পথে প্রবিষ্ট হলে সেই তথ্যটুকু শুধু জানাতে পারবে কি?

—কালানের দুর্গে আমি অতিথি ছিলাম। সেখানকার প্রাচীন বধ্যভূমিতে এক আততায়ীর দ্বারা আক্রান্ত হই। সে আমাকে এক গোপন সুড়ঙ্গপথে পাতালে প্রবেশ করায়। অনেক কষ্টে সেই অন্ধকূপ থেকে নির্গত হয়েছিলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই।

রুদ্ধ আবেগে অকম্পনের শরীর কম্পিত হচ্ছিল। তাই দেখে বৃদ্ধ যেন উৎফুল্ল হয়ে বললেন, ব্যস ব্যস, আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। এবার তুমি আর কথা বোলো না। দুর্বল শরীরে তোমার অসুখ বৃদ্ধি পেতে পারে।

অকম্পন দেখল তার মস্তিষ্কের ধূসরতা কিছু অপসারিত হয়েছে, দেহ অসমর্থ হলেও কথা বলতে তেমন কষ্ট নেই। অল্পকথায় নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চাইল, যে স্বর্ণমুদ্রার কথা বলছিলেন তাহলে তা কোথা থেকে এল?

—শুনবে সে কাহিনি? তা মন্দ কথা নয়, এই বলে অকম্পনের মুখে সেই কষায় ওষধি আরও একটু ঢেলে দিয়ে বৃদ্ধ বললেন, জ্বরের প্রকোপে তোমার শারীরিক যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেতে পারে, তাই একটা ব্যথানিবারক জায়ুর প্রয়োগ করছি। এতে তোমার অঙ্গ অবশ হয়ে আসবে, ব্যথাবোধ কম হবে। কিন্তু এখন আরও কিছুক্ষণ তোমাকে জাগ্রত রাখা প্রয়োজন। আমি তোমাকে এই স্বর্ণমুদ্রার কাহিনি বলছি, তাই শুনে জেগে থাকার চেষ্টা করো।

এই বলে বৃদ্ধ বলতে শুরু করলেন, কালানের দুর্গ স্থাপনার অল্প পরেই এক ডাকাতদল সেই দুর্গের ধনাগার লুণ্ঠনের প্রয়াস করে। লুণ্ঠনে সফল হলেও তারা কিন্তু পালাতে পারেনি। প্রায় শতখানেক ডাকাতের সেই সম্পূর্ণ দলটি বন্দি হয় এবং তাদের প্রাণদণ্ড দেন মহারাজ। দুর্গপ্রাকারের বহিঃস্থ সেই বধ্যভূমিতে তাদের একযোগে সলিলসমাধি দেওয়া হয়। শিরি নদী তখন সেই পাতালগুহার তলা দিয়েই প্রবাহিত

ছিল।

প্রজন্মক্রমে এই ঘটনা আজ লোককথায় পরিণত হয়েছে। তুমিও হয়তো শুনেছ সেই রহস্যময় গল্প। রহস্যটি হল লুণ্ঠিত ধনরত্নের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। কিন্তু তোমার কথা শোনার পর এখন আমি নিঃসংশয় ঐ গুহায় প্রাপ্ত স্বর্ণমুদ্রাগুলোই হল সেই লুণ্ঠিত ধনরাশি!

একটু থেমে বৃদ্ধ বললেন, তোমাকে কাল যেখানে পাওয়া গিয়েছে, সেইস্থান থেকে গুহাভ্যন্তরের দিকে যেতে আরও ঐ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। আমার কর্মসারথিগণ এখনও অনুসন্ধান করছে ঐ নিবিড় গুহারন্ধ্রে। ওটাই ছিল সলিলসমাধির স্থান। নদীখাত সরে গিয়ে এখন গুহাপথ প্রকট হয়েছে।

অকম্পনের মনে আছে ঐ পাতালপুরীর ঘন শৈবালিত কর্দমাক্ত ভূমিকাভাগ জলে নিমজ্জিত থাকার অভিনির্দেশ। প্রাচীন কালের জমা জল বাষ্পীভূত হয়ে গেছে, রয়ে গেছে তার ক্লেদাক্ত অবশেষ।

বৃদ্ধ তখনও বলে চলেছেন, ঐ গুহাপথ উপরিতলের বধ্যভূমির সঙ্গে যুক্ত। এই তথ্য জানার পরেই আমার সন্দেহ সত্যে পরিণত হল। বুঝতেই পারছ, তুমি ঐ পাতালে যেখানে নিপতিত হয়েছিলে, ডাকাতদলও তারই কাছাকাছি পড়েছিল নিশ্চয়ই। অতএব লুণ্ঠিত ধনরাশিও ওখানেই থাকবে। এত বিপুল পরিমাণ শ্রীগুপ্তের মুদ্রা সেইস্থানে প্রাপ্ত হওয়ার আর কোনও কারণ থাকতে পারে না।

—কিন্তু ডাকাতদলের সঙ্গে তো কোনও মুদ্রা ছিল না?

—ছিল। স্বর্ণমুদ্রাগুলি ওখানেই প্রাপ্ত হয়েছে। তার অর্থ মুদ্রাগুলি ঐ ডাকাতদলের সঙ্গেই ছিল! মনে হচ্ছে আমি কিছু অনুমান করতে পারছি।

—কিন্তু তারা অবশ্যই রিক্তহাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। মুদ্রা তাদের সঙ্গে থাকবে কী করে? দণ্ডের পূর্বে তাদের শরীরের তল্লাশি হয়নি কি?

—নিশ্চই হয়ে থাকবে। কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি। তার অর্থ বহিরঙ্গে নয়, মুদ্রাগুলো শরীরের সঙ্গে এমনভাবে সংযুক্ত ছিল, যাতে তা দৃষ্টিগোচর হয় না। কোথায় ছিল জানো? তাদের কণ্ঠনালীতে!

পীড়ার যাতনার মাঝেও কৌতুক অনুভব করে অকম্পন। বৃদ্ধ কিন্তু রসিকতা করছে বলে মনে হয় না। সে তখন বলে চলেছে, আমি জীবনসন্ধানী, অকম্পন। একসময়ে উজ্জয়িনীর বাসিন্দা ছিলাম। প্রাণিদেহের মাঝে জীবনের উৎস নিয়ে অল্পবয়সেই আমার আগ্রহ উৎপন্ন হয়। অথর্ববেদ ও চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুপুঙ্খে অধ্যয়ন করেছিলাম। মানুষের শরীর একবার প্রাণশূন্য হলে আর কিছুই করা যায় না। কিন্তু যতক্ষণ প্রাণকণিকা অবশিষ্ট থাকে, তাকে উজ্জীবিত করবার অনেক সূত্র খুঁজে পেয়েছি। প্রাণীদেহের জীবন ও মৃত্যুরহস্য নিয়ে বিস্তর অনুসন্ধান করেছি। মানুষের কণ্ঠনালীর মধ্যে ছোট কোনও বস্তু লুকিয়ে রাখতে পারা যায়। গলাধঃকরণ করা বস্তু পাকস্থলীতে যায় না, গলার কাছেই থেকে যায়। ইচ্ছামতো তা আবার উদ্গীরণ করে নেওয়া যায়। অনুশীলনে এই বিদ্যা রপ্ত করা সম্ভব। উত্তরাপথে আহৃত একটা পুরাতন পুঁথিতে পেয়েছিলাম এক বনজ উপজাতির কথা, যারা এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় নিজেদের কণ্ঠনালীর মধ্যে এক ফলের বীজ ধারণ করতো। একরকম জংলা ফল ছিল তাদের খাদ্য। সেই ফলের বীজ তারা সংরক্ষণ করত, চূর্ণ করে খাদ্যরূপে ব্যবহার করার জন্য। অনেকগুলি বীজ একসঙ্গে আহরণ করে আনার জন্য তারা এই বিদ্যা অভ্যাস করেছিল। ফলটি ভক্ষণ করে তার বীজ কণ্ঠনালীতে নিয়ে গৃহে এসে আবার তা উদ্গীরণ করে সঞ্চয় করত।

—তার সঙ্গে কালিঙ্গড়ের ঘটনার কোনও যোগসূত্র আছে কি?

—আন্দাজ করছি—আছে। আশ্চর্য লাগছে? লাগবারই কথা। কিন্তু কালিঙ্গড়ের এতগুলো রহস্যময় জীবন নাশ আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বিচারণে। আমার সিদ্ধান্ত ঐ ডাকাতদলের সকলেই কণ্ঠনালীতে বস্তু ধারণের বিদ্যা রপ্ত করেছিল। লুণ্ঠিত স্বর্ণমুদ্রাগুলি দুই-তিনটি করে তারা নিজেদের কণ্ঠে ধারণ করেছিল। তল্লাশিতে তাই কিছুই পাওয়া যায়নি।

প্রহর গড়িয়ে চলল। দারুকল্প কথা বলছেন। মাঝে মাঝে চলছে রোগীর শুশ্রূষা। কখনও ওষধি পান করাচ্ছেন, কখনও লেপ লাগাচ্ছেন, কখনও বা নাড়ির গতি পরীক্ষা করছেন।

বৃদ্ধের কথাগুলি ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। অথচ তাঁর প্রত্যয় দেখে অকম্পনের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়েছে। জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি নিশ্চিত ঐগুলো সেই মুদ্রা?

—হ্যাঁ, আমি পরীক্ষা করে দেখেছি মুদ্রাগুলি। শতাধিক বর্ষ আগে মহারাজ শ্রীগুপ্ত প্রবর্তিত সেই মুদ্রা আমি চিনি। কারণ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এইরকমই দুটি মুদ্রা আমাদের পূর্বজের পুণ্যস্মৃতিরূপে আজও আমাদের ঘরে বিরাজ করছে। কি করে তা আমাদের পরিবারে আসে সেও এক রহস্যময় ঘটনা। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে গেল সেই ইতিহাস। শুনবে নাকি? শোনো, তাহলে আরও খানিকক্ষণ তোমার জেগে থাকতে সুবিধে হবে।

বৃদ্ধ যে চমকপ্রদ বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন তা এই...

পুরুষানুক্রমে আমাদের পরিবারে এই কাহিনি প্রচলিত ছিল। আমাদের এক বহু পূর্বতন পূর্বপুরুষ, তিনি সম্পর্কে আমার পিতামহের পিতৃব্য, যৌবনকালে গৃহত্যাগ করেছিলেন। অনেক বছর নিরুদ্দিষ্ট থাকার পরে তিনি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এই দুটি মুদ্রা নিয়ে। তাঁর শরীর তখন বিধ্বস্ত ও বাকশক্তি লোপ পেয়েছিল। তিনি ঐ দুটি মুদ্রা পরিবারে দান করেছিলেন। হয়তো জানাতেও চেয়েছিলেন কীভাবে তিনি সেটি পেয়েছেন। বারংবার নিজের কণ্ঠদেশ নির্দেশ করে ইঙ্গিতে কিছু বলতে চাইলেন। পাগলের প্রলাপ ভেবে কেউ তাঁর কথা গ্রাহ্য করেনি। অল্পকাল মধ্যেই তাঁর দেহান্ত হয়, রয়ে যায় সেই রহস্যময় উত্তরাধিকার।

আমি অনুসন্ধান করে জানতে পারি, আমার এই পূর্বপুরুষ কালান দুর্গের লুণ্ঠনকারী ডাকাতদলের এক সদস্য ছিলেন। ভাগ্যক্রমে তিনি সলিলসমাধির পরেও জীবিত ছিলেন, সম্ভবত একমাত্র ব্যক্তি। কিন্তু শিরে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তিনি উন্মাদ হয়ে যান। কিছুকাল পরে তিনি গৃহে ফিরেছিলেন।

আমার পূর্বপুরুষ কীভাবে সেই মুদ্রা পেয়েছিলেন জানা যায়নি। এতোদিন পরে বুঝতে পারছি সেই একই প্রক্রিয়ায় তিনি এই মুদ্রা কণ্ঠস্থ করেছিলেন। তিনি মুদ্রার প্রাপ্তিরহস্য বলে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাষা ছিল না। হতভাগ্য যা বলে যেতে অক্ষম ছিলেন, আপন কণ্ঠের দিকে ইঙ্গিত করে বোঝাতে চেয়েছিলেন।

বহু পুরাতন ইতিহাসের অন্ধকারে নতুন আলোকপাত হল! আমি এ সম্ভাবনার কথা ভেবেছি, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল না। আমার অনুমান যে সঠিক তার নির্ভুল প্রমাণ আজ পেলাম। কালান দুর্গের বধ্যভূমির নিকটবর্তী এই মুদ্রার ভাণ্ডার নির্দেশ করে এছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

কাহিনি শেষ করে তিনি বললেন, তুমিও ভেবে দেখো এই হল সবচেয়ে সঙ্গত ব্যাখ্যা। যাক, এবার তুমি নিদ্রা যেতে পারো।

অকম্পনের মস্তিষ্কে যুক্তি-পরম্পরাবোধ প্রখর ক্রিয়াশীল ছিল না, তবু সে অনুভব করে সব ঘটনাগুলির এর চেয়ে সুচারু ব্যাখ্যা বোধহয় সম্ভব নয়। সুদূর অতীতের সেই নারকীয় ঘটনার অভ্যন্তরীণ রহস্য শতবর্ষ পরে এইভাবে উন্মোচিত হবে কে ভেবেছিল?

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ নিমীলিত নেত্রে অকম্পনের নাড়ী পরীক্ষা করছিলেন। খানিক ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকার পর তিনি আবার স্বাভাবিক হয়ে মুখে একটি সন্তোষজনক শব্দ উচ্চারণ করলেন। তারপর বললেন, তোমার শরীরের যা অবস্থা ছিল, আমি যথাসময়ে এসে না পড়লে এতক্ষণে...তবে এখন বিপদ কেটেছে। হ্যাঁ, এই রাতের মধ্যে তোমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবার মতো সুস্থ করতে পারব বলে মনে হয়। সৌভাগ্যক্রমে তোমার বাম হাত আর পদদ্বয়ের আঘাত তেমন গুরুতর নয়। এদের সাহায্যে ভোররাতের মধ্যেই তুমি চলৎশক্তি ফিরে পাবে।

বৃদ্ধের কণ্ঠে প্রতীতি, নিদানগুলি উচ্চারণ করলেন প্রগাঢ় প্রত্যয়ে। অকম্পন মন্ত্রমুগ্ধ। এই বিকট পতনজনিত পরিলোপ রাত্রির মাত্র কয়েক প্রহরে উপশম করার আশ্বাস দিচ্ছেন কে এই ব্যক্তি? আর সেই অজ্ঞাতনামা অপ্রকৃতিস্থ বৃদ্ধ কেনই বা করছেন তার উপচার? কোথায়ই বা নিয়ে যাওয়ার কথা বলছেন?

অবশ্য যেখানেই হোক, প্রতিবাদ করে লাভ নেই। সে প্রবৃত্তিও হল না তার। অকম্পনের মস্তিষ্ক আর পুরোমাত্রায় কর্মক্ষম ছিল না। জায়ুর ক্রিয়া শুরু হয়েছিল। শেষদিকে দারুকল্পের কথাগুলো সঠিক অনুধাবন করছিল কিনা সন্দেহ।

বড় রহস্যময় এই ব্যক্তির আচরণ। পরম যত্নে সে অকম্পনের সেবা

করছিল, অথচ প্রকৃত মমতায় তা করছিল বলে বোধ হয় না। জীবন সন্ধানী সে, এ কথার অর্থ বোধগম্য হয় না। ভিষজ নয়, বৈদ্য নয়, অসুখের নিদান করে না সে। শুধু প্রাণের অবশেষ অনুসন্ধান করাই তার নেশা। সামান্যতম প্রাণের উপস্থিতিকে সে সম্পূর্ণ আরোগ্যের রূপ দিতে পারে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবনের অবশেষ থেকে পূর্ণস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারই তার লক্ষ্য। মানুষের মাঝে কণামাত্র প্রাণের সন্ধান করে ফেরে, এ কেমন চিকিৎসক?

একসময়ে বৃদ্ধ বলে, তুমি আরোগ্য হবে অকম্পন। তোমার হৃদয়ে আমি প্রাণের স্পন্দন প্রতিস্থাপিত করেছি। আশুব্ধ এরপর সহজেই তোমাকে সুস্থ করে তুলবে।

তারপর অকস্মাৎই এক সুউচ্চ অহমিকায় ঘোষণা করেন, আমি তোমাকে জীবনদান করলাম। মুমূর্ষু রোগীকে যে পুনর্জীবিত করে সেই পুনরুজ্জীবিত প্রাণি তারই! তার জীবন-মৃত্যুর অধিকার সে অর্জন করে। তুমি আমাদের সমাজেরই একজন হবে। তুমি তোমার জগতে আর ফিরে যাবে না।

কর্তৃত্বব্যঞ্জক স্পর্ধাবাক্য! কথাগুলো অকম্পনের অন্তরাত্মাকে একবার কম্পিত করে যায়। যদিও অসুস্থ শরীরে সে এই অহংকারী আদেশবাক্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

ততক্ষণে ওষধির ক্রিয়ায় স্বপ্ন-বাস্তবের রুনু-ঝুনু শুরু হয়েছিল তার মস্তিষ্কের কোষে কোষে। রোমাঞ্চকর অতীতকথার কিছু বুঝল, কিছু রয়ে গেল অধরা। দু'চোখে অমোঘ নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছিল। আচ্ছন্ন অবস্থায় সে শুনতে পেলো অনতিদূর থেকে তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বৃদ্ধ পুনরায় বলছেন, হ্যাঁ, এখন থেকে জেনো আপন পরিচিত বৃত্তে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা তোমার বৃথা। কোনওদিন সে চেষ্টা করার ভুল কোরো না যেন।

অকম্পনের মন চঞ্চল হল, যদিও কথার অর্থ তার চেতনার স্তরে প্রবিষ্ট হল না। বৃদ্ধ কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। অতঃপর কোমলস্বরে বললেন, আর কথা নয়। এবার তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোবার প্রয়াস করো।

এই বলে তিনি উঠে পড়লেন। অকম্পন নিদ্রাতুর স্বরে প্রশ্ন করলো, আর আপনি?

—আমি যাচ্ছি। একটা বনস্পতির প্রয়োজন, মনে হয় নিকটেই পেয়ে যাব। ভয় নেই, আমি ওষুধ ছড়িয়ে দিয়েছি। কীটপতঙ্গ বন্যপ্রাণী এখন এদিকে আসবে না। তুমি চিন্তিত হোয়ো না, অবিলম্বেই ফিরব।

—আপনার বিশ্রাম?

—কাজের সময় দারুকল্পের বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। প্রহরে-প্রহরে তোমার সেবা প্রয়োজন, আমি ঘুমিয়ে পড়লে বিপদ ঘটতে পারে। তাই ফিরে এসে আমি এইখানেই পদচারণ করব।

কী বলবে অকম্পন? বৃদ্ধ মানুষটি অকাতরে বললেন, তিনি তার সেবায় রাত্রি জাগরণ করবেন। একটা হীনম্মন্যতা গ্রাস করতে চাইছিল অকম্পনকে। কিন্তু ক্রমশ তার চিন্তাশক্তি শিথিল হয়ে এল। বৃদ্ধ নিজের পরিচয় দেননি, কিন্তু আজানিতেই বুঝি নামটা জানিয়ে ফেলেছেন। আর তা ভুল হবে না। অকম্পনের মস্তিষ্কে দূরাগত ঘণ্টাধ্বনির মতো ক্রমাগত বেজে চলল সেই নাম, দারুকল্প, দারুকল্প! অল্পক্ষণেই গভীর নিদ্রামগ্ন হল সে।

রাতের অন্তিম প্রহরগুলি যথানিয়মে পার হয়ে গেল। সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে অকম্পন গভীর সুষুপ্তির জগৎ থেকে ফিরে এল। নিস্তব্ধ চরাচর তখনও প্রশান্ত। আকাশে হালকা নীলাভাস, পূর্বপ্রান্তে তরুণ অরুণিমা। একটি-দুটি পাখির কূজন জানাচ্ছে আর এক নবদিবসের আবির্ভাব লগ্ন সমাসন্ন। নিদ্রোত্থিত অকম্পন অজানিতেই পার্শ্ব পরিবর্তন করতে যায়। পারে না, স্কন্ধমূল টনটন করে ওঠে। তবে পূর্বাপেক্ষা বেশ কম। নিঃশেষ না হলেও বেদনা অনেকটা প্রশমিত মনে হল। শরীরেও অপেক্ষাকৃত শীতলতার অনুভব। হস্ত সঞ্চালিত করে অকম্পন বুঝতে পারে তখনও তার শরীরের বন্ধন কাটেনি। অসুখের আরোগ্য হয়নি, কিন্তু অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। আকাশের অন্ধকারের সঙ্গে ব্যাধিও ফিকে হয়ে এসেছে।

রাত্রের ছবিটি যেন অনেক দূরের। দেহের যন্ত্রণার সঙ্গে জড়ানো কথাগুলোর স্মৃতি অস্পষ্ট ভাবে মনে এলো। গুপ্তধন, ডাকাতদের কণ্ঠনালী, জীবনসন্ধানীর জীবনসাধনা... এক রাত্রের মধ্যে এতখানি শারীরিক উন্নতি অকম্পনের চিকিৎসাবুদ্ধির বাইরে। কী প্রয়োগ করল ওই জীবনশিল্পী? সে কি কোন দৈব ওষধি নাকি তার ঐ কথাগুলো?

গ্রীবা হেলিয়ে আশেপাশে বক্তার দর্শন পেল না অকম্পন। অনেকটা দূরে নদীতীরে একটা মনুষ্যমূর্তি। ভাঁটার টানে নদীর জল সরে গেছে। জেগে ওঠা সিক্ত নদীবক্ষে মানুষটি ধীরে পদচারণা করছেন। মাঝে মাঝে নীচু হয়ে ভূমি হতে কিছু তুলে নদীজলে নিক্ষেপ করছেন।

লোকটিকে চিনতে অসুবিধা হল না অকম্পনের। তার জীবনদাতা। এখন বোধহয় জলজ প্রাণীদের জীবনদান করছেন।

নদীর জল বৃদ্ধি পাচ্ছিল। দারুকল্প ক্রমে সরে আসছিলেন। অল্পক্ষণ পরে অকম্পনের নিকটে এসে তিনি প্রশ্ন করলেন, এখন কেমন বোধ করছ অকম্পন?

—অনেক ভাল, অকম্পন বলে, শরীরে ব্যথা আছে কিন্তু এমন ভাল অনেককাল অনুভব করিনি।

—আশুব্ধ তিন দিবসে তোমাকে রোগমুক্ত করে দেবে। তোমার পরমায়ু আছে তাই সঠিক সময়ে আমার নজরে পড়েছ। তোমার প্রাণস্পন্দন যে স্তরে ছিল, আর কোনও চিকিৎসক তোমাকে বাঁচাতে পারত না।

পরম শ্লাঘার বাণী, কিন্তু অকম্পন জানে তা মিথ্যা নয়। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে সে জিজ্ঞাসা করল, আপনার অনুকম্পায় আমি কৃতজ্ঞ। নদীতীরে কী করছিলেন আপনি?

—জলের বাইরে কতকগুলো মুমূর্ষু প্রাণ! দারুকল্পের স্বরে মমতা নয়, একটা নিরাসক্ত প্রত্যয়ের সুর, তাদের আবার জীবনে ফিরিয়ে দিচ্ছিলাম।

—কিন্তু এ তো ব্যর্থ প্রয়াস, অকম্পন বলে, কতগুলো প্রাণই বা আপনি রক্ষা করবেন? এ করে কী লাভ?

—অকম্পন, যে প্রাণগুলো রক্ষা পেল তাদের সম্যক লাভ। আর আমার লাভ ওই ক'টা প্রাণের আলোক দেখতে পাওয়া। অন্ধকারে অপ্রয়োজনেও প্রদীপ কেন জ্বালো অকম্পন? কিছুটা অভ্যাস। জীবনান্ধকারে প্রাণের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করাটা আমার একটা অভ্যাস। কিন্তু এখন সময় কম, সূর্যোদয়ের বিলম্ব নেই। তুমি একইভাবে প্রতীক্ষা করো আর কিছুক্ষণ। আশুব্ধ এখনই এসে যাবে। তোমাকে সুস্থ করে তোলার ভার তার, সে তোমাকে যথাস্থানে নিয়ে যাবে।

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে নদীর দিকে অগ্রসর হলেন। সূর্যপ্রণাম করবেন। অকম্পন দেখল ইতিমধ্যেই জল আগুয়ান হয়ে এসে তটিনীকে কূলে কূলে ভরিয়ে দিচ্ছে।

॥ ১৬ ॥

রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাতের আলো আসছে গবাক্ষের পথে। নদীতীর নয়, একটা দারুকক্ষের মধ্যে কাপাশ-শয্যায় নিজেকে শায়িত দেখল অকম্পন। বেলা হয়ে গেছে, ঔষধিযুক্ত নিদ্রাভঙ্গ হতে বিলম্ব হয়েছে।

—আমাদের কী ভাগ্য, তোমার তা হলে জ্ঞান ফিরেছে, একটা নারীকণ্ঠস্বরে চকিত হল অকম্পন, এখন কেমন বোধ করছ ঠাকুর?

অনার্য রমণীটির নাম কণটী! অদ্ভুত নাম, কণটী, হলাহল! কৃষ্ণাঙ্গী, কিন্তু অপাঙ্গ যৌবনবতী দেহলতাটি যেন কোনও শিল্পীর হাতে নির্মিত ভাস্কর্যের মতো। কোথাও এতটুকু ত্রুটি নেই। মুখশ্রীতে এক অনাবিল সরলতা। এমন কন্যার নাম কণটী হয় কেন? জিজ্ঞাসা করতে সেই উত্তর দিয়েছিল, আমি যে বিষকন্যে গো। জন্মের পরেই বাপ-মা ভাসিয়ে দিয়েছিল। রেবট-ঠাকুর বাঁচিয়েছিল। আর নাম রেখেছিল কণটী। গরল-কন্যের এই নামই তো ভাল।

আশুব্ধ বলে, ঠাকুর যাদের বাঁচান, তাঁরা আর সংসারে ফিরে যায় না। আমি তো বলি, যাদের আর কোথাও যাওয়ার নেই তারাই ঠাকুরের হাতে জীবন পায়। আমার কথাই ধরো। ভিষজই ছিলাম, এক চিকিৎসা-বিভ্রাটে মৃত্যুদণ্ড পেয়েছিলাম। হাতির পায়ের তলায় বাঁদিকের পাঁজর ক'টা ভেঙেছিল। তারপরেই পাগলা হাতিটা এক লাথি মেরে ছুঁড়ে আমায় জঙ্গলে ফেলে দিয়ে পালায়। আমি মরে গেছি ধরে নিয়ে

জল্লাদেরা আর খোঁজ করেনি। কিন্তু মরিনি। হাত আর পাও ভেঙেছিল, প্রাণটা বেরোবার মুখেই ঠাকুর দেখতে পান। রেবট-ঠাকুর জীবনশিল্পী। বাঁচিয়ে তুললেন।

কণটী অকম্পনকে বলে, ভাগ্যে রেবট-ঠাকুর তোমাকেও দেখতে পায়। তুমি তো সেথায় অচৈতন্য হয়ে হাত-পা ভেঙ্গে পড়েছিলে, রক্ত আর কাদামাখা। ঠাকুর তোমাকে বাঁচিয়ে দিলেন। তুমি আমাদের নতুন ঠাকুর। আচ্ছা, কী হয়েছিল তোমার? সন্ধ্যার সময়ে নদীর ধারে অত দূরে কি করছিলে গো?

বড়ই অরুচিকর সে প্রসঙ্গ, অকম্পন ভুলে যেতে চায়। যথাসম্ভব অল্পকথায় তার পাতালপ্রবেশ পর্ব বিবৃত করে কণটীর কৌতূহল নিরসন করে। সশঙ্কিত বিস্ময়ে গালে হাত দিয়ে কণটী বলল, ওমা—কি সর্বনাশ! কে সেই পাষণ্ডটা? এখনি ঠাকুরকে বলে তাকে শূলে দেবার ব্যবস্থা করছি।

—তুমি তাকে চিনবে না, পঞ্চকর্ণ নাম তার...

আশুঙ্কের ওষধি আর কণটীর সেবায় অকম্পন তিন দিনেই আরোগ্য হয়েছে। জ্বর নেই। হাত-পায়ের ভগ্নাস্থি এখনও লৌহবদ্ধ, কিন্তু ভিতরে অস্থির উপচার হয়েছে। তারপর আরও এক সপ্তাহ কেটে গেছে। এখনও শরীরের গ্রন্থি-সন্ধিতে বেদনা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়নি, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক সঞ্চালনে কোনও বাধা হয় না। আশুঙ্ক নিয়মিত তাকে যষ্টিভর করে চলা-ফেরা করায়।

অকম্পন জীবনশিল্পীর আর এক চমৎকার। মৃত্যুর মুখ থেকে দারুকল্প যাদের ফিরিয়ে আনে, তারা তাদের জীবন-মৃত্যুর অধিকার সঁপে দেয় তাদের জীবনদাতার হাতে। আর কোনও দক্ষিণা সে গ্রহণ করে না।

অকম্পন অকৃতজ্ঞ নয়, কিন্তু এই প্রথাগত শর্ত সে মেনে নিতে পারে না। কী করে তা সম্ভব? তার গৃহে মা আছেন, পল্লীতে বন্ধুরা আছে, আশ্রমে আচার্য, তার নতুন সংসার...সেসব ছেড়ে সে কি এইখানে বন্দি হয়েই থেকে যাবে?

আশুঙ্ককে প্রশ্ন করে অকম্পন, এ কেমন নিয়ম বন্ধু? কেমন গোষ্ঠী তোমাদের? তোমরা আপত্তি কর না?

—কেউ করে না। বহির্জগতের জন্যে তারা তো মৃত। কোথায় যাবে?

—কেন? সবারই পিতা-মাতা, স্বজন, গৃহ...

—কিছুদিন মনে থাকে। ছেড়ে থাকতে কষ্ট হয়। তারপর সব ঠিক হয়ে যায়। কেন, তোমার মনে হয় না, যে তোমাকে নবজন্ম দিল তার এইটুকু অধিকার আছে?

অকম্পন ভেবে পায় না কী বলবে। আশুঙ্কই আবার বলে, এখানে তোমার কোনও অভাব হবে না। জীবিকার চিন্তা নেই, তুমি তোমার খুশিমতো যে কোনও কাজ করতে পারো, কৃষি, অধ্যয়ন, ব্যবসায়, ক্রীড়া, গার্হস্থ্য...

—গার্হস্থ্য!

—সুদেহিনী কন্যার অভাব নেই আমাদের সমাজে। তুমি তোমার ইচ্ছে মতো কন্যা পছন্দ করে গার্হস্থ্য জীবন পালন করো। কেউ বাধা দেবে না। এই তো, কণটী এখানেই আছে। ওকে যদি তোমার পছন্দ হয়! কিরে কণটি, নতুন ঠাকুরকে বিয়ে করবি?

কণটী কলহাস্য করে বলে, ওমা কেন করব না? রেবট-ঠাকুর বললেই করি।

অকম্পন স্তম্ভিত হয়ে যায়। এই আদিম সমাজের সংস্কারে তার বিবমিষা হয়। অথচ অপরত্রে এরা তার পরম শুভানুধ্যায়ী, অশেষ যত্নে তার শুশ্রূষা করছে। তাদের সরল মূল্যবোধে আঘাত করতেও বড় সংকোচহয়।

অকম্পন ত্বরিতে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে আশুঙ্ককে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, কেউ পালিয়ে যেতে চায় না?

—এখনও তো কেউ চায়নি। আর চাইলেও পালাতে পারে না।

—কেন? বন্দি করে রাখা হয়? প্রহরী তো নেই?

—প্রহরী নেই। কিন্তু তোমার বন্ধুরাই দৃষ্টি রাখে। তারা ফিরিয়ে আনে।

কথাটা বোধহয় খুব মিথ্যা নয়। অকম্পন গত কয়েকদিনে প্রয়াস

করেছে এই গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে যেতে। কোথায় সে আছে তা জানা নেই, তাই কোথায় যেতে হবে তাও না। উদ্দেশ্যহীন ভাবে এক এক দিকে গিয়ে দেখেছে। প্রতিবারই কেউ না কেউ তাকে দেখেছে। তারা কোনও দুর্ব্যবহার করেনি। মিষ্টকথায় ভুলিয়ে আবার এই কক্ষে এনে হাজির করেছে। কোথাও কোনও প্রহরা বা বাধা নেই, কিন্তু যেন একটা অদৃশ্য গণ্ডি টানা আছে, তার বাইরে যাওয়ার উপায় নেই।

এরা সেবা দিয়েছে, শুশ্রূষা করেছে। এত সহৃদয় ব্যবহারের বিনিময়ে রূঢ়তা দেখাতে পারেনি অকম্পন। কিন্তু মনে মনে মানতে পারেনি। এখনও সে যথেষ্ট সবল নয়। দৌড়বার ক্ষমতা নেই। বাহু শক্তিহীন। আরও শক্তিসঞ্চার হলেও কি সে পারবে না এই নিগড় ভাঙতে? আশুঙ্ক তার মনের ভাব বুঝতে পেরেই যেন বলেছে, সে চেষ্টা না করাই বোধহয় ভাল। এখনও অবধি প্রয়োজন হয়নি, কিন্তু জেনে রেখো যে তোমার জীবন দিয়েছে, সে তোমার জীবন নিতেও পারে।

উন্মাদ! অকম্পন জেনে গেছে, এক উন্মাদের অধীন হয়েছে সে। কিন্তু কেন? কেন সে জীবন রক্ষা করে? বন্দিদশায় সে জীবন সমাপ্ত করে তার কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয়?

দারুকল্পের সকলই রহস্যময়। তার বয়স কত কেউ জানে না, তবে শতাধিক হলেও আশ্চর্য নয়। শীর্ণ কায়ায় তার এখনও অটুট স্বাস্থ্য। সেই রাত্রের পরে আর তার দেখা পায়নি অকম্পন। আশুঙ্ক জানিয়েছে,

দিবালোকে ঠাকুর প্রচ্ছন্নই থাকেন। মৌন থাকেন। প্রায়শই বনে-জঙ্গলে ভ্রমণ করেন। সূর্যাস্তের পরে কচিৎ তাঁর দর্শন পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় নির্দেশ-কর্মাদি তখনই সম্পাদন করেন।

অকম্পন আশুল্ককে প্রশ্ন করেছে, কী এই বৃদ্ধের অভিপ্রায়? কি উদ্দেশ্য তোমাদের গোষ্ঠীর?

—ওভাবে বলছ কেন ভাই? আশুল্ক সভক্তিতে জানায়, তুমিও তো আমাদেরই একজন। ঠাকুরের অভিপ্রায় বড়ই গূঢ়। যথাসময়ে তুমি সব জানতে পারবে।

—আমার কৌতূহল আর বাড়িও না আশুল্ক, অকম্পন অধৈর্য হয়ে বলে, দয়া করে তুমি এখনই আমাকে সব বলে দাও।

আশুল্ক একটু সময় নিয়ে কিছু ভাবে। তারপর গম্ভীর স্বরে বলে, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল গুপ্তবংশের বিরোধিতা করা!

এ কোন জায়গা অকম্পন জানে না। কিন্তু সম্মুখের নাতিবৃহৎ প্রান্তরের পারে কালান গড়ের চূড়া দৃশ্যমান, অর্থাৎ জয়স্কন্ধাবার থেকে এ অঞ্চলের দূরত্ব খুব বেশি হবে না। গুপ্তসাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে গুপ্তবংশের বিরোধিতা করা! এ কী অদ্ভুত কথা। কী রহস্য এই উন্মাদ বৃদ্ধের অতীতে লুকিয়ে আছে?

আশুল্ক সে রহস্যের উন্মোচন করেনি। প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বলেছে, চলো বন্ধু, তোমার ওষধি প্রয়োগের সময় হল।

আশুল্ক রাত্রে যে ঔষধ দিত, তাতে অকম্পনের নিদ্রা গভীর হত। কিন্তু প্রভাতেও বেশ কিছুক্ষণ তার ক্ষমতা বজায় থাকত। মস্তিষ্ক শিথিল হয়ে থাকত, আর শরীরে জড়তা। প্রভাতে আশুল্ক এসে এক বলবর্ধক প্রতিযোগ প্রয়োগে অকম্পনের নিদ্রাবেশ দূর করত।

সেদিন ত্বরিতে শয্যাত্যাগ করতে গিয়ে অকম্পন দেখে, কটিসন্ধি ব্যথায় টনটন করে উঠলো। কণটী শশব্যস্ত হয়ে বলে, ব্যথা করছে? আচ্ছা, তাহলে থাক এখন উঠো না ঠাকুর। আশুল্ক তোমায় পরীক্ষা করে আগে ওষুধ দিক, তারপর উঠো। তিনি শীঘ্রই আসবেন।

মস্তিষ্ক ধূসর হয়ে আছে। বারে বারে মনে হচ্ছে, এসব বাস্তব তো? প্রকাশ্য দিবালোকে সম্মুখে কণটীকে সে দেখতে পাচ্ছে, এ কি মিথ্যা হতে পারে? অকম্পন ক্ষীণস্বরে কণটীকে বলল, ও ব্যথা কিছু নয় কণটি। আর একটা দুর্বিষহ দিনের শুরু।

—থামো থামো ঠাকুর, এই কথা নিয়ে আর দুঃখ কোরো না। আজ তোমার জগৎ থেকে একজন এসেছে। তোমার দর্শনার্থী। যদি সুস্থবোধ করো তাহলে চলো, তোমাকে নিয়ে যাই।

অকম্পনের জগৎ থেকে? অর্থাৎ এই উন্মাদ গোষ্ঠী বহির্ভূত কেউ? কণটীকে বলল, নিশ্চই। কে সে? আমাকে এখনই নিয়ে চল কণটি।

প্রশ্ন করে নিজেও চিন্তা করতে থাকে অকম্পন, কে হতে পারে সেই

ব্যক্তি। কণটী তার হাত ধরে নিয়ে গেল দূরে আর এক কক্ষে। স্থানান্তরে যাবার সময়ে এরা অকম্পনের চক্ষু বেঁধে দেয় বস্ত্রখণ্ডে। তাই পথ চিনে রাখা সম্ভব নয়। কণটী যখন তার চোখের বন্ধন খুলে দিল, অকম্পন দেখে সে একটা অপরিচিত কক্ষে এসে উপস্থিত হয়েছে।

—কে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে কণটি?

—বলল তোমার দেশের লোক, বন্ধু। নাম বলেনি। নিজেই দেখে নাও। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কণটী বিদায় নেবার কিছু পরেই যে অকম্পনের কক্ষে প্রবেশ করল, তাকে যে এখানে দেখতে পাবে এ কল্পনা সে করেনি। তাকে দর্শনমাত্র মস্তিষ্ক তোলপাড় করে একটিই কথা স্মরণ করতে পারল অকম্পন— বিশ্বাসঘাতক। বক্ষোপরি দুইহাত জড়ো করে সহাস্যমুখে তার সম্মুখে দণ্ডায়মান আর কেউ নয়—রবিস্তোত্র!

—আমি এখানে এসেছিলাম, কিছু সামগ্রী সরবরাহে। এদের সঙ্গে আমার ব্যবসায়িক বিনিময়-ব্যবস্থা আছে। মাঝে মাঝেই আসি। এবার এসে সংবাদ পেলাম, আপনি এখানে! তাই রাজধানীতে ফিরে যাবার আগে আপনার কুশল সংবাদ না নিয়ে যাত্রা শুরু করতে মন সরছিল না।

অভিনয় মন্দ নয়। অতিশয় নম্রভাষণে বক্তার প্রকৃত পরিচয় জানার উপায় নেই। অবশ্য কে না জানে, মিষ্টবাক্য দুর্বৃত্ত তস্করের এক স্বভাবসিদ্ধ চাতুর্য। কিন্তু রবিস্তোত্রের নির্লজ্জতার যেন সীমা নেই। দুই দিন পূর্বে যাকে সর্বস্বান্ত করে অসহায়ভাবে বিপদের মুখে পরিত্যাগ করেছে, তারই সম্মুখে দন্তবিকশিত করে বিনয়বাক্যে শিষ্টতার স্পর্ধা দেখাচ্ছে। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয় অকম্পন।

রবিস্তোত্র বলছে, কালিঙ্গড়েই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তার পূর্বেই আপনি সেখান থেকে নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিলেন। আপনার তৈজস-সামগ্রী আমি সেখানে গচ্ছিত করে এসেছি।

নির্লজ্জ কথা বলছে, যেন কিছুই হয়নি। অম্লান বদনে চৌর্যবস্তু প্রত্যর্পণের সংবাদ দিচ্ছে। অকম্পন কৃতার্থ বোধ করল না, শিষ্টভাষণে প্রভাবিতও হল না। শুধু লজ্জাহীনতার অন্তরালে শঠ ব্যক্তিটির নিপুন বাক্যবিন্যাসে বিস্মিত হয়ে আবার ফিরে তাকাল রবির উদ্দেশ্যে।

মিটিমিটি হাসিতে উদ্ভাসিত রবির মুখমণ্ডল, প্রসন্নস্বরে বলল, আপনার অসন্তোষ অকারণ নয়। অবশ্যই স্বীকার করি, যে আচরণ আপনার সঙ্গে আমি করেছি সাধারণ অবস্থায় তা আদৌ অনুমোদনযোগ্য নয়। কিন্তু অনুগ্রহ করে যদি আমার তস্করবৃত্তির উদ্দেশ্যটি অবধান করেন, তা হলে আমার অপরাধের কিছু ক্ষালন হয়। বলা যায় না, হয়তো বা মার্জনাও পেতে পারি।

বিমূঢ় অকম্পন কি বলবে ভেবে পেল না। এই শঠের নির্লজ্জতার যেন সীমা নেই। গর্হিত কৃতকর্মের অজুহাত দেখিয়ে পাপস্খালন করতে চায়!

রবি অকম্পনের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষা না করেই বলল, রাজ্ঞীর আদেশেই আপনার পিছু নিয়েছিলাম। ব্যবসার কাজে আসছিলাম, রানিমহল থেকে আদেশ হল গোপনে আপনাকে অনুসরণ করবার। পথে যাতে আপনার কোনও বিপদ-আপদ না ঘটে তাই দেখার। কিন্তু মুশকিল হল আপনাকে কিছু জানানোর অনুমতি ছিল না। আমি যথাসাধ্য করেছিলাম, কিন্তু আপনার বিধি বাম। ধর্মসাক্ষী করে একথা বলতে পারি, উড়ালিতে আপনার বন্দীদশার জন্য আমি দায়ী নই। এ দায় সম্পূর্ণ আপনার। আপনার অবগতির জন্য বলি, এ বিপদের অনুমান কিন্তু আমি করেছিলাম। আপনার কি একবারও মনে হয়নি যুদ্ধকালীন যত্রতত্র যুদ্ধক্ষেত্রের সন্ধান করে ফেরা অত্যন্ত সন্দেহজনক? আমি আপনার বিবরণ শুনেই বুঝেছিলাম, গুপ্তচর আপনার পশ্চাতেই আছে। আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে অনুজ্ঞা দেওয়ার স্পর্ধা আমার নেই। কিন্তু আপনাকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বিপদ যা হবার তা ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছিল। তারপর যখন দেখলাম, আপনি ছদ্মপরিচয়ে কালানে আসবার প্রচেষ্টা করছেন, আমি জেনে গেলাম আর নিস্তার নেই। উড়ালিতেই আপনি বন্দী হবেন।

অকম্পন নিরুত্তরে শুনে যাচ্ছে রবিস্তোত্রের বিবরণ।—ওদিকে এও বুঝেছিলাম, মহারানির বার্তাটি যথাস্থানে পৌঁছানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার সম্মুখে তখন দুইটি কর্তব্য, এক, আপনাকে বিপন্মুক্ত করা আর দুই, মহারানির বার্তা বহন করে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া। বিচার করে দেখলাম দুটি কর্তব্য পালন করতে যিনি সহায় হতে পারেন তিনি আর কেউ নন, তিনি কুমার চন্দ্রগুপ্ত!

হতবুদ্ধি হয়ে অকম্পন শুষ্ককণ্ঠে বলল, আপনার উদ্দেশ্য ও সাধনের মধ্যে কোনও যোগসূত্র তো দেখতে পাচ্ছি না?

রবিস্তোত্র অকম্পনের শয্যাপার্শ্বে এক পীঠিকায় আসন গ্রহণ করেছিল। বাতায়নপথে দৃষ্টি প্রসারিত করে খানিক অন্যমনস্ক হয়েই যেন বলে চলল, আমি যথাশীঘ্র কালানে উপস্থিত না হলে সমূহ বিপদ। মহারানির বার্তাটি আপনি কোথায় রেখেছেন তা সন্ধানের সময় ছিল না, তাই আপনার সম্পূর্ণ সামগ্রী আত্মসাৎ করতে হল। আমাকে অতিদ্রুত চিন্তা করতে হয়েছিল। আপনার অনুমতি নেবার সময় ও সাহস আমার ছিল না। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমার এই অপরাধটুকু করা ভিন্ন আর কোন পথ আছে বলে মনে হয়নি, অন্যথায় আপনার কার্যসিদ্ধি হত না।

—কার্যসিদ্ধি? সে তো অসম্ভব ছিল!—উত্তেজনায় শারীরিক বেদনা ভুলে শয্যায় উঠে বসে অকম্পন, আপনি সে কার্যসিদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন?

—বোধহয় হয়েছি, কিন্তু আপনি অযথা উদ্বিগ্ন হবেন না। একটু থেমে রবি বলল, শুনুন তাহলে। আমি দুর্গে উপস্থিত হয়ে অতি সত্বর কুমার চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করি। অনেককাল দুর্গে সামগ্রী সরবরাহ করি, কিছু পরিচিতি ছিল। তদুপরি সঙ্গে ছিল মহারানির অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়। হ্যাঁ, এটাও আমি নিদ্রামগ্ন আপনার আঙুল থেকে চুরি করেছিলাম। আমার দ্বিতীয় অপরাধ।

অকম্পনের প্রতিক্রিয়া দেখতে রবি একবার তার মুখের দিকে তাকাল। অকম্পন কিছুই বলতে পারলো না। রবি আবার শুরু করল, আমার সৌভাগ্য, সেই মধ্যরাত্রেই কুমার দর্শন দেন। মহারানির বার্তা এবং অভিজ্ঞান অর্পণ করে তাঁকে আপনার কথা জানাই। বলি আপনি সম্পূর্ণ নিরপরাধ, ভাগ্যের বিপাকে এখন মহাবিপদে, সম্ভবত কারাগারে। কুমার দয়া করে যেন তার উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। মনে হয় তাঁর বিশ্বাস উৎপাদনে সফল হয়েছিলাম।

শুনতে শুনতে অকম্পন প্রস্তরবৎ হয়ে গিয়েছিল। স্তম্ভিত হয়ে উপলব্ধি করল, যাকে সে নিষ্ঠুর গুপ্তচর ভেবেছিল, আসলে সে ছিল তার সত্যিকারের শুভানুধ্যায়ী। একি বিড়ম্বনা! রবি বুঝেছিল যে অকম্পনের পক্ষে কুমারের সমীপে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব বরং এতে তার সমূহ বিপদের আশঙ্কা। অথচ প্রাণ থাকতে সে মহারানির অঙ্গুরীয় হস্তান্তরও করবে না এও অনুমেয়। তাই এটুকু ছলনার আশ্রয় তাকে নিতে হয়েছে। যে কর্তব্যসাধন অকম্পনের অসাধ্য ছিল রবিস্তোত্র তা নিপুণভাবে সমাধা করেছে।

অকম্পন বাকরুদ্ধ হয়ে রইল। রবি পুনরায় বলল, আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে। কুমার আপনার সম্যক পরিচয় সম্ভবত মহারানির পত্রেই পেয়ে থাকবেন। পত্রপাঠ করে কুমার গম্ভীর হয়ে যান, মনে মনে তাঁকে বিচলিত বোধ হচ্ছিল। কিন্তু তিনিই উড়ালি থেকে আপনাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন ও অতঃপর কোনও এক গোপনীয় রাজকার্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

রবি কথা বন্ধ করে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। অভিভূত অকম্পন রবির দুই হাত ধরে বলল, বন্ধু, আমি বড় লজ্জাবোধ করছি, আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম।

রবি একটু মুচকি হেসে বলল, আমার অহোভাগ্য আপনি আমাকে বন্ধুসম্বোধন করলেন বলে। কিন্তু পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট এমনই ছিল, আপনার স্থানে অন্য কেউ একইরকম ভাবতেন।

—এখন বুঝেছি আমার নির্বুদ্ধিতাই উড়ালিতে আমার সংকটের কারণ। আপনার উপস্থিতবুদ্ধি আমাকে কারাবাস থেকে নিস্তার করেছে।

—ওকথা বলে লজ্জা দেবেন না। তবে আপনার কথায় ভরসা হচ্ছে, বোধহয় আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তাহলে মার্জনা পেলাম কি?

—ধন্য বন্ধু, আপনাকে মার্জনা? আমি আপনার দ্বারা অশেষ উপকৃত। বরং আপনাকে অন্যায় সন্দেহ করার জন্য আপনি আমায় মার্জনা করুন।

অন্তরের ব্যবধান অন্তর্হিত হলে বাহ্যিক দূরত্বও থাকে না। অকম্পন নিজের শয্যায় রবিকে আহ্বান করে দুই বন্ধুতে আলিঙ্গনাবদ্ধ হল। আবেগ প্রশমিত হলে অকম্পন প্রশ্ন করল, বন্ধু রবিস্তোত্র, সবই বুঝলাম শুধু একটি বিষয় বাদে। মহারানির দেওয়া পত্র তো লুণ্ঠিত হয়েছিল। সে পত্র আপনি কোথায় পেলেন?

—ভুল হল বন্ধু। লুণ্ঠিত হয়েছিল কয়েকটা নগণ্য বস্ত্রের খণ্ড মাত্র। মহারানির বার্তা আগাগোড়া আপনার সঙ্গেই ছিল। যখনই শুনলাম পত্রের মধ্যে সামান্য ক'টা বস্ত্রখণ্ড ছিল তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। মহারানি এই অকিঞ্চিৎকর বস্তু কুমারকে প্রেরণ করবেন কেন? অল্প চিন্তাতেই আমার মাথায় আসে, আসল বার্তা নিশ্চই বাইরের আচ্ছাদনেই থাকবে। সৌভাগ্যক্রমে যা দুর্বৃত্তেরা ফেলে গিয়েছিল। আমার অনুমান মিথ্যা হয়নি। পত্রধারক বস্ত্রটা যখন আপনি দেখালেন, আমি দেখলাম তার এক কোণে কিছু অক্ষর লেখা ছিল। বার্তা আমি পড়িনি, দেবভাষা আমার তেমন আয়ত্ত নেই। কিন্তু আমি নিঃসন্দেহ হলাম এই সেই বার্তা। বিদুষী মহারানি স্বহস্তের সীবনকার্যে এই পত্র লিখেছিলেন। একই রঙের সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে সহজে চোখে না পড়ে। আপনারও দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। আমি এরকম কিছু অনুসন্ধান করেছি বলেই দেখতে পেয়েছি, নতুবা আমিও দেখতাম না। অসাধারণ মহাদেবীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। এই ধরনের কোনও দুর্ঘটনার পূর্বানুমান তাঁর ছিল, সুকৌশলে তার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা তিনি নিয়েছিলেন।

চমৎকৃত অকম্পন। এখন মনে পড়ে গেল রাজপ্রাসাদ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে মহারানির বলা কথাগুলি। সেই যে তিনি বলেছিলেন, কুমারকে বিশেষভাবে বোলো যে অন্তরঙ্গ নয়, বহিরঙ্গেই সব। বাইরের বস্তুকে তিনি যেন অবহেলা না করেন।

কথাটা তখন অকম্পনের অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল, সে কথার সঠিক অর্থ বোধগম্য হয়নি। কী করেই বা হবে? কূটনীতিজ্ঞানহীন সরলরৈখিক তার জীবনের গতি, রাজনৈতিক জটিলতার এমত ঘূর্ণাবর্তে আগে পড়েনি। অধ্যাপনার বহির্জগতে সে নিতান্তই অনভিজ্ঞ। ভেবেছিল বহিরাগত অকম্পনের পরিচয়ে গৌরব অর্পণ করতেই একথা বলেছেন সম্রাজ্ঞী। প্রকৃতপক্ষে তা যে এতখানি অর্থবহ, এখন তা হৃদয়ঙ্গম হল!

আরও বিস্মিত হল রবির ব্যবহারিক বুদ্ধিতে। প্রশংসনীয় তার বিচারক্ষমতা। কী অসাধারণ বিচক্ষণতায় সে সম্ভাবনার বিকল্পগুলি চিন্তা করেছে! আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় সে রবিস্তোত্রকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করলে রবি লজ্জিত হয়ে বলল, আপনার এতো সুবাক্য অবশ্যই আমার শ্লাঘার বিষয়, কিন্তু প্রকৃত ধন্যবাদ কুমারের প্রাপ্য। তিনিই আপনার প্রতি সুবিচার করেছেন, আমি নিমিত্ত। থাক ওসব কথা। তবে দেখা যাচ্ছে যে উড়ালির কারাগার থেকে মুক্ত হয়েও আপনি কিন্তু শত্রুমুক্ত হননি। আপনি যদি সুস্থবোধ করেন তো ঐ রাত্রে শিরি নদীর ধারে কী হয়েছিল বলবেন কি?

মাত্র কয়েক পলের ব্যবধানে অকম্পন এখন অসম্ভব সুস্থবোধ করছে। মস্তিষ্কের গুরুভার দূর হয়েছে, জ্বরের প্রকোপ আর নেই, শরীরের বেদনাও যেন অর্ধেক হয়ে গেছে। প্রিয় বন্ধুকে নিজের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে আর কোনও ক্লেশ অনুভব করল না সে। শুনতে শুনতে অস্বাভাবিক রকম সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল রবি, ভয়বিহ্বল অস্ফুটস্বরে থেকে থেকে উচ্চারণ করছিল, কী সাংঘাতিক! কী নৃশংস! এও সম্ভব?

আখ্যান শেষ করে অকম্পন তাকে সান্ত্বনা দেয়, অত বিচলিত হবেন না বন্ধু। আমি তো জীবিত আছি, তাই কি যথেষ্ট নয়? পাতালপুরীর ঐ অন্ধকূপে মৃত্যু খুব দূরে ছিল না।

—দৈব আপনাকে রক্ষা করেছে, রবির কণ্ঠস্বরে অবিশ্বাস ও আতঙ্ক তখনও বর্তমান।

বন্ধুকে বিদায় দেবার আগে একটা সম্ভাবনার কথা ভেবে উচ্চকিত হয় অকম্পন। রবিস্তোত্র উজ্জয়িনী যাবে। তার সঙ্গে শকটের সাধন আছে। বর্তমান বন্দিদশা থেকে মুক্তির এই তো সুযোগ। রবিস্তোত্রের হাত ধরে অকম্পন বলে, একটা কথা ছিল। আপনার সাহায্য চাই, মানে আপনি তো আজই উজ্জয়িনী ফিরে যাচ্ছে, একবার আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন। আর একবার যদি উদ্ধার করেন...

সব শুনে রবি আশ্চর্য হয়। এরা একটা বনজ উপজাতি বলে শুনেছিলাম। ভিতরে এই ব্যাপার তা তো জানতাম না, এই বলে সে অকম্পনকে আশ্বাস দেয়, আপনি ঠিক মধ্যাহ্নের পরে এইখানে চলে আসুন। আমরা প্রস্তুত থাকব। আপনাকে নিয়েই চম্পট দেব।

যেভাবেই হোক অকম্পন সঠিক সময়ে এইখানে চলে আসবে। আন্দাজে পথ চিনে আসতে হবে, প্রয়োজনে কণটীর সাহায্য নেবে। একটা সুযোগ এসেছে, তাকে কোনমতেই হারানো চলবে না।

—তাহলে ঐ স্থির রইল। আজ মধ্যাহ্নে। এখন আমাকে বিদায় দিন বন্ধু, এই বলে রবিস্তোত্র গাত্রোত্থান করল। তারপর ক্ষণিক ভেবে বলল, ও হ্যাঁ, আরও একটা কথা জানিয়ে যাই। আপনি শুনে সুখী হবেন, পাপের শাস্তি হয়েছে। পঞ্চকর্ণ আপনি নিরুদ্দেশ হবার রাত্রেই সর্পদংশনে প্রাণ হারিয়েছে।

অকম্পনের হৃদয়ের গতি দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছিল সম্ভাবনা ও শঙ্কার দোলাচলে। তার কারণ অন্য। রবির কথায় বিশেষ কোনও অনুভূতি হল না। শুধু মনে হল, পঞ্চকর্ণ সর্পবিদ ছিল, সর্পদংশনে তার মৃত্যু হবার কথা নয়। এ কি সহজ নিসর্গসিদ্ধি অথবা কোনও অপ্রাকৃত সংঘটন?

সে রহস্য নিয়ে মস্তিষ্ককে ব্যতিব্যস্ত করতে আর প্রবৃত্তি হল না অকম্পনের। যন্ত্রচালিতের মতো বন্ধুকে প্রত্যভিবাদন জানাল। রবিস্তোত্র কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

॥ ১৭ ॥

দূরে শত্রুশিবির এখান থেকে অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। শিবিকাগুলি যেন খেলাঘরের সাজানো আয়োজন। হালকা একটা নাকাড়ার শব্দ সকাল থেকেই শোনা যাচ্ছিল। শকশিবিরে বিজয়োল্লাস চলছে। অপরদিকে কালানের বিজিত জয়স্কন্ধাবারে আনন্দের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু সেদিন অতি প্রত্যুষেই সবাই যেন একটা অস্থির ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছে, পরাজিত সেনাশিবিরে যা অপেক্ষিত নয়।

মহারাজ আসছেন। কালান দুর্গে এই প্রথম সম্রাটের পদার্পণ হবে। মহারানি সমভিব্যাহারে মহারাজাধিরাজ রামগুপ্ত আসছেন সন্ধিসংক্রান্ত শর্তাধীন কর্মসম্পাদনের নিমিত্ত। গড়ের বাসিন্দাদের মধ্যে তাই এই চাঞ্চল্য। সূর্যোদয়ের অল্প পরেই দুর্গদ্বারের বাইরে থেকে তুরী-ভেরীর ধ্বনি শোনা গেল। বহু অশ্ব ও রথ শোভিত, স্বর্ণাভূষণমণ্ডিত ও পত্রপুষ্পে সজ্জিত এক জমকালো শোভাযাত্রা এসে উপস্থিত হল দুর্গদ্বারে।

ইতিপূর্বে কালান গড়ে কারওর রাজদর্শনের সুযোগ হয়নি। রাজমহিষীর তো এখানে আসার প্রশ্নই নেই। মহারাজের আগমনের কারণ জানা থাকলেও মহারানি কেন এ সময়ে এখানে এসেছেন তার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ কেউ জানে না। এ এক অভাবনীয় উপলক্ষ্য। সপার্ষদ মহারাজ রামগুপ্ত ও রক্ষীবাহিনী এসে পৌঁছলেন দুর্গমুখে। মহারাজ চতুর্দোলা থেকে অবতরণ করলেন। তাঁর পরে ভুবনমোহিনী রূপে দশদিক আলো করে অবতীর্ণ হলেন মহারানি ধ্রুবাদেবী। অভ্যর্থনা করবার দলটি অগ্রসর হয়ে বরণ ও আরতি করে তাঁদের স্বাগত জানালেন। পুরোভাগে ছিলেন কুমার চন্দ্রগুপ্ত ও সেনাপতি। পুষ্প, কুঙ্কুম ও চন্দনের বর্ষার মধ্যে মঙ্গলাচরণ করে পুরোহিত তাঁদের দুর্গাভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন। উপস্থিত সকলেই রাজা-রানিকে অভিবাদন জানিয়ে হর্ষধ্বনি দিল।

রাজা-রানির উপস্থিতিতে দুর্গে অভূতপূর্ব সুরক্ষার ব্যবস্থা। সে সুরক্ষা-বেষ্টনী ভেদ করে কারও দুর্গ-প্রাকারে প্রবেশ অথবা তার বাইরে যাবার উপায় ছিল না। দুর্গাবাসভবনে ত্রিতলের পিছনদিকে রাজ-অন্তঃপুরের সাময়িক সন্নিবেশ হয়েছিল। সাধারণভাবে জয়স্কন্ধাবারে স্ত্রীলোকের বসবাসের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে না। মহারানির আগমন হেতু এখন আপাতকালীন বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাময়িক অন্দরমহলের সংলগ্ন কয়েকটি কক্ষে রয়েছে মহারানির পরিজন, সখীবৃন্দ, পরিচারিকা ও কিঙ্করীরা।

ধীরে-ধীরে রাজ-অন্তঃপুরের দিকে কোলাহল কমে এলো। মধ্যহ্নের পরে অন্তঃপুরিকাগণ কক্ষান্তরালে গুঞ্জন করছেন কিন্তু তার রেশ বাইরে

আসছে না। অতিথি-ভবনেও আহারাদি সম্পন্ন করে আবাসিকেরা আপন আপন কক্ষে অদৃশ্য হয়েছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার আগে অন্ধকার তখনও খুব গাঢ় হয়নি। মউলি তার কক্ষের গবাক্ষে চোখ রেখে একাকী বসে ছিল। যুদ্ধক্ষেত্র কী সে জানে না। সম্মুখের সেই উন্মুক্ত পরিসরের পরেই শত্রুশিবিরে একটা একটা দীপ জ্বলে উঠছে। যেন কোনও ভোজবাজির ইন্দ্রজালে প্রায়ান্ধকারে ফুটে উঠছে এক অপার্থিব আলোকসজ্জা। রানিদিদি সেই যে অভিষেকের পরে তাঁর অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন, আর তাঁর দেখা পায়নি মউলি। চিকাও কিছুক্ষণ তাকে সঙ্গ দিয়ে কোথাও গিয়েছে। আরও অনেক মানুষের মাঝে মউলির তৃষিত চক্ষু একজনকে খুঁজে ফিরছিল। আসার সময়ে রানিদিদি তাকে বলেছেন, সে এখানেই আছে। কিন্তু তার দেখা পাওয়া যায়নি।

সেও কি এখন এমনই করে মউলিকে খুঁজছে?

ধীরে ধীরে গোধূলির আলো অন্তর্হিত হল, প্রথম প্রহরের ঘোষণা হল সময়পালিকায়। মশালের আলোয় চতুর্দিক আলোকিত। মউলি কক্ষে প্রদীপ জ্বালেনি। এই ছায়ান্ধকারই তার বেশ লাগছিল। একটু পরেই সহসা দুর্গদ্বারে ধ্বনিত হলো গোবিষাণিক। দ্বার উদ্ঘাটনের এ সতর্কতামূলক সংকেত।

দেখা গেল একটা চতুর্দোলা সজ্জিত হয়েছে। অন্তঃপুরের দিক থেকে তা ক্রমে দুর্গদ্বারপথে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। মহার্ঘ হস্তীদন্তময় চতুর্দোলা, কিন্তু সাদামাটা আড়ম্বরহীন মিছিল। রাজকীয় শোভাযাত্রার রোশনাই সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সঙ্গে মশাল হাতে জনাকয়েক অস্ত্রধারী অশ্বারোহী আছে বটে, তবে অদ্ভুতভাবে কয়েকটি রমণী চতুর্দোলাটিকে ঘিরে চলেছে! এর অর্থ কোনো রাজ-পুরনারী চলেছেন ঐ চতুর্দোলায়।

একথা মনে হতেই মউলির বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। এই মুহূর্তে এ দুর্গে রাজ-পুরনারী বলতে তো একজনই আছেন! তবে কি মহারানিই চলে যাচ্ছেন? এই রাতে? কোথায়ই বা যাচ্ছেন? মহারাজ তো সঙ্গে নেই? তবে কি এত শীঘ্র এসে গেল সেই দুঃসময়?

পরিচারিকারা কেউই এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলো না। বা দিতে চাইল না। অবশেষে অতিথিভবনের শেষে যেখানে রাজ-অন্তঃপুরের প্রথম প্রতিরক্ষা-বেষ্টনীর শুরু, সেই দিক থেকে ধাবিত হয়ে এসে অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে চিকা বলল, ওমা! তুমি শুনেছ দিদি? কী সর্বনাশ হয়েছে? রক্ষী নাগেশ যা বলল, তা যদি সত্যি হয়!

অতিবহির্মুখী স্বভাব চিকার। পুরাতন সম্পর্ক নিয়ে মন খারাপ করে না। দুর্গে এসে অবধি সে উঠে-পড়ে লেগেছে নতুন নতুন আলাপ পরিচিতি করতে। ভগ্নীপতির বিরহে আর তাকে খুব কাতর মনে হচ্ছে না। অনেকগুলি দাসী-কিঙ্করীর সঙ্গে অনতিবিলম্বেই তার মিতালি হয়ে গেছে। দুর্গাভ্যন্তরের রমণীকুল পেরিয়ে তার মিত্রতার গণ্ডি সম্ভবত অন্দরের বহির্ধাতেও বিস্তার লাভ করেছিল। চারুর আশঙ্কা মিথ্যা নয়, অতি দ্রুত ও অনায়াসেই চিকা পুরুষদের মাঝে তার মোহজাল বিস্তার করতে পারে। একটি তরুণ প্রতিহারীর অবস্থা ইতিমধ্যেই বড় করুণ হয়ে উঠেছে। তারই নাম বুঝি নাগেশ।

কিন্তু মউলি আশংকিত হল। এ যেন শুধুই চপল বালিকার পরিহাস কৌতুক নয়। বলল, কী বলেছে রে রক্ষী নাগেশ?

ত্রাস-বিহ্বল হয়ে চিকা জানাল, যুদ্ধ-সন্ধির শর্তানুসারে মহাদেবী নির্বাসিত হচ্ছেন শত্রুপুরীতে। তার কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় কম্পিত হচ্ছে, স্বভাবসিদ্ধ তরলতা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছে।

এ বিপদের পূর্বাভাস মহারানি আগেই দিয়েছিলেন। তবুও একটা অবিশ্বাস ছিল, এত বড় অঘটন কিছুতেই সম্ভব নয়। কিছু একটা হবে, কোনও না কোন ভাবে এ দুর্ঘটনা নিবারিত হবে। আর রানিদিদি তো বলেই ছিল, একজন আছে যে সব অনর্থ রোধ করতে পারে। তা হলে?

তার মানে যা শুনেছিল, যা আশঙ্কা ছিল সেই সব অবশেষে সত্যি হতে চলেছে! মহারাজের জ্ঞাতসারে, তাঁরই স্বেচ্ছায়। এখনও একথা মউলি যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

ভারতসম্রাজ্ঞীর এই কি শেষ পরিণতি? রানিদিদিকে সে সম্রাজ্ঞী আর কবে মনে করেছে? আপনজনের বিয়োগব্যথায় মউলি স্থবির হয়ে গেল।

একইসঙ্গে আর একটা চিন্তাও মউলির অন্তর্চেতনায় এসে বিদ্ধ হল। মহারানি তো এও বলেছিলেন যে কুমার চন্দ্র তাঁকে রক্ষা করতে পারেন, যদি তাঁর বার্তা অকম্পন কুমারের নিকট পৌঁছে দিতে পারে। তাহলে তিনিও কি ব্যর্থ হলেন? কি হল তাঁর? কোথায় গেলেন তিনি? আর ভাবতে পারল না মউলি, মনটা তার বিকল হয়ে গেল।

***

আর এক বিষণ্ণ সন্ধ্যা। ধরণীর গতি বুঝি বা ক্রমে স্থির হয়ে আসছে। সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্তের মতো নৈসর্গিক ঘটনাও আজকাল অকম্পনের বড় নিরর্থক লাগে। মনে হয় যেন না হলেও তো চলে।

অকম্পন ধীর পায়ে দুর্গপ্রাকারের কিনারায় এসে দাঁড়াল। তার মনে অবসাদ। কিন্তু শরীরে এক অজানা স্বাস্থ্যের জোয়ার তাকে অপ্রসন্ন হতে দিচ্ছে না!

অকম্পন এখন দ্রুত আরোগ্যের পথে। গতকাল থেকে সে বিনা সহায়তায় চলতে পারছে। একথা যথার্থ, মনের প্রসন্নতায় শরীরের ক্লেশ আপনা থেকেই হ্রাস পায়। না হলে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এত শীঘ্র সে নিজের বলে চলাফেরা করে কি করে? মনের অনেকটা অবসাদ রবিস্তোত্র যেদিন এসেছিল, সেইদিনই দূর করে দিয়ে গেছে।

কিন্তু সেই দিন অকম্পন এও জেনে গেছে, আর সে কোনও দিন উজ্জয়িনীতে তার আবাসে ফিরে যেতে পারবে না। অন্তিমবারের মতো বহির্জগতের দুয়ার তার জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। অবশিষ্ট জীবন তার এক উন্মাদের ইচ্ছায় উৎসর্গিত হয়েছে।

অবশ্য একটা লাভও হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের কিছু অতি দুরূহ তত্ত্ব, আশুলঙ্ক মারফত তার অবগত হয়েছে। কিছু জটিল শল্যপ্রক্রিয়া এখন তার করায়ত্ত, যা তার আশ্রমে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। মানুষের দেহাংশ যে এইভাবে বিচ্ছিন্ন করা কিংবা জোড়া লাগানো যায়, তা এখনও কেউ জানে না। বাস্তবে কত বিচিত্র উপায়ে মানুষকে জীবনদান করা হয়েছে আশুলঙ্ক শুনিয়েছে তার নানান কথা। শুনতে অবিশ্বাস্য লাগে, কিন্তু অকম্পন জানে সেগুলি মিথ্যা নয়। আশুলঙ্ক নিজেই এক দৃষ্টান্ত। তার বামদিকের অস্থি-পিঞ্জর চূর্ণ হয়েছিল। অকম্পন নিজে পরীক্ষা করে দেখেছে, আশুলঙ্কের জীবিত থাকার কথা নয়। তাছাড়া অকম্পনের নিজের এত দ্রুত আরোগ্যও কি কিছু কম বিস্ময়কর?

আশুলঙ্কের সকল শিক্ষা দারুকল্পের কাছে। প্রক্ষিপ্ত বৃদ্ধের মস্তিষ্কে এইসব গূঢ়তত্ত্ব কি করে আবিষ্কৃত হয়েছে, অকম্পনের কাছে তা এক রহস্যই হয়ে রইল। উন্মাদ, কিন্তু এক অলৌকিক প্রতিভা, এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

অকম্পনের অনুসন্ধিৎসু মনে নতুন জ্ঞানের আলোক আনন্দ দিয়েছে। কিন্তু তার এই নবলব্ধ বিদ্যা কোনও নাগরিকের কাজে লাগবে না। বন্দির অধীত বিদ্যায় আর কিবা লাভ?

অনেক আশা নিয়ে অকম্পন রবিস্তোত্রের নির্দেশ মতো যথাসময়ে যাত্রা করেছিল। কর্ণটীর কাছে যথাসাধ্য পথনির্দেশ নিয়েছিল। অনেকটা পথ চলে মনে হয়েছিল বুঝি প্রায় সে এসে গিয়েছিল যেখানে রবিস্তোত্র তাকে আসতে বলেছিল। কিন্তু তার আগেই—

রবিস্তোত্র নয়, অকস্মাৎ অকম্পনের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন সেই বৃদ্ধ! দিনমানে এঁর দর্শন পাওয়া দুর্লভ। সেই দুর্লভ দর্শনে তিনি অবিন্যস্ত করে দিলেন অকম্পনের সব পরিকল্পনা। কীভাবে তিনি অবগত হয়েছেন অকম্পনের এই দুঃসাহসিক অভিযানের কথা!

অকম্পন উত্তেজিত স্বরেই বলেছিল, আমাকে যেতে দিন।

মূর্তির মতো স্থির সেই বৃদ্ধের চক্ষে রোষ অথবা বিরক্তি, কোনও ভাবাবেগই দেখা গেল না। কিছুক্ষণ অনড় থেকে তাঁর দক্ষিণ হস্ত তুলে অকম্পনকে ইঙ্গিত করলেন ফিরে যেতে।

অকম্পন অসহিষ্ণু হয়ে বলে, এ আপনার অবিচার ভদ্র। আপনি আমাকে জীবন দান করেছেন, আমি কৃতজ্ঞ তার জন্য। কিন্তু আমার অবশিষ্ট জীবনের মূল্যে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারব না। আমাকে মুক্তি দিন।

কোনও ফল হল না। এবার কাতর স্বরে অনুরোধ করে অকম্পন, গুপ্তকুলের সঙ্গে আপনার কিসের বৈরিতা জানি না। কিন্তু আমি সেই কুলের অনুগৃহীত। গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে এসেছিলাম কালানে। কুমার চন্দ্রগুপ্ত আমার প্রতীক্ষা করছেন। আপনি আমাকে যেতে দিন, নয়তো

তিনি অসন্তুষ্ট হবেন।

প্রস্তরখণ্ডের মতো বৃদ্ধ অনড় হয়েই রইলেন। অকম্পন বলল, আপনি বিশ্বাস করুন আমার কথা। স্বয়ং মহারানি আজ সংকটাপন্ন। তাঁরই দৌত্যকার্যে আমি এসেছিলাম। কুলের প্রতি আপনার বৈরিতায় আপনি সম্রাজ্ঞীর অনিষ্টসাধন করতে চান কেন? গুপ্তসাম্রাজ্যের বিরোধিতা করুন, কিন্তু একজন মাননীয়া বরনারীর অসম্মান করা কি আপনার শোভা পায়?

বৃদ্ধের ভ্রূদ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত হল, কিন্তু তাঁর ভঙ্গিমায় কোনও পরিবর্তন এল না। আর সহ্য হল না অকম্পনের। একাকী বৃদ্ধ তার পথরোধ করে কী করে? বলপ্রয়োগে অকম্পন তাকে অতিক্রম করতে অগ্রসর হল। কিন্তু সফল হল না। নিকটস্থ হতেই বৃদ্ধ বামহস্তে অকম্পনের হস্তধারণ করলেন।

ক্ষীণকায় বৃদ্ধের বামহস্তে যে এই পরিমাণ বল থাকতে পারে, অকম্পন তা অনুমান করেনি। সরু সরু অঙ্গুলি সাঁড়াশির মতো তার মণিবন্ধে চেপে বসেছে। সে বন্ধনের চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, অকম্পনের করতল রক্তসঞ্চালনের অভাবে অসাড় হয়ে এলো। অকম্পন সর্বশক্তি দিয়েও নিজেকে মুক্ত করতে পারল না। মনে হল হাতের অস্থি বোধহয় ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু বৃদ্ধের হাতের বন্ধন শিথিল হবে না।

নতজানু হয়ে বসে পড়ল অকম্পন। নিরুদ্ধ হতাশার আবেগে তার চক্ষু অশ্রুসজল হল। করজোড়ে অনুনয় করে সে বলে চলল, আমি আপনার আর সব আবাসিকের মতো নই। আমার ঘর-সংসার আছে। আমি অনার্য নই, রাজপুরুষ নই, ধনী নই, আমার কোনও প্রতিভা নেই। আমার এ জীবনে আপনার কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। দয়া করে আমাকে আমার কর্তব্য পালন করতে দিন। আমাকে মুক্ত করুন। নয়তো আজীবন আমার জীবন রক্ষার জন্য আপনাকে আমি অভিসম্পাত করব। আমার পরিজনের দীর্ঘশ্বাস আপনার অমঙ্গলের কারণ হবে। আপনার কোনও অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না।

আরও বহু অনুনয়-বিনয় করলো অকম্পন। এমন ভাবে জীবনের ভিক্ষা সে কখনো করেনি। বৃদ্ধের অঙ্গুলি কিছু শিথিল হল। তবে কি তাঁর দয়া হলো?

বৃদ্ধ একদৃষ্টে কিছুক্ষণ অকম্পনকে অবলোকন করলেন। তারপর তাকে উঠে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করলেন। আশান্বিত অকম্পন দণ্ডায়মান হয়ে দেখল, না, অকরুণ বৃদ্ধের মনে করুণার উদ্রেক হয়নি। দিবাবকাশে এই উন্মাদ শক্তিসাধক মৌন থাকেন। তাই দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলিসংকেতে তিনি অকম্পনকে সেই দিকেই ফিরে যেতে নির্দেশ দিচ্ছেন যেদিক থেকে সে এসেছিল। আরও কঠোর, আরও অমোঘ সেই নির্দেশ।

অকম্পনের পরিকল্পনা অসফল হয়েছে। রবিস্তোত্র হয়তো অনেকক্ষণ তার জন্য অপেক্ষা করেছে। তারপর একসময়ে চলে গেছে। অকম্পনেরও আর যাওয়া হয়নি।

আনমনা অলসতায় সেদিন অকম্পন তার কক্ষ-সমীপ অলিন্দে পদচারণা করছিল। বাতাসে অল্প হিমেল আভাস আসতে শুরু করেছে। অলিন্দের নীচেই উচ্চভূমি যেখানে সমতলে মিশেছে সেখানেই আছে অনেকগুলি বস্ত্রাচ্ছাদিত শিবির। আশুষ্ক বলেছে এরাই সেই শকপ্রধানের সৈন্য, যারা কালানগড় অবরোধ করে কালযাপন করেছে। অনতিদূরে আরও কয়েকটি পরিত্যক্ত প্রাসাদে শকপ্রধানের যুদ্ধনিবাস। অনেকক্ষণ থেকেই একটা কোলাহল অকম্পন শুনতে পাচ্ছিল। আর তার পশ্চাতে একটা আলোর আভা যেন চতুর্দিকে বিস্তৃত হচ্ছিল। অলিন্দের কিনারায় এসে কিন্তু অকম্পন দেখল, অদূরবর্তী শত্রুশিবিরে তখন শুরু হয়ে গেছে এক ভয়ংকর তাণ্ডব। আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে নিয়েছে সমস্ত শিবিরগুলি। তারই আলোকে ওপরের আকাশ লাল হয়ে গেছে। আগুনের ধূ-ধূ শব্দের সঙ্গে মিশে গেছে ভস্মপ্রায় শেষ ক'টি প্রাণের আর্ত চীৎকার। এক বিশাল অগ্নিকুণ্ডের গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়েছে শত্রুসেনানী। ইতস্তত কিছু লোক প্রাণভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তা নগণ্য। অগ্নিদেবের আগ্রাসী আক্রমণ গ্রাস করে নিয়েছে শিবিরের অধিকাংশ জীবিত প্রাণীকে। সহায়ক বাতাসে তার লেলিহান শিখা ক্রমে উচ্চভূমির আবাসনগুলিকে লেহন করতে ছুটে আসছে।

অকম্পন যেখানে ছিল, দীপ্তশিখ অগ্নির এই প্রলয়নৃত্যে অচিরেই সেই প্রাসাদেরও একাংশ অগ্নিসংযুক্ত হল। দারুময় নির্মিতি এই আগ্রাসন থেকে বেশিক্ষণ রক্ষা পেল না। যজ্ঞসমিধের মতো প্রাচীন কাষ্ঠে আগুন ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমবর্ধমান উত্তাপে অকম্পন পুরোপুরি সংবিৎ ফিরে পেল, কিন্তু ততক্ষণে স্থানটি অগ্নিকুণ্ডের আকার ধারণ করেছে। প্রাসাদের নির্গমপথের সন্ধান তার জানা তো ছিলই না। এই দারুণ অগ্নিবলয়ের মাঝে এখন আর সে অনুসন্ধানেরও উপায়ও রইল না।

আবহের উত্তাপ হেতু অকম্পনের স্থাণু শরীরে চঞ্চলতা এল। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অংশে প্রস্থানোদ্যত হতেই আকাশবাণীর মতো কানে এল এক স্বর, অকম্পন তুমি কোথায়?

চকিত হয়ে অকম্পনের চিত্তের আচ্ছন্নতা দূর হল। অনুমানে শব্দের উৎসসন্ধানে লক্ষ্য স্থির করে দেখল, ধূম ও অনলদীপ্তির মাঝে আকার প্রাপ্ত হচ্ছে এক যোদ্ধার অবয়ব। দীর্ঘ পদবিক্ষেপে আগন্তুক তারই দিকে এগিয়ে আসছে!

॥ ১৮ ॥

অশিরগ্রস্ত শত্রু শিবিকার ধ্বংসাবশেষগুলিতে লেলিহান শিখা স্তিমিত হয়ে এসেছে। কিন্তু রক্তবর্ণ ধূম্রকুণ্ডলী তখনও প্রবল বেগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে নিঃসোমক রাত্রিতে নক্ষত্রখচিত আকাশের মন্দালোকে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

কয়েকজন অশ্বারোহী চলেছে কালান গড়ের দিকে। তাদের মধ্যে অকম্পনও আছে। অশ্বারোহণে ফিরে চলেছে দুর্গে। পথ প্রদর্শন করে সম্মুখে চলেছেন, স্বয়ং কুমার চন্দ্রগুপ্ত!

কুমার একা নন, সঙ্গে আছে তাঁর আরও কয়েকটি অনুচর। তাদেরই একজন শারংদেব, বয়সে প্রায় অকম্পনের সমবয়সি। তারা চলেছিল পাশাপাশি। অশ্বগুলি যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গেই চলছিল। তবে একেবারে রুদ্ধশ্বাসে দৌড় নয়। অকম্পন দ্রুত অশ্বচালনায় অভ্যস্ত নয়। তাই যত শীঘ্র সম্ভব দুর্গে পৌঁছনোর প্রয়োজন থাকলেও কুমারের আদেশে অশ্বারোহীরা সংবৃত বল্গনেই চলছিল।

শারংদেব বললেন, আজকের এই অভিযান আমার সারাজীবন মনে থাকবে। কুমার এই অসাধারণ ঝুঁকি কীভাবে নিলেন, আমি এখনও জানিনা।

অশ্বক্ষুরধ্বনি ছাপিয়ে কথাটা কুমারের কর্ণগোচর হয়েছিল। ঈষৎ পিছনে হেলে তিনি বললেন, সে অনেক কথা শারং। অকম্পন শরীর ও মনে এখন বড় অবসন্ন, তাড়াতাড়ি দুর্গে গিয়ে ওর উপচার করা প্রয়োজন। তারপর সব শুনো।

—আপনিও যথেষ্ট আহত কুমার, উপচার আপনারও প্রয়োজন।

—আমি যোদ্ধা শারং। আমি আজ রাজ্যকে শত্রুমুক্ত করতে পেরেছি, আমার সব সংকটের অবসান হয়েছে। কিন্তু আমার হর্ষ দ্বিগুণিত হয়েছে অকম্পনকে অক্ষতদেহে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারছি বলে।

শকেদের শিবিরের ধ্বংসলীলা অকম্পন সচক্ষে দেখেছে। কিন্তু সহসা কীভাবে হল এই শত্রুনিপাত, কিছুই বুঝতে পারেনি। তার মনে হল এখনও বুঝি সে স্বপ্ন দেখছে। অনতি অতীতেই সে দুইবার মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছে অত্যন্ত নিকট থেকে। আর এই কিছু আগের অগ্নিসংকটে সে জীবনের আশা সম্পূর্ণই ত্যাগ করেছিল। আরও একবার তার নবজীবন লাভ হল। স্বয়ং কুমার চন্দ্রগুপ্ত তাকে এবার স্বাধীন জীবনের আশ্বাস দিয়েছেন।

জীবনের ধর্মই হল অসম্ভব হতাশার মাঝেও মৃত্যুকে প্রতিহত করার প্রয়াস অক্ষুণ্ণ রাখা। সেই অমোঘ নিয়মে অকম্পন সমূহ বিপদের মধ্যেও নিরাপত্তার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। আবাসের প্রায়চতুর্দিকেই তখন আগুন। সহসা এক প্রাংশুদেহ যোদ্ধা মুক্ত কৃপাণ হাতে সেই অগ্নিপরিখা ভেদ করে তারই দিকে এগিয়ে আসবে, এমন সম্ভাবনার কথা চিন্তায় আসেনি অকম্পনের।

অকম্পনের নিকটবর্তী হয়ে উদ্বিগ্নস্বরে সেই আগন্তুক প্রশ্ন করলেন, অকম্পন, তুমি ঠিক আছ?

অগ্নিসম্ভব মূর্তিটি অকম্পনের অপরিচিত ছিল। কিন্তু সে যেন

পুরাণকথার নায়ক। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, রাজোচিত দৃপ্ত আঙ্গিক, সহার্দকণ্ঠস্বরে পরম আত্মীয়তার আভাস। সম্ভাষণের হৃদ্যতা দেখে মনে হয় যেন তিনি অকম্পনের অনেককালের পরিচিত। মহাসংকটেও ভরসা পায় অকম্পন, সম্মোহিতের মতো প্রশ্ন করে, কে আপনি আর্য?

আগন্তুক একা নন, তাঁর পশ্চাতে আরও একজন ছিল। সে এগিয়ে এসে বলল, কুমার ভট্টারক চন্দ্রগুপ্তকে কি আপনি চেনেন না অকম্পনদেব?

এই কণ্ঠস্বর অকম্পনের পরিচিত। কুমারের নিজস্ব যুদ্ধসচিব। উড়ালি থেকে কালিঙ্গড়ে গিয়ে এই ব্যক্তির সঙ্গেই তার প্রথম আলাপ হয়েছিল। কিন্তু তিনি এখানে? আর কুমার ভট্টারক! একাদিক্রমে বিপরীত পরিস্থিতির অভিঘাতে অকম্পনের বোধশক্তি অসাড় হয়ে ছিল। কুমার চন্দ্রগুপ্ত তার সম্মুখে দণ্ডায়মান, এই সত্যের সম্যক অনুধাবন করতে বোধহয় সক্ষম হল না। সেটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। এই অপ্রাকৃত পরিবেশ, এই স্বচ্ছন্দ ব্যবহার আর সর্বোপরি, অদ্ভুতভাবে দুই আগন্তুকেরই অঙ্গে স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ ও অলংকারাদি! শুধু মস্তক অনাবৃত, নারীর শিরাচ্ছাদনের বস্ত্র অনুপস্থিত।

সংস্কারবশেই কুমারকে অভিবাদন জানাতে ভুল হল না অকম্পনের। সচিব বললেন, কুমার আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছেন অকম্পনদেব।

চন্দ্রগুপ্ত বললেন, আর কালক্ষেপ কোরো না শারং, অবিলম্বে এই স্থান পরিত্যাগ করতে হবে। এসো অকম্পন...

কিন্তু দেখা গেল বিলম্ব হয়ে গেছে। কুমার ও শারংদেব যে পথে এসেছিলেন তা ইতিমধ্যে অগ্নিগর্ভে অবরুদ্ধ হয়েছে। বস্তুত প্রায় চতুর্দিকেই তখন বৈশ্বানরের সশব্দ উল্লাস। অগ্নিবলয়ের পরিধি ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে। বাতাসের প্রশ্বাসে প্রখর গ্রীষ্মের উত্তাপ।

অকস্মাৎ একটি পরুষ কণ্ঠে সকলের দৃষ্টি আকর্ষিত হল প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে। ধূম্রজালের আড়ালে আর একটি ক্ষীণকায় দীর্ঘদেহ কখন সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে কেউ জানে না। ত্বরিত হাতের ইঙ্গিত করে সে তীক্ষ্ণস্বরে আহ্বান জানাচ্ছে, এদিকে এসো। আমাকে অনুগমন করো মূর্খের দল!

সেই উন্মাদ বৃদ্ধ! অকম্পন সচকিত হল। কিন্তু কুমার নীরবে ইঙ্গিত করলেন তাঁর আদেশ পালন করতে। বৃদ্ধ একটা মশাল হাতে নিয়ে প্রবেশ করল একটি অগ্নিগর্ভ কক্ষে। কক্ষের পশ্চাদ্ভাগ ধিকিধিকি জ্বলছে, সম্মুখের ভাগ তখনও অগ্নিকবলিত হয়নি। কয়েকটি ধাপের এক নিশ্রয়ণী আরোহণ করে এক উন্মুক্ত নিরন্তরাল আলিন্দের প্রান্তে এসে বৃদ্ধ তাঁদের নিরস্ত করলেন। সম্মুখেই ছিল এক সংকীর্ণ সুড়ঙ্গমুখ। তার মধ্যে নেমে গেছে সোপানপথ।

—এই সুড়ঙ্গপথে অবতরণ করে তোমাদের যেতে হবে। পথ সংকীর্ণ, কিন্তু নিরাপদ। এর নির্গমপথ অগ্নিমুক্ত, এ ছাড়া আর সমস্ত নিষ্ক্রমণদ্বার ধ্বংস হয়েছে।

—আপনি যাবেন না? কুমার প্রশ্ন করলেন, এই অগ্নিকাণ্ড থেকে নিস্তার পেতে আপনাকেও তো এই পথেই আসতে হবে।

—আমার আজ ব্রত উদযাপনের রাত্রি। আমি এখান থেকেই বিদায় নেব।

কথাগুলি বেশ সন্দেহ জাগায়। আসন্ন বিপদের মাঝে এই রহস্যময় বৃদ্ধ কী করতে চায়? তার কথা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য সেই দ্বন্দ্বে বিমূঢ় অকম্পন। বিগত পক্ষকালের বন্দিদশা কি এত সহজেই নির্মূল হবে? অথবা হয়তো এ আর এক ছল। সুড়ঙ্গের অপর দিকে কি আছে তা কি বলা যায়? বৃদ্ধ সঙ্গ নিতে অস্বীকার করছে কেন? এখানে তো ভয়ংকর দুর্যোগ, পরিত্রাণের কি অন্য পন্থা আছে?

কিন্তু কুমার চন্দ্রগুপ্তকে যথেষ্ট অসন্দিগ্ধ মনে হল। বয়স্ক লোকটির প্রতি উদ্বিগ্ন হয়েই যেন প্রশ্ন করলেন, কী বলছেন আপনি? এই জ্বলন্ত প্রাসাদ আর মোটেই নিরাপদ নয়।

—আমার জন্য উদ্বিগ্ন হোয়ো না কুমার। আমার পন্থা আমি নির্ধারণ করে নেব। কিন্তু তোমরা আর বিলম্ব কোরো না। আর দণ্ডকালের মধ্যে এই অলিন্দ ভেঙ্গে পড়বে। আচ্ছা, একটু দাঁড়াও—

এই বলে বৃদ্ধ কটিবন্ধ থেকে একটা থলিকা বার করে কুমারের দিকে তা প্রসারিত করলেন। বললেন, এ তোমার পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার কুমার, গ্রহণ করো।

—কী এ? কুমার থলিকা হাতে নিয়ে বললেন।

—এতে তোমার পূর্বজ শ্রীগুপ্তের কিছু স্বর্ণমুদ্রা আছে। তোমার পরম্পরা তোমাকে অর্পণ করলাম।

কুমার একবার শারংদেব ও অকম্পনের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। তারপর বৃদ্ধকে বললেন, বুঝলাম না। মহারাজ শ্রীগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা আপনি কোথায় পেলেন?

—শিরি-র অববাহিকায় এক দুর্গম গিরিকন্দর থেকে এই গুপ্তধন উদ্ধার হয়েছে। সব কথা বলার সময় নেই, পরে এই যুবকের কাছ থেকে জেনে নিও।

অকম্পনের মনে পড়ল বৃদ্ধের সঙ্গে সেই প্রথম দর্শনের রাত্রি। তিনি এই মুদ্রাগুলির উল্লেখ করেছিলেন বটে। কুমার অকম্পনের দিকে একবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে দেখেও কিন্তু কিছু জানতে চাইলেন না। বৃদ্ধকেই পুনরায় বললেন, কিন্তু এ আপনি ফেরত দিচ্ছেন কেন? আপনি পেয়েছেন, আপনিই রাখতে পারতেন?

—আমার এতে কোনও প্রয়োজন নেই।

অদূরে কোনও এক বহ্নিমান কাষ্ঠখণ্ড সশব্দে ভেঙ্গে পড়ল। বৃদ্ধ একটু অধৈর্য হয়ে বললেন, আর সময় নেই। শোনো অকম্পন—

বৃদ্ধ এবার অকম্পনের মুখের দিকে ফিরে দেখলেন। তারপরের কথাগুলো তাঁর যেন ভবিষ্যৎবাণীর মতো শোনাল, শোনো অকম্পন, তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম। কেননা আমার কাজ ফুরিয়েছে, কিন্তু তোমার কিছু বাকি আছে। নিজেকে সমর্থ করো। সামনে তোমার কঠোর পরীক্ষা আসতে পারে। শান্তভাবে নিজের কাজ করে যেও, তুমি সফল হবে। আর একটি বস্তু আমি তোমাকে দান করে যেতে চাই অকম্পন। আমার অপ্রয়োজনীয় কিন্তু তোমার কাজে লাগতে পারে। গ্রহণ করো—

এ কি সেই নিষ্করুণ জীবনব্যাপারি? সপ্তাহকাল পূর্বে এরই পদতলে অকম্পন কাতরভাবে প্রাণভিক্ষা করেছিল। পাষাণহৃদয় দ্রব হয়নি। এ কি সেই অত্যাচারী উন্মাদ? বিশ্বাস হয় না। আজ তাঁর কণ্ঠে যেন আশীর্বাণীর সুর, চক্ষে ঝরে পড়ছে করুণা। অকম্পন সেই বরণীয় বৃদ্ধের হাত থেকে একটা বস্ত্রে বাঁধা পুলিন্দা গ্রহণ করে অস্ফুটস্বরে বলল, এটি কি আর্য?

—আমার মস্তিষ্কে যা ছিল, তা আমার সঙ্গেই সমাপ্ত হবে। আর কেউ তা জানবে না। তবে আমার উপলব্ধ কিছু সূক্ত, কিছু তত্ত্ব আমি দীর্ঘদিন যাবৎ এই পুঁথিতে লিপিবদ্ধ করেছি। যদি কোনোদিন জীবন-সাধনার আস্বাদ পাও, তখন সেই পথের প্রয়োজনীয় কিছু পাথেয় এতে পেয়ে যাবে। সংকটে শরণ নিও। কিন্তু আর দেরি নয়, এবার তোমরা অগ্রসর হও—

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড শব্দে কোনও এক বিশাল অশ্মখণ্ড কোথাও ভেঙে পড়ল। কয়েকটা উত্তপ্ত অঙ্গার গড়িয়ে চলে এল পায়ের কাছে। বৃদ্ধ ত্বরিতে অনেকটা পিছিয়ে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে আদেশ করলেন, এই মুহূর্তে তোমরা সুড়ঙ্গে প্রবেশ করো। চলে যাও...

অকম্পন বিহ্বল হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কুমার তার বাহু আকর্ষণ করে দ্রুত সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে অবতরণ করলেন। দীর্ঘ সোপানশ্রেণি অবতরণ করে অনুভূমে এসে উপস্থিত হলেন তাঁরা। অতঃপর বিসর্পিল সমতল পথ ধরে বেশ কিছুক্ষণ চলবার পরে তাঁরা মুক্ত আকাশের তলায় এসে গেলেন। পিছন ফিরে দেখা গেল অনেক দূরে উচ্চ অগ্নিকুণ্ডের মাঝে একটা নিশ্চল মূর্তি কিসের না জানি প্রতীক্ষা করছে। তারপর ধূম ও উদ্যত শিখার অন্তরালে সব অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনতিদূরেই কুমারের আরও কয়েকজন সঙ্গী প্রতীক্ষায় ছিল। এই অঞ্চল সমরক্ষেত্র থেকে অনেকটা তফাতে। অগ্নিশিখা এখান থেকে দৃশ্য নয়, কিন্তু শত্রুশিবিরে অগ্নির তাণ্ডব সমাপ্ত হয়নি। চঞ্চল তেজস ও সংরক্তনভোমণ্ডলে তার চলমান সাক্ষ্য অব্যহত। আহতদের আর্তনাদ কিছু স্তিমিত হয়ে এসেছে, কেননা তাদের অধিকাংশ তখন মৃত অথবা পলায়ন করেছে। কুমার অকম্পন ও শারংদেব অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সকলে অশ্বাসীন হলেন, দুর্গাভিমুখে ধাবিত হল অশ্বের দল।

—আপনি অসুস্থ বোধ করছেন না তো অকম্পনদেব?

সচিব শারংদেবের কথায় সংবিৎ এলো অকম্পনের। অশ্বের বল্গা

তার হাতে ধরা ছিল মাত্র, কিন্তু অশ্বচালনা সে করছিল না। প্রশিক্ষিত অশ্ব সঙ্গীদের মাঝে আপন গতিতেই চলেছিল। আজ অকম্পনের আর একবার পুনর্জন্মের দিন। যান্ত্রিকভাবে শারংদেবকে জানাল, সে সুস্থই আছে।

অকম্পন বলতে পারল না তার অন্তরে কি আলোড়ন চলছে। অদম্য কৌতূহল হচ্ছে। কি করে এঁরা তার সন্ধান পেল? কী প্রকারে তার মুক্তি হল? কীভাবে এই অগ্নিকাণ্ড হল? ঐ রহস্যময় রেবটাধীশ কি কুমারের পূর্বপরিচিত? তাহলে কে সে?

শারংদেব অকম্পনের হতবুদ্ধি দশা দেখে কিছু অনুমান করে থাকবে। একটু হেসে বলল, আপনাকে যারপরনাই বিভ্রান্ত লাগছে অকম্পনদেব। কিন্তু আমরা জয়স্কন্ধাবারে প্রায় এসে গেছি, এখন সব কিছু বলার সময় নেই। কুমার আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী। যথাসময়ে তিনি আপনাকে সবই অবগত করাবেন।

অনতিবিলম্বে ভীষণ অগ্নিশিখার প্রেক্ষাপটে দেখা গেল ঘোড়সওয়ারের সেই দল ছুটে আসছে দুর্গাভিমুখে। দুর্গদ্বারে তাদের স্বাগত জানালো স্থানীয় সৈনিকেরা, কুমার চন্দ্রগুপ্তের জয়ধ্বনি দিয়ে। তার পর সেই দলটি চলে গেল দুর্গের অভ্যন্তরে।

সমগ্র জয়স্কন্ধাবারে তখন তুমুল কোলাহল। পরাজয়ের গ্লানি মুছে গিয়ে সেখানে গুঞ্জরিত হচ্ছে এক অপূর্বকৌশল জয়ের উল্লাস। রাজকুল কলঙ্কিত হয়নি। সম্রাজ্ঞীর ছদ্মবেশে কুমার চন্দ্রগুপ্ত গিয়ে শত্রুনিধন করে এসেছেন! গল্পকথার মতো অকল্পনীয় এই বার্তা প্রবল হর্ষবিস্ময়ে পল্লবিত হতে লাগল দুর্গাভ্যন্তরে।

দুর্গদ্বারেই কুমার বিদায় নিয়েছিলেন। সম্ভবত মহারাজকে সংবাদ দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে। হতবাক অকম্পন ফিরে এল নিজের কক্ষে। অতিথি-নিবাসের পরিচিত সেই ক্ষুদ্র কক্ষটি। এখান থেকেই সে পঞ্চকর্ণের ছলনার শিকার হয়েছিল। কক্ষের শয্যাটি নতুন করে বিন্যস্ত। মস্তকের কাছে যথাযথ রাখা আছে তার নিজের পেটিকা ও পোট্টলি। সে ভাবতে লাগলো, কক্ষটির পরিবর্তন নেই, কিন্তু কক্ষের বাসিন্দাটির জীবনে কি আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল এই কয়দিনে। নেহাত কঠোরভাবে জাগ্রত সে, নয়তো অনায়াসে ধরে নেওয়া যেত যে মাঝের এই কয়দিন ছিল একটা স্বপ্ন। তার জীবনের দীর্ঘতম দুঃস্বপ্ন।

সে দুঃস্বপ্নের কি অবসান হল? বিনিদ্র রজনীতে একাকী আর একটু সকারাত্মক থাকার প্রচেষ্টায় বারংবার ব্যর্থ হচ্ছিল অকম্পন। আজকের ঘটনাবলী মনঃসংযোগের অনুকূল নয়। নারীর ছদ্মবেশে কুমার শত্রুপুরীতে প্রবেশ করে এক অকল্পনীয় জয়লাভ করেছেন— এই সংবাদ অকম্পন ইতিমধ্যেই অবগত হয়েছিল। কি তার অর্থ? অসমসাহসী পরিকল্পনা সন্দেহ নেই। নারীর ছদ্মবেশ প্রবেশকালে শত্রুকে বিভ্রান্ত করতে পারে। কিন্তু তাদের অধিনায়ককে হত্যা করে সেখান থেকে পরিত্রাণে কি তা কোনও সহায়তা করবে? এমন অদূরদর্শী পরিকল্পনা কুমার করলেন কী করে? ঐ ভীষণ অগ্নিকাণ্ড যদি ঠিক ঐ সময়ে না হোতো? আর সে প্রচণ্ড দুর্যোগ থেকেও পরিত্রাণ পাওয়া! তাও কি কম অবিশ্বাস্য? যেন সেও ছিল পরিকল্পনারই অঙ্গ! এতসব কি শুধু অলৌকিক সমাপতন মাত্র?

প্রহর গড়িয়ে চলে। কিন্তু অকম্পনের চক্ষে নিদ্রাবেশ নেই। মস্তিষ্কে জটিলতা থাকলে নিদ্রা আসে না। অকম্পনের জানুবদ্ধ পালিতে রাখা সেই পুঁথিখানা। অন্যমনস্ক হয়েই তার পাতা পালটে দেখছিল সে। প্রাচীন ভূর্জপত্রে লেখা দেহতত্ত্বের আশ্চর্য সব সংবাদ। পাতায় পাতায় তার অদ্ভুত সব আরোগ্যপদ্ধতি ও বিশ্লেষণ। অভূতপূর্ব কিছু শল্যপ্রক্রিয়া ও তার ফলাফল। বহু রসায়নের গুণাগুণ, প্রাপ্তিস্থান ও নির্মাণকৌশল। এমন আশ্চর্য পুঁথি অকম্পন কখনও দেখেনি, যতই দেখে ক্রমশ আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিল। অভিভূত হয়ে দেখতে থাকে উন্মার্গগামী মেধার সেই বিস্ময়কর প্রকাশ।

তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। শারংদেব এসে বললেন, আপনার অবস্থাও দেখি আমাদেরই মতো, কারওরই আজ নিদ্রা আসছে না। আপনি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে আসতে পারেন। কুমার চন্দ্রগুপ্ত আপনাকে স্মরণ করেছেন।

অকম্পন অবাক হয়ে বলে, এই অসময়ে? তিনি তো মহারাজের সঙ্গে মন্ত্রণায় গিয়েছিলেন না?

—তাই গিয়েছিলেন। কিন্তু মহারাজ জানিয়েছেন, তিনি সবিশেষ ক্লান্ত। কুমারকে অভিনন্দিত করে সন্দেশ দিয়েছেন, পরিস্থিতির পর্যালোচনা আগামীকাল সকালে হবে। এখন চলুন—

স্বল্পালোকিত এক বিশাল কক্ষে কুমার চন্দ্রগুপ্ত অকম্পনকে সম্ভাষণ করলেন। করলেন এমনভাবে যেন কতকালের পরিচয়। মন্দ্রকণ্ঠে বললেন, এস অকম্পন। আশা করি তোমার স্বাস্থ্যের উন্নতি সন্তোষজনক। তুমি আমাদের অতিথি, তোমাকে সুরক্ষিত পেয়ে আমার যে কি স্বস্তি হয়েছে বলে বোঝাতে পারব না।

কক্ষে অনেকগুলি পারিষদ পূর্ব হতেই ছিল। তারা কেউ কুমারের অঙ্গরক্ষক, কেউ সহকারী যোদ্ধা, কেউ বয়স্য। কয়েকজন যোদ্ধার পরিধানে তখনও ছিল রমণীর বেশ। বোঝা যায় তারা আজকের অভিযানে কুমারের সঙ্গী ছিল। এদেরই মাঝে একটু উঁচু পীঠাসনে বসেছিলেন কুমার চন্দ্রগুপ্ত। কাদম্বের মাঝে রাজহংসকে চিনে নিতে ভুল হয় না। কুমারের সুপুরুষ দেহসৌষ্ঠব, উদার আচরণ, দৃঢ় চরিত্রবল এবং অসমসাহসী বীরত্ব, অকম্পন যেন প্রত্যক্ষ করল এ রাজ্যের ভাবী রাজচক্রবর্তীকে।

কুমারের অনিন্দ্যকান্তি মূর্তি সম্ভ্রম জাগায়। কিন্তু বন্ধুর মতো তাঁর মিষ্ট বাক্য অকম্পনকে বিভ্রান্ত করে। সে কি সত্যিই পরাক্রমী কুমার চন্দ্রগুপ্তের সমক্ষে দণ্ডায়মান? এ যেন অবিশ্বাস্য বোধ হয়। কুমারের বাক্যে অকম্পন অধোবদন হয়ে কোনক্রমে বলল, আপনার করুণায় অধম চিরঋণী হয়ে রইল দেব।

—ও কথা বোলো না অকম্পন। এই কালানের দুর্গে তোমার কোনও অমঙ্গল হলে আমার লজ্জার শেষ থাকত না। তারপর একটু হেসে বললেন, আর কি বললে? করুণার ঋণ? হা হা হা—তা বেশ তো, একটা কাজ করো। দেখো তো, কিছু কেটে ছড়ে গেছে। বৈদ্যকে আর এত রাতে কে ডাকে, তুমি তো এখানেই উপস্থিত। তুমিই দেখ না কিছু উপচার করতে পার কিনা? শোধ হয়ে যাক খনিকটা ঋণ।

অকম্পন ধন্য হল। কুমারের বাহু ও স্কন্ধে বেশ কিছু রক্তমুখ ক্ষতের চিহ্ন ছিল। অকম্পন পরীক্ষা করে দেখল, কোন আঘাতই তেমন গুরুতর নয়। অল্প পরিচর্যাতেই কুমার সুস্থ হতে পারবেন।

কুমারের সৌহার্দ্যে রাজকীয় আড়ম্বর নেই, সযত্নে উপচার করতে প্রবৃত্ত হল অকম্পন। ক্ষতমুখগুলি পরিশ্রুত করে ওষধিপ্রয়োগ ও অনুলেপ লাগিয়ে দিল। কুমার পীড়িত স্বরে বললেন, উ-হু-হু— অকম্পন করো কি? বড় জ্বলে যে। সন্তাপ দূর করো বৈদ্যোত্তম, আর বাড়িও না।

অকম্পন সন্ত্রস্ত হয়েও দেখে কুমারের ওষ্ঠে কৃতকৌতুক হাসি। তখন কপট গাম্ভীর্যে সেও বলে, একটু জ্বলন হবে কুমার। অন্তে যার মঙ্গল, শুরুতে তা কিছু ব্যথা দেয় বৈকি।

অচিরেই শাসক ও শাসিতের ব্যবধান আর রইল না। উপচর্যা চলাকালীন একান্ত অন্তরঙ্গের মত আলাপ করতে লাগলেন কুমার। কথায় কথায় অকম্পন জানল সে রাত্রের কুমারের অভিযানের কথা। সে কাহিনি উপকথার চেয়েও রোমাঞ্চকর।

শত্রু বিনাশ করতে হবে রাজশক্তির সাহায্য বিনা। ছলনার আশ্রয় নিতেই হবে। কুমার সর্বপ্রকার ঝুঁকি নিতেই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু সমস্যা ছিল সশস্ত্র হয়ে শত্রুশিবিরে প্রবেশ। মহারানির পত্র পাওয়ার পর তিনি আর বিলম্ব করেননি, আপন কর্মপদ্ধতি নিজেই নির্ধারণ করে নেন। কুমার নিজের প্রাণপণ করে নিলেন এক অসমসাহসিক প্রচেষ্টা। মহারাজকেও সন্দিহান হবার অবকাশ দেননি। মহারানির যে চতুর্দোলায় গমনের কথা, তাতে নিজে আসীন হলেন নারীর ছদ্মবেশে। মাত্র জনাকয়েক বিশ্বস্ত অনুচরের ভরসায় একা প্রবেশ করলেন শত্রুপুরীতে।

শারংদেব নাতিসম্প্রহাসে বললেন, কুমারকে দেখে ঐ দুষ্ট শকটার মুখাবয়ব আমি এখনও ভুলতে পারছি না।

—নারীর ছদ্মবেশে গিয়েছি। একটু অভিনয় তো করতেই হয় শারং। কুমার অজুহাত দিলেন।

—অভিনয়ের উপযুক্ত সময়ই বটে! শারংদেব সহাস্যে মন্তব্য করলেন, শকরাজের সম্মুখে গিয়ে কুমার কি বলেছিলেন জানো চতুর?

সভায় একটি খর্বাকৃতি বর্তুলাকার ব্যক্তি ছিল, তারই উদ্দেশ্যে বলা। লোকটিকে দেখে বিদূষক বলেই মনে হয়, নাম তার বোধহয় চতুর্মুখ। সে ঐ অভিযানে যায়নি। কপট বিস্ময় দেখিয়ে বিস্ফারিত চক্ষে সে বলল, কী বললেন শারং, কুমার কী বললেন?

—সরাসরি অবগুণ্ঠন সরিয়ে কুমার বললেন, আমি এসেছি, আমাকে গ্রহণ করো অনার্য! নরাধমটার মুখখানা তখন যদি দেখতে চতুর।

সভায় উচ্চহাস্যে সবাই গড়িয়ে পড়ল। হাসি থামলে চতুর্মুখ বলল, তারপর?

—তারপর আর কি? শয্যায় বসে সুরাপান করছিল। সত্বর আসতে গিয়ে উত্তরীয় জড়িয়ে পড়ল। আর উঠতে হয়নি।

পানভোজনে মত্ত শত্রুশিবিরের সুরক্ষা তখন ছিল শিথিল এবং অপ্রস্তুত। নিজহাতে প্রায় বিনা বাধায় চন্দ্রগুপ্ত বধ করেছেন অনাচারী শত্রুরাজ ও তার সেনাপতিকে। চতুর্মুখ হাস্যদমন করে কুমারকে শাসন করার ছলে বলল, পতিত ব্যক্তিকে ছলনার দ্বারা হত্যা করলেন প্রভু? এ যে শঠতা হয়ে গেল।

—সে কোন পুণ্যাত্মা চতুর? শারংদেব চতুর্মুখকে একটা ঠেলা দিয়ে বললেন, শঠের সঙ্গে শঠতা না করে উপসেবা করার বিধান তোমার কোনও শাস্ত্রে আছে নাকি?

—না তা নেই। চতুর্মুখ যেন শিষ্টতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বলে, বিশেষত এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাজকুল মর্যাদা।

চন্দ্রগুপ্ত নীরবে বয়স্যদের বাদানুবাদ শুনছিলেন। এবার বললেন, চতুর, তুই বড়ই বাচাল হয়েছিস। তোকে দণ্ড দিলাম। যা, কাল প্রাতে তোর টিকি কেটে নেওয়া হবে।

—মার্জনা করুন কুমার, আমার শিখার প্রতি এত নির্দয় হবেন না। চতুর্মুখ কাঁদোকাঁদো হয়ে বলে, ব্রাহ্মণী বড় কষ্ট পাবেন।

পুনরায় সভায় হাস্য-কলরোল উঠলো। সে কলরব শান্ত হলে সকলেই কে কীভাবে ঐ অল্প সময়ে শত্রুপুরীতে আত্মরক্ষা করেছে, তার বর্ণনা করতে লাগল। বিপক্ষের কেউ কিছু ভালভাবে বুঝে ওঠবার আগেই চন্দ্রগুপ্তের অনুচরেরা অগ্নিসংযোগ করে শত্রুশিবিরে। তারপরেই একযোগে শুরু হয়ে যায় অগ্নিকাণ্ড। অপ্রস্তুত দিশারিবিহীন সৈন্যদল আপন আত্মরক্ষার কোন সুযোগ পায়নি। অভাবনীয় ভাবে যুদ্ধের ফলাফল পরিবর্তন হয়ে গেল।

অকম্পন মুগ্ধ হয়ে শুনছিল এক অদ্ভুত যুদ্ধের গল্প। কল্প-উপকথায় অনেক বীরের শৌর্যকাহিনী জানা ছিল তার। কিন্তু এ কল্প-কথা নয়, একেবারে বাস্তব সত্য। একসময়ে শারংদেব বললেন, আগুন তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে না পড়লে আমরা কিন্তু এত সহজে রেহাই পেতাম না।

কুমার গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, হ্যাঁ, দারুকল্প তার কথা রেখেছে।

অকম্পনের মনে এই বিজয়ে দারুকল্পের ভূমিকা নিয়ে একটা সংশয় ছিলই। দেখা গেল আরও অনেকেরই মনে প্রশ্ন আছে। সবার কৌতূহল নিরসনে কুমার মুখ খুললেন, দারুকের সহায়তা না পেলে এ অভিযান সফল হত না। রাজসন্ধির শর্ত শুনেই বুঝতে পারি এ আমার একার লড়াই। রাজাজ্ঞার ওপর কিছু বলা যাবে না। তাই শত্রুর ভূমিতে গিয়েই আঘাত হানতে হবে। কিন্তু প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারব কিনা তখনও জানি না।

দারুকল্প রাজদ্রোহী। বহুবর্ষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ গুপ্তবংশের অহিতকল্পে নিয়োজিত ছিল। দারুকল্পের উস্কানি ও সহায়তাই এই প্রান্তে শকেদের উত্থান ও আধিপত্যের প্রধান কারণ। কুমার দারুকল্পকে বশ করেছিলেন। দুর্বিনীত শকরাজার নির্মম শর্ত এই প্রক্ষিপ্ত রেবটকে হয়তো সম্ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি কুমারকে বিষবৃক্ষ নির্মূল করতে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

অকম্পনের দারুণ কৌতূহল হচ্ছিল। কিন্তু কুমারের বাক্য সম্পূর্ণ হল না। এক পরিচারক এসে জানাল উপনায়ক দত্তসেন কুমারের দর্শনপ্রার্থী।

চন্দ্রগুপ্তের সম্মতি পেয়ে কয়েকজন সেবকের সঙ্গে দত্তসেন কক্ষে প্রবেশ করলেন। যথোচিত অভিবাদন করে দত্তসেন নিবেদন করলেন, কুমারকে বিজয় অভিনন্দন জানাতে মহারাজ শীঘ্রই তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ক্লান্ত। আপাতত তাঁর প্রিয় পানীয় তিনি প্রেরণ করেছেন ভ্রাতার জন্য। কুমার যেন তা স্বীকার করেন।

একটি সেবক অগ্রসর হল পানীয়ের পাত্র সহ। স্ফটিকের ভৃঙ্গারে লোহিতাভ পানীয়টি মনোহারী। কুমার তৃষ্ণার্তই ছিলেন, পানীয় গ্রহণ করতে হস্ত প্রসারিত করলেন।

॥ ১৯ ॥

অকম্পন কক্ষের বাইরে অলিন্দে এসে দাঁড়িয়েছিল। এই তরুণ প্রত্যূষেই আকাশটা অনেক বেশি উজ্জ্বল লাগছিল অকম্পনের। গত রাত্রিটা যে বড় অন্ধকার ছিল।

দূরে রণাঙ্গন উপরান্তে দেখা যাচ্ছে ভস্মীভূত শত্রুশিবিরগুলি। হুতাশনের কবল থেকে রক্ষা পায়নি আরও দূরে পর্বত কক্ষের আবাসগুলি। তাদেরই একটিতে ছিল তার গত সপ্তাহের বসতি। যে জায়গায় কাল পর্যন্ত ছিল কোলাহলপূর্ণ জনসমাবেশ, এখন সেখানে বিরাজ করছে মৌন শূন্যতা। কালো অঙ্গাররাশির উপর তখনও দেখা যাচ্ছে তপ্ত বাতাসের আন্দোলন। ভস্মে পরিণত হয়েছে এক কুটিল শকাধিপতির কদর্য লালসা আর কলুষিত উচ্চাশা। কালাগ্নির রোষে সম্পন্ন হয়েছে তাদের পাপ-দেহগুলোর অন্ত্যেষ্টি।

বালার্কের নবীন পরশে অশুদ্ধ অঙ্গার ধৌত হচ্ছে। যেন সেই ভস্মস্তূপ সরিয়ে প্রস্তুতি চলছে কোনও মহাশক্তি আবাহন হেতু পূতপ্রক্রিয়ার। কলুষিত অঙ্গাররাশি সমাধিস্থ হয়ে তার উপর আবার উৎপন্ন হবে এক উর্বর ভূমিখণ্ড। এখানে উত্থান হবে এক মহান সংস্কৃতির, গত কয়েক বছরের অন্ধকারে যা হারিয়ে গিয়েছিল। কল্পনায় প্রত্যক্ষ করা যায় মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত সেখানে রূপায়িত করছেন এক বৈভবশালী ধর্মরাজ্যের স্বপ্নকে।

বর্তমানে অকম্পনের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে সেখানে এক মহাশূন্যের অনুভব বিরাজ করছিল। গত একটা পক্ষকালে রচিত হয়েছে তার আর একটা জন্মের ইতিহাস। তার আগের জীবনটা যেন তার পূর্বজন্ম। জীবনকে চিনে নেওয়ার অভিযানেই সে বেরিয়েছিল। অজানা পথে আনন্দ-বিষাদ, ব্যর্থতা ও বিপদ এসেছে ক্রমান্বয়ে। এসেছে মরণের আহ্বান, কিন্তু অলৌকিক ভাবে বারংবার পুনর্জীবিত হয়েছে পরলোকের দুয়ার থেকে। অবশেষে সমাপ্তিতে এসেছে সাফল্য। কিন্তু একাধিক মৃত্যুর তাণ্ডব এতো নিকট থেকে সে ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করেনি। অকম্পনের নির্বিরোধ স্নায়ুমণ্ডলী তার সহ্যশক্তির সীমানায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। জীবন-মৃত্যুর রক্তাক্ত ক্রীড়াঙ্গনে উৎপন্ন নির্বেদ থেকে এই শূন্যতার অনুভব।

গত দুইদিনে সে অর্জনও করেছে অনেক কিছু। দারুকল্পের উত্তরাধিকার তার এক অমূল্য সঞ্চয়। এই মানুষটি তার প্রাণদাতা, তাকে সে ভুল বুঝেছিল। এখন তাঁর প্রতিটি দুর্বোধ্য কাজের উদ্দেশ্য অনুমান করতে পারে সে। অকম্পন দারুকল্পের আশ্রয়ে আছে, এ সংবাদ কুমার যথাসময়ে পেয়েছিলেন। তারপর রবিস্তোত্রের কাছেও পেয়েছিলেন কুশলসংবাদ। কিন্তু তাকে দুর্গে ফিরিয়ে আনতে তৎপর ছিলেন না, কেননা তিনি জানতেন দুর্গ অপেক্ষা দারুকল্পের তত্ত্বাবধানে অকম্পন বেশি নিরাপদ। কুমারের অনুরোধেই দারুকল্প নিশ্ছিদ্র প্রহরায় তাকে সংরক্ষণ করেছেন। নিমাড়দের রক্ষণশীল পল্লী থেকে পালিয়ে যাওয়াও বিপজ্জনক ছিল, তাই তাও তিনি প্রতিহত করেছেন। যথাসময়ে ভীষণ বিপদের মাঝেও তাকে নিরাপদে কুমারের হাতে প্রত্যর্পণ করেছেন। সব এখন জলের মতো পরিষ্কার অকম্পনের কাছে। শুধু তিনি নিজেকে কেন রক্ষা করলেন না, তা আর জানা গেল না। ধূম্রকূট অগ্নির মাঝে শতবর্ষ প্রাচীন সেই নিশ্চল বজ্রকঠিন অবয়বটি এখনও চক্ষু মুদ্রিত করলেই অকম্পনের সম্মুখে ভেসে ওঠে!

কুমার চন্দ্রগুপ্তের প্রসাদলাভে ধন্য হয়েছে অকম্পন। তার প্রতি তিনি সদয় ছিলেনই, ঘটনাচক্রে তাঁর কৃতজ্ঞতাও সে অর্জন করে নিল।

সবই বিধিনির্বন্ধ, না হলে দত্তসেন যখন সেই পানীয় কুমারকে এগিয়ে দিলেন, তাতে উপস্থিত কেউই সন্দিহান হয়নি। রাজা ভ্রাতার সাফল্যে আনন্দপান পাঠিয়েছেন, এতে সন্দেহ করার কিছুই ছিল না। কুমার সেই পানীয় গ্রহণ করতেই চলেছিলেন।

অকস্মাৎই অকম্পনের মনে পড়ে গেল উড়ালিতে সেই স্বরবাহের নিকট দৈবযোগে পাওয়া বার্তাটি, পথের কাঁটা অপসারণের অস্ত্র আছে পঞ্চকর্ণের কাছে! বার্তা ছিল দত্তসেনের জন্য। পঞ্চকর্ণের সঙ্গে অকম্পন যখন পরিচিত হয়েছিল তখন এই বার্তা সে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিল। কিন্তু তার পেশার পরিচয় সে পেয়েছে। সেই কি তাহলে কাঁটা অপসারণের অস্ত্র? কে সেই কাঁটা? দত্তসেন কেন সেই কাঁটা অপসারণ করতে চায়? এসব প্রশ্নের উত্তর অকম্পন জানে না। কিন্তু তার অন্তরাত্মা সহসা চিৎকার করে তাকে জানিয়েছিল, ও পানীয় কুমারের পান করা চলবে না।

—কুমার, দয়া করে পানীয় আপনি স্পর্শ করবেন না, উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা জানায় অকম্পন, মুক্তাভস্ম আমার সঙ্গেই আছে, আমি ঐ পানীয় পরীক্ষা করে দেখতে চাই!

উপস্থিত সকলেই অকম্পনের এই আচরণে হতবাক হয়ে তার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। ভরা সভায় সে দারুণ অশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছে। তার পরিণাম কী হতে পারে সে কথা আর ভেবে দেখার সময় নেই।

দত্তসেনকে অকম্পন মিলিত হয়েছিল উড়ালির পথে সেই পান্থশালায়। অকম্পনের তা মনে আছে, উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের অকম্পনকে স্মরণে রাখার কথা নয়। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার তার দিকে দেখে দত্তসেন বক্রস্বরে বলল, কে এই অর্বাচীন, কুমারের সমক্ষে অশালীন আচরণের স্পর্ধা দেখায়?

কুমার চন্দ্রগুপ্ত চকিতে একবার অকম্পনকে দেখে নিলেন। তারপর শান্তকণ্ঠে বললেন, আপনি উত্তেজিত হবেন না উপনায়ক, উনি আমার এক মিত্র। উনি একজন বিচক্ষণ রাসায়নিকও বটে।

—কিন্তু আপনার সভায় সে অশালীন আচরণ করবার স্পর্ধা করে কী করে কুমার?

—ওঁর কিছু বক্তব্য থাকতে পারে উপনায়ক। উনি চাইলে পানীয় পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আমি অনুমতি দিলাম।

—অজ্ঞাতকুলশীলের কথায় মহারাজ প্রেরিত বস্তু প্রত্যাখ্যান করবেন কুমার?

—না তা করব না। কিন্তু পানীয়টি পরীক্ষা করে দেখাতে কি আপনার আপত্তি আছে?

—আছে কুমার। মহারাজের স্নেহ-শুভেচ্ছাকে যে তাতে অনাদর করা হয়।

—না, হয় না। পরীক্ষা হবে। আপনি দিন পাত্রটা। চন্দ্রগুপ্তের কণ্ঠস্বর দৃঢ় হল।

দত্তসেনের মুখমণ্ডলে ফুটে উঠল অনেকগুলো ভাবের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। সর্বোপরি অপমানে তাঁর মুখ রক্তাভ হয়ে উঠলো। দন্তঘর্ষণ করে তিনি কোনওমতে বললেন, কুমার, আপনি কি আমাকে অবিশ্বাস করছেন?

কুমার চন্দ্রগুপ্ত প্রস্তরকঠিন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দত্তসেনকে নিরীক্ষণ করলেন। তারপর শীতলস্বরে বললেন, হ্যাঁ।

ক্ষণকালের জন্য নেমে এলো সূচীপতন নিস্তব্ধতা! অকম্পন দুর্বল পদদ্বয়ে থরথর করে কম্পন অনুভব করল। একটা সমীপস্থ বিস্ফোরণের আশঙ্কায় সভাগৃহ যেন নির্বাক হয়ে গেল কয়েক পল।

তারপর বিস্ফোরণই হল। শিষ্টতার মুখোশ খসে গেল, দত্তসেন ক্রোধে আত্মহারা হলেন। কিন্তু শুধু ক্রোধ নয়, ত্রাসসঞ্জাত হাহাকার যেন। উচ্চস্বরে তিনি বলে উঠলেন, বেশ তবে তাই হোক। কারওকে পরীক্ষা করতে হবে না, আমিই প্রমাণ করে দিচ্ছি...

এই বলতে বলতেই তিনি পানীয়টি নিজের গলায় ঢেলে দিয়েছেন। সবটুকু গলাধঃকরণ হবার পূর্বেই পাত্র তাঁর হাত থেকে পড়ে গেল। দুই হাতে নিজের গলা চেপে ধরে দত্তসেন জানুর ভরে বসে পড়লেন। অল্পসময় ছটফট করেই ভূমিশয্যায় নিথর হয়ে গেল তাঁর দেহ।

সভাস্থ সকলে ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। সংবিৎ ফিরে পেতে সকলেই ছুটে এল দত্তসেনের দেহকে ঘিরে। অকম্পনের শরীরে আর শক্তি অবশিষ্ট ছিল না, এক স্তম্ভমূলে বসে পড়ল। তার দুর্বল শরীরে সংজ্ঞাহীনতা নেমে আসছিল। কুমার আদেশ করলেন, প্রহরী, অতি শীঘ্র বৈদ্যকে সংবাদ দাও।

দত্তসেন মৃত্যুবরণ করেছিল তার কর্মফলে। অকম্পন এখন জানে সে না মরলে কুমার আজ জীবিত থাকতেন না। তবু তার বিবেকের দংশন, নরহত্যার নিমিত্ত হতে হল তাকে। তখনও সে জানে না বিধাতা আরও কতখনি নির্দয় হতে চলেছেন।

প্রবল কোলাহলের মাঝে দত্তসেনের মৃতদেহ অপসারিত হল। বৈদ্যের উপচারে অকম্পন একটু সুস্থির হল। দুর্গমধ্যেই কুমারের জীবনহানির প্রচেষ্টা, দাবানলের মতো ইতিমধ্যেই সে সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। ক্ষণকাল পরেই এক প্রতিহারিণী এসে সন্দেশ দিল, মহারানি অবলম্বে কুমারের দর্শনপ্রার্থিনী হয়ে আগমন করেছেন!

কুমার চন্দ্রগুপ্ত গম্ভীর হয়েই ছিলেন, এবার তাঁর ভ্রূকুঞ্চিত হল। তিনি আদেশ দিলেন সকলকে বাইরে যেতে। অকম্পনও চলে যাচ্ছিল, কুমার তাকে বললেন, তোমার সঙ্গে প্রয়োজন আছে অকম্পন। এখানেই একটু প্রতীক্ষা করো।

অকম্পনের সঙ্গে কুমারের প্রয়োজন ব্যক্ত করার আগেই কক্ষে প্রবেশ করলেন মহারানি ধ্রুবাদেবী। আলুলায়িত কেশ, প্রসাধনহীন, বিস্রস্তবাসা। তবুও কক্ষমধ্যে যেন রূপের প্লাবন এল। মহারানি প্রায় ছুটে গিয়ে কুমারের দুই হাত ধরে অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করলেন, কুমার—!

চন্দ্রগুপ্ত কিছুই বললেন না। তাঁর একটা হাত বরবর্ণিনীর কটি বেষ্টন করে দু'জনের ব্যবধান কমিয়ে দিল। হারানো প্রাপ্তির সুখাবেশে আর কিছু মনে রইল না। স্নিগ্ধ দুচোখের অব্যক্ত ভাষায় ফুটে উঠলো চিরকালীন কিছু নিঃশব্দ অঙ্গীকার। আর তার পরের কয়েকটা অমোঘ পল যেন মহাকালের অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ল। মৌননিথর নিশীথিনী পদ্মপত্রে জলের মতো সে মুক্তাবিন্দু ধারণ করে বুঝি কৃতকৃতার্থ হয়ে গেল।

কক্ষে আর কেউ নেই। দ্বিধা ও সংকোচে অকম্পন আড়ষ্ট এক দারুমূর্তিতে পরিণত হয়েছিল। তাকে চমকিত করে কুমার বললেন, যা দেখলে তাই সত্য অকম্পন। কিন্তু একে সঙ্গোপনে রেখো। একদিন এ সকলেই জানবে, কিন্তু এখনই নয়।

তারপর ধ্রুবাদেবীর উদ্দেশ্যে গাঢ়স্বরে বললেন, আজ অকম্পন না থাকলে আর হয়তো আমাদের সাক্ষাৎ হত না রানি।

ধ্রুবাদেবী বামহাতে কুমারের মুখ চাপা দিয়ে অকম্পনের দিকে তাকালেন। মুখে তাঁর দুশ্চিন্তার অম্বুদমুক্ত হাসি, চক্ষে স্নেহঝরা দৃষ্টি। রমণীর ব্রীড়ায় সে দৃষ্টি স্নাত, কিন্তু তাতে অনাবশ্যক অপরাধবোধ কিংবা পশ্চাত্তাপ নেই। এগিয়ে এসে তিনি এবার অকম্পনের হাত ধরলেন।

—আমি কিন্তু তোমার কাছে অপরাধী, অকম্পন। পূর্বপরিচিত সেই বাঁশরীনিন্দিত কণ্ঠস্বরে অকম্পন রোমাঞ্চিত হয়ে শুনল, তুমি আমার কথা রাখতে নিজের জীবন বিপন্ন করেছ। তোমার জীবনের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তগুলি অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছ। আর আজ দেবদূত হয়ে আমার পৃথিবী আবার আমায় ফিরিয়ে দিলে। এ ঋণের বোঝা যে জন্মজন্মান্তরেও শোধ হবে না ভাই।

অকম্পনের সম্মুখে দণ্ডায়মানা মগধের সম্রাজ্ঞী। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে তাঁর দুচোখে নেমেছে ধারা। অকম্পনের অন্তরাত্মা সরবে বলতে চাইছে, অমন করে বোলো না দিদি, আমার যে পাপ হবে। কিন্তু মুখে শুধু বলল, আপনি অপাত্রে আপনার করুণা দান করছেন। আমি অতি নগণ্য, আপনার এই অতুলনীয় স্নেহের যোগ্য নই দেবি।

অকম্পন নতজানু হয়ে বসে পড়ল সম্রাজ্ঞীর সম্মুখে। তার মাথায় হাত রেখে ধ্রুবাদেবী বললেন, তুই আমার গতজন্মের ভাই। তাই এ জন্মে এমন করে প্রতিদান দিলি। কিন্তু আমি নিঃস্ব, তোর যোগ্য পুরস্কার দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। শুধু আশীর্বাদ করি, সর্বত্র জয়ী হ'—।

আর পারলো না অকম্পন। অসহনীয় আবেগ দ্রবীভূত হয়ে তারও দুচোখ প্লাবিত হল। জড়িতস্বরে কোনও মতে বলল, তোমার আশীর্বাদের অসীম শক্তি দেবি। আমি ধন্য হয়েছি দেবি, তোমার স্নেহেই আজ নবজীবন লাভ করলাম।

তার অবস্থা দেখে মহারানি 'ভাই', বলে মুখ ঢাকলেন।

চন্দ্রগুপ্ত স্মিতচক্ষে এতক্ষণ ভাবাবেগের এই প্রবাহ লক্ষ্য করছিলেন। এবার বললেন, রাত্রি অনেক হল। ভাই-বোনে অনেক চোখের জল ফেলেছ। এবার আবেগ সংবরণ করো। মহারানির এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়।

ধ্রুবাদেবী একটু অপ্রতিভ হয়ে অশ্রুমার্জনা করলেন। তারপর বললেন, তুমি জানো না কুমার, মউলির কাছে এই ক'দিন আমি কতখানি অপরাধী হয়ে আছি।

—ওহো! মউলি, মানে তো মধুমল্লিকা। অকম্পন, তোমার স্ত্রীর নাম মধুমল্লিকা, তাই না? কুমার সহাস্যে বললেন, জানো নিশ্চই, মধুমল্লিকা যে রাত্রিতে প্রস্ফুটিত হয়, সেই রাত্রি আলোকিত করে চন্দ্র। তাই মধুমল্লিকার সঙ্গে চন্দ্রের বেশ সম্পর্ক আছে। দেবি, তুমি কি লক্ষ্য করেছ অকম্পনের সঙ্গে তোমার নামের একটা অর্থগত মিল আছে? সে হল তোমার ভাই। সেই যুক্তিতে মউলি আমার বোন হবে না কেন? দেখছ না, আমার আর মউলির নামেও আছে প্রাকৃতিক যোগাযোগ?

—বেশ তো, মহারানি বললেন, মউলি না হয় তোমার বোনই হল।

—সুতরাং জীবনরক্ষার প্রতিদান নাই বা হল, ভগ্নীপতিকে আমার প্রদেয় কিছু তো আছেই, তাই নয় কি? মহারানি, তুমি কি বলো?

মহারানি আনতনয়নে বললেন, অকম্পন আমার ভাই, তার উপযুক্ত কাজ সে করেছে। তাকে আমার অদেয় কিছু নেই। কিন্তু সে আমাদের যা দিয়েছে তার উপযুক্ত পুরস্কার কি কিছু আছে?

—হয়তো নেই। কিন্তু আমি তাকে কিছু দিতে চাই। এখন তোমাকে যে জন্যে ডেকেছি, এবার অকম্পনের উদ্দেশ্যে কুমার বললেন, অকম্পন, তুমি আমার জীবনদান করেছ বলেই নয়। আমাদের কুলের হৃত সম্পদ আজ পুনরুদ্ধার হয়েছে তোমারই জন্য। এই সম্পদে কিন্তু সম্পূর্ণ অধিকার তোমার। আপাতত যে একশত আশি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে, তা আমি তোমায় দান করলাম। স্বীকার করো।

কুমার স্বর্ণমুদ্রার সেই থলিকা অকম্পনের দিকে এগিয়ে দিলেন। অকম্পন একই ভাবে বসেছিল, শূন্যমনে শুনে চলেছিল কুমার ও রানির কথোপকথন। হঠাৎ কুমারের এই প্রস্তাবে যৎপরোনাস্তি হতবুদ্ধি হয়ে গেল। মুখ তুলে দেখে মহারানিও প্রশ্রয়ের হাসি হাসছেন। কিন্তু এই ধন কি সে গ্রহণ করতে পারে? নিঃসীম লজ্জায় অকম্পন কিছু বলতে পারল না, শুধু শিরঃসঞ্চালনে জানিয়ে দিল এ পুরস্কার গ্রহণ করতে সে অক্ষম। দৈবানুগ্রহে মহারাজ সুস্থ হয়েছেন, সে নিমিত্তমাত্র। এই বিপুল ধনরাশি অর্জনের তুল্য যোগ্যতা তার কই?

—দেবি, অকম্পন লজ্জায় নিজের পুরস্কার নিতে চাইছে না। চন্দ্রগুপ্ত সহাস্যে মহারানির প্রতি বললেন, এখন তুমিই তাকে বুঝিয়ে বল, এ পুরস্কার তার প্রাপ্য।

—তুমি ভেবো না। অকম্পন না নিলে কি হয়? আমি ওই দিয়ে মউলির মুখ দেখব।

—ঠিক বলেছ, তাহলে আর তোমার কোনও আপত্তি টিকবে না ভাই...

কুমার আরও কিছু বলতেন, কিন্তু তাঁর কথা শেষ হল না। তার পূর্বেই দ্বারপ্রান্তে যেন বজ্রপাত হল। সেখানে মহারাজ রামগুপ্ত রুদ্রমূর্তিতে এসে দাঁড়িয়েছেন, কঠোরকণ্ঠে কুমারকে সম্বোধন করলেন, চন্দ্র—!

কোনও সংবাদ নয়, বার্তা নয়। প্রতিহারীর কোনও পূর্বঘোষণা নয়। মধ্যরাত্রির নীরবতা ভেদ করে অকস্মাৎ মহারাজ রামগুপ্তের দানবীয় আবির্ভাব। মুখমণ্ডলে তাঁর ভয়াবহ কোনও সংকল্পের দ্যোতনা। কিন্তু কেউ কল্পনা করেনি, কি ভীষণ অভিসন্ধি নিয়ে তাঁর আগমন।

অকম্পনের হাত-পা হিম হয়ে এল। মহারাজ রামগুপ্ত একবার মহারানির দিকে কটাক্ষপাত করে কুমারকে পুনরায় বললেন, কুমার, তুমি রাজাজ্ঞা অবহেলা করেছ। আমার অজ্ঞাতে স্বয়ং যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছ। একবারও আমাকে সংবাদ দেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করনি। কিন্তু এসবই আমি মার্জনা করতাম, যেহেতু তুমি শত্রুবিনাশে সক্ষম হয়েছ।

চন্দ্রগুপ্ত মহারাজকে অভিবাদন জানাতে অগ্রসর হলেন। মহারাজ রামগুপ্ত আরও দু'পা এগিয়ে এসে হ্রস্ব কর্কশ স্বরে বললেন, তুমি মহাবীর হতে পারো বর্বর! কিন্তু জেনে রাখো, আমার কাছে ব্যাভিচারীর কোন ক্ষমা নেই।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই অতর্কিতে রামগুপ্ত তাঁর খঞ্জর চালনা করলেন। সবাই প্রত্যক্ষ করল ত্বরিতে সেই তীক্ষ্ণ অস্ত্র বিদ্ধ হল কুমারের পঞ্জরাস্থির ঠিক নীচে। কেউ পলক ফেলারও সময় পেল না, মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল এই বিভীষিকাময় নাটক।

সময় যেন সহসা থেমে গেল। কুমার চন্দ্রগুপ্তের বিশাল দেহটা শিথিল হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল।

প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলন্ত মহারাজ রামগুপ্তের দৃষ্টি কুমারের ভূপাতিত অবশ দেহটাকে যেন ভস্ম করে দিল। তারপর তিনি মাথা তুললেন, এবার তাঁর দৃষ্টি মহারানির দিকে। কিন্তু তিনি যা দেখলেন, তাতে তাঁর হিংস্র দৃষ্টি রূপান্তরিত হল ত্রাসে।

ধ্রুবাদেবীর রোষকষায়িত নয়নে অশ্রুর ধারা, কিন্তু দুইহাতে উদ্যত ভীষণ এক ভল্ল। মহিষাসুরও বোধহয় অন্তিমকালে দেবীর এই মূর্তি প্রত্যক্ষ করেছিল। আর্ত কণ্ঠে মহারাজ কী বলতে চেয়েছিলেন তা আর জানা গেল না, তার আগেই ধ্রুবাদেবীর ভল্লনিক্ষেপে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে মহারাজ রামগুপ্তের দেহ।

দাস-দাসী, সান্ত্রী-প্রতিহারীর দল ততক্ষণে ছুটে এসেছে। সুতীক্ষ্ণ ভল্লে বিদ্ধ হয়েছে মহারাজ রামগুপ্তের দেহ, দূর থেকে দেখেই অকম্পন বুঝল সে দেহে আর প্রাণ নেই। চরম বিপদের ক্ষণে কোথা থেকে যেন তার শরীরে বল ফিরে এল। দ্রুত গেল কুমারের কাছে, তখনও অল্প প্রাণের লক্ষণ ছিল কুমারের দেহে। অকম্পন আর কয়েকজনের সাহায্যে কুমারকে শয়ন করাল নিকটস্থ এক শয্যাপীঠে।

ওদিকে মহারানিও মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন, গুরুভার ভল্লচালনা স্ত্রীলোকের কাজ নয়। মহারানি তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন প্রিয়তমের প্রাণরক্ষার্থে। দাসীরা তাঁকে তুলে নিয়ে গেল অভ্যন্তরে।

চন্দ্রগুপ্তের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর। অকম্পন পরীক্ষা করে দেখল, কুমারের অন্ত্র একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, অতি আয়াসেও রক্তস্তম্ভন হচ্ছে না। এখন নিপুণ শল্যবিধি প্রয়োগ ব্যতীত কোন পথ নেই। কিন্তু এত কঠিন শল্যচিকিৎসা কি অকম্পন আয়ত্ত করতে পেরেছে? দারুকল্প তাঁকে এই পরীক্ষার কথাই বোধহয় বলেছিলেন। অকম্পন তার এতাবৎ অধীত সমস্ত বিদ্যা স্মরণ করতে চেষ্টা করল। এই সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচারের প্রস্তুতিতেও তো অনেক সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু ব্যতীত করার মত সময় তখন আর ছিল না, ইতিমধ্যেই কুমারের দেহ থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়ে গেছে। জীবন ও মৃত্যুর মাঝের এক অতি সঙ্কীর্ণ অন্তরালে অবস্থান করছিলেন তিনি।

অল্প সময়েই যথাসাধ্য প্রস্তুতি নিল অকম্পন। কুমার সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন, তাই সংবেদ শিরা বিদ্ধ করার প্রয়োজন হল না। জটিল অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয় সকল শস্ত্রাদি অকম্পনের সঙ্গে ছিল না। যা ছিল তার দ্বারাই গুরুস্মরণ করে অকম্পন শল্যক্রিয়া সম্পন্ন করলো। নিজেকে উজাড় করে বারংবার যাচাই করলো, পদ্ধতিতে কোন ত্রুটি না থেকে যায়। সৌভাগ্যক্রমে দ্বিখণ্ডিত পেশি জুড়বার জন্য প্রয়োজনীয় রসায়নটি সঙ্গে ছিল। তাই দিয়ে অতি সন্তর্পণে মাংসপেশি জোড়া দিল। ক্ষতস্থানগুলি বিষক্রিয়ামুক্ত করে স্তম্ভক ও পূতিনাশক ওষধি প্রয়োগ করে পট্টিবন্ধে আচ্ছাদিত করে দিল আঘাতের স্থানগুলি।

এরপর প্রতীক্ষা ভিন্ন আর কোন পন্থা নেই। চিকিৎসকের যা কর্তব্য, অকম্পন তা করেছে, জীবনদান ঈশ্বরানুগ্রহেই সম্ভব। কিন্তু চার দণ্ডকাল অতিবাহিত হলেও কুমারের দেহে প্রাণের লক্ষণ ফিরে এল না।

অকম্পনের অন্তর জুড়ে তখন একমাত্র প্রার্থনা, মহামহারাজ সমুদ্রগুপ্তের মহাপ্রয়াণের পর রাজ্যে যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল, মহারাজ রামগুপ্তের প্রয়াণেই যেন তা সমাপ্ত হয়। কিন্তু নবসুবর্ণযুগের সূচনা যিনি করবেন, তাঁকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। যে সূক্ষ্ম গ্রন্থিতে কুমারের জীবন ও মৃত্যু বাঁধা ছিলো, তা যে কোনো মুহূর্তে ছিন্ন হতে পারে। হে ঈশ্বর, নতুন যুগের যুগন্ধরকে কি তুমি এখনই সরিয়ে নেবে? হে বিধাতা, ভারতের ভাগ্যাকাশে নতুন সূর্যোদয়ের কি এখনও সময় হয়নি? সুমহান গুপ্তবংশের কি এই পরিণতি? হে

মহাকাল, এত নিষ্ঠুর তুমি হয়ো না।

নিরবিচ্ছিন্নভাবে অকম্পন কুমারের নাড়ি পরীক্ষা করে চলেছিল। একটি ক্ষীণ স্পন্দনের পর যেন অনাদিকালের প্রতীক্ষা পরবর্তী ক্ষীণতম স্পন্দনটির! এভাবে কতক্ষণ কেটেছিল, কে জানে। তখন ভোরের আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে, পক্ষীকুলের কলকূজন শুরু হয়ে গেছে। হঠাৎ অকম্পন যেন পেল বিধাতাপুরুষের অমোঘ আশ্বাসবাণী। কুমারের নাড়ির স্পন্দন দ্রুততর হল। অকম্পন বারবার পরীক্ষা করে দেখল। না, কোনও ভুল নেই, কুমারের হৃদস্পন্দনে ফিরে এসেছে নবজীবনের অভ্রান্ত ইঙ্গিত। তার সাধনা ব্যর্থ হয়নি। সে শূন্যহাতে যমদূতকে ফিরিয়ে দিতে সফল হয়েছে।

আনন্দের উচ্ছ্বাস অকম্পনের কণ্ঠে নির্গত হল। সমীপস্থ পরিচারককে বলল, আশা করি কুমার বিপন্মুক্ত হয়েছেন, শিগগির মহারানিকে খবর দাও।

পরিচারকটিও বোধহয় সারারাত এই কথাটি শোনবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, তৎক্ষণাৎ অন্দরমহলে ছুটে গেল। দেখতে দেখতে প্রধান সেনাপতি সহ বহু লোকে কক্ষপূর্ণ হয়ে গেল।

অল্প পরেই কুমার ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করলেন। শরীরে তাঁর যন্ত্রণার অবসান হয়নি, তবু মুখে আনলেন বীরোচিত স্মিত হাসি। অতি আয়াসে দক্ষিণহস্ত তুলে ইশারা করলেন সেনাপতির উদ্দেশ্যে। সেনাপতি উচ্ছসিত হয়ে ঘোষণা করলেন, মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত দীর্ঘজীবী হোন। উপস্থিত প্রজাবর্গ জয়ধ্বনি দিল। সেনাপতি অল্প এগিয়ে এসে রাজকীয় শিষ্টাচারে মস্তক নত করে বললেন, অধীনের ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন, মহারাজ। আপনার আদেশ ব্যতীত আমাকে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। নতুন মহারাজপদে আপনার নির্বাচন প্রক্রিয়া আমরা সম্পন্ন করেছি, কেননা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাকে এই শোকসংবাদ জ্ঞাপন করতে হচ্ছে—মহারাজ রামগুপ্ত পরলোকগত।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ঈষৎ ভ্রুকুঞ্চন করলেন, তারপর স্মিতচক্ষে সেনাপতিকে সম্মতি জানালেন। নিয়তির নির্দেশ তিনি হয়তো পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন। সেনাপতি আবার বললেন, প্রধান রাজ-পুরোহিত এখানে উপস্থিত না থাকায়, উপ-পুরোহিত আচার্য শ্রীধরকে আমি সঙ্গে নিয়েই এসেছি। আপাতত তাঁকেই বিধিমতে উচিতকর্ম সম্পাদন করতে অনুরোধ করি।

আচার্য শ্রীধর এগিয়ে এসে বললেন, এই বিপরীত পরিস্থিতিতেও মহারাজের অভিষেকের দায়িত্ব পেয়ে আমি ধন্য। বিধিপূর্বক অভিষেক তো রাজধানীতে ফিরেই সম্ভব। তবে যেহেতু রাজ-সিংহাসন শূন্য থাকা উচিত নয়, তাই এই মুহূর্তেই আমি আপনাকে রাজ্যের পরবর্তী মহারাজপদে অভিষিক্ত করছি। মহারাজের জয় হোক।

অতঃপর তিনি মহারাজের স্বস্তিবাচন করলেন। প্রত্যূষের সূর্যকিরণ তখন আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। পবিত্র সেই উষালগ্নে আরতি ও মন্ত্রাদির দ্বারা কুমারের সংক্ষিপ্ত অভিষেক সম্পন্ন হল। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ধ্রুবাদেবী প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়েই ছিলেন। অভিষেককর্ম সম্পন্ন হলে, তিনি ছুটে এলেন কক্ষে। নাটকীয় ঘটনাবলীর মধ্যে মিলন হল দুটি অধীর হৃদয়ের।

ভারতের ইতিহাস বোধহয় বহুকাল অপেক্ষা করে ছিল এই মুহূর্তটির জন্য।

ক থা ব শে ষ

অলিন্দের একপাশের দেওয়ালে বৃক্ষলতার ফাঁক দিয়ে আগত সুপ্রভাতের রৌদ্রে অঙ্কিত হচ্ছিল নানা মায়াময় নকশা। দুর্গতোরণ সজ্জিত হচ্ছে পুষ্পমাল্যে। নহবতে বাজছে পূরবীর সুর। স্নানাদি সেরে ভরপুর প্রাতরাশ করেছে অকম্পন। তখনও তার শরীরে রাতজাগার অবসাদ, মন যদিও পরিপূর্ণ সাফল্যের সুবাসে।

একটা কবুতর ডানা ঝটপট করে অকম্পনের পাশেই এসে বসল। তার কাঁধেই বসতে চাইছিল যেন, চকিতে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ায় অলিন্দের পট্টে বসে অকম্পনের উপর-নীচে দৃষ্টি বোলাতে লাগলো।

আর কী আশ্চর্য! কবুতরের পায়ে ছোট্ট এক পটকখণ্ড! হয়তো কোনও রাজকীয় বার্তা। কিন্তু তার কাছেই যখন এসেছে, অকম্পন ভাবল এতে তার অধিকার। কবুতরের পা থেকে ধীরে খুলে নিল বার্তা। তৎক্ষণাৎ সে পাখি উড়ে গেল।

পত্র বেশ কিছুদিনের পুরনো। রৌদ্র-জলে শুষ্ক-সিক্ত হয়েছে। কিন্তু সন্দেশ পড়ে অকম্পন থরথর করে কম্পিত হল। এ কি মউলির বার্তাই

এল!

এও সত্য হল। মউলিরই বার্তা! প্রথমেই লেখা আছে সে কথা। বালিকার প্রণয়ানুভূতিতে অনেক উচ্ছ্বাস জানিয়ে অন্তে সে লিখেছে, প্রিয়তম, তোমার পরশের সেই ক্ষণটুকুই আমার সম্বল। আবার দেখা হলে ক্ষণস্থায়ী এই পল যেন আর সমাপ্ত না হয়। তোমারই চরণাশ্রিতা, মধুমল্লিকা।

কোথায় মউলি, কোথায় তুমি? বিস্মৃত বিরহের ব্যথা এবার কাঁটার মতো এসে বিঁধল অকম্পনকে। যেন এক অদৃশ্য শিল্পী এস্রাজের ছড় টেনে তুলল হৃদয়মোক্ষণ করা মীড়। বুকের কাছে বোধ হচ্ছে একটা বিরাট শূন্যতা, কী যেন রয়ে গেল না পাওয়া?

বিধাতার এ কী নির্মম পরিহাস! যাকে অন্তরাত্মা এতোদিন জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে অনুসন্ধান করেও পায়নি, অকস্মাৎ তারই বার্তা কোন মহাশূন্য থেকে রচনা হল? বারংবার সে পত্রাংশ স্পর্শ করে দেখছিল অকম্পন, একি দৈব, একি বাস্তব না শুধুই কল্পনা?

প্রতিহারী এসে জানাল, মহারাজ সুস্থ হয়েছেন, অকম্পনকে অন্দরে আসতে আজ্ঞা করেছেন। আপন ভাবাবেগ দমন করে উদগ্রীব অকম্পন ত্বরিতে মহারাজের কক্ষে প্রবেশ করল।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তখনও শয্যায় শয়ান, কিন্তু অনেকটা স্বচ্ছন্দ। ওষধিযুক্ত চিনাংশুকে বাঁধা তাঁর বক্ষঃস্থলের নিম্নভাগ। আর কেউ সেখানে ছিলো না। অকম্পন সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। কিন্তু মহারাজের কথায় তার সংকোচ অনেকটা কেটে গেল, তুমি আমায় আর একবার জীবনদান করেছো, অকম্পন। ঋণ শোধ হয়ে গেল, কী বল?

অকম্পন সসংকোচে বলল, এ কি বলছেন মহারাজ? এ আমার বহুজন্মের সুকৃতি, আপনাকে আমরা ফিরে পেয়েছি। আপনার আঘাত সত্যিই মারাত্মক ছিল।

—ভবিষ্যতে এমন আরও অনেক আঘাতে আমাকে রক্ষা করার ভার তাহলে তুমিই নাও অকম্পন। বৈদ্যরাজ প্রভাকর অনেকদিন যাবৎ অবসরের জন্য অনুরোধ করছেন। এবার তুমিই তাঁকে দায়মুক্ত করো।

মহারাজ অকম্পনকে রাজবৈদ্য হবার প্রস্তাব করছেন। এ সৌভাগ্য অকম্পনের অকল্পনীয়। স্খলিতস্বরে বলে, আমি কি এই সম্মানের উপযুক্ত? মানে আমার যোগ্যতা...

—আমি অযোগ্য লোককে এ পদে স্বীকার করি না অকম্পন। তোমার যোগ্যতার বিচার হয়ে গেছে। তুমি শুধু এই পদ স্বীকার করো।

—আমি কৃতার্থ মহারাজ। আমার অকিঞ্চিৎকর অস্তিত্ব আজ ধন্য হয়ে গেল।

মহারাজ আবার প্রশ্ন করলেন, তুমি খুশি তো অকম্পন?

অকম্পনের জীবনপাত্র আজ কানায় কানায় ভরা। পূর্ণং, পূর্ণমিদং, পূর্ণমাদায়...সে পূর্ণপাত্র সে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু কই, তা এখনও তার অধরা মনে হয় কেন?

অকম্পন নীরবে মাথা হেলিয়ে সম্মতি দিল। মুখে না বললেও তার অন্তরের কথা বোধহয় মহারাজের কাছে গোপন রইল না। তিনি বললেন, গত এক পক্ষকালের নির্যাতনের স্মৃতি তুমি এত সহজে ভুলতে পারবে না জানি। আমার ইচ্ছা থাকলেও তোমার সে কৃত কর্মের ভোগ ফিরিয়ে নিতে পারব না। কিন্তু এসবের মাঝে তুমি আরও যে বস্তু হারিয়েছ, আমি সেটা অন্তত তোমাকে আজ ফিরিয়ে দিতে চাই।

মহারাজ অর্থপূর্ণ হাসলেন। অকম্পন কিছুই বুঝতে পারল না। মহারাজ আবার বললেন, বিয়ের পরে আর তুমি মউলিকে দেখোনি, তাই না অকম্পন?

মউলির নাম শুনে অকম্পন চমকিত হল। দুরুদুরু বক্ষে শুনল মহারাজ তাকে জিজ্ঞেস করছেন, মউলিকে দেখতে চাও?

অকম্পনের বক্ষে দামামার শব্দ। পায়ের নীচের ভূমিতে কম্পন! এ প্রশ্নের কি নেতিবাচক উত্তর হয়? কিন্তু লজ্জায় কোন কথা বলতে পারল না। আর এমন অসম্ভব উক্তি করে মহারাজ অকম্পনের ধৈর্যের পরীক্ষাই বা কেন নিচ্ছেন? নাকি তিনি রসিকতা করছেন?

অকম্পনের মুখে অবিশ্বাসের চিহ্ন প্রকাশ পেয়ে থাকবে, মহারাজ বললেন, আমি আমার বোনকে জাদুমন্ত্রে এই দুর্গে উপস্থিত করতে পারি, তা কি জানো?

অকম্পনের হৃদয় দুলে উঠলো, এও কি সম্ভব? কিন্তু স্বয়ং মহারাজ বলছেন, এতটা নিষ্ঠুর রসিকতা তিনি করবেন? অকম্পনের মুখভাবে বোধহয় মহারাজের করুণা হল, এবার তিনি হেসে বললেন, অকম্পন, মউলি উপরেই আছে। খুঁজে নিতে পারবে কি?

অকম্পন পাতালপ্রবেশ করেও মউলিকে খুঁজে নিতে পারে, আর মাত্র একটি তল উপরে? সে অস্ফুটস্বরে সম্মতি জানাল, পারব মহারাজ।

মহারাজ হাতের ইঙ্গিতে আজ্ঞা দিলেন। অভিবাদন করে দ্বারের দিকে ফিরল অকম্পন। মন চাইছিল ছুটে যেতে, কিন্তু যেতে পারল না। মহারাজের সমক্ষে তা যে প্রগলভতা হত।

দ্বারের বাইরে এসে পিছন থেকে পুনরায় মহারাজের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো অকম্পন, তোমাদের আলাপ শেষ হলে মউলিকে বোলো কিন্তু, তার দাদা তার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছে।

—বলব, মহারাজ।

একটু থেমে অকম্পন একবার দেখে নিলো, দ্বিতলে যাবার পথ কোন দিকে। এদিকওদিক তাকিয়ে দেখে দূরে সোপানের পাশে রঙ্গিণী তাকে হাতের ইশারায় উপরে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে। নিকটে যেতেই কিন্তু হাত প্রসারিত করে অকম্পনের পথ অবরোধ করলো রঙ্গিণী। কপট গাম্ভীর্যে বলল, মন্ত্রকূট বল ঠাকুর। না হলে তো যেতে দেবো না।

রঙ্গিণীর অধরোষ্ঠে গূঢ় হাসির রেখা। অকম্পনও কৃত্রিম অসহায়তায় বলল, মন্ত্রকূট? তা তো জানি না রঙ্গিণি!

—সেকি ঠাকুর? তোমাকে যে শিখিয়েছিলাম? ভুলে গেলে?

—মনে পড়েছে রঙ্গিণি। বরেণ্যম্। কিন্তু সে তো তুমি।

কলহাস্যে গড়িয়ে পড়ে রঙ্গিণী। তারপর বলে, হয়েছে হয়েছে। আর বলতে হবে না ঠাকুর। সোজা এই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে যাও। খোলা ছাদের শেষে একটা ঘর আছে। সেখানেই...চোখের একটা ইঙ্গিতপূর্ণ ইশারা করে রঙ্গিণী বলল, আর কেউ নেই ওখানে। আমি সবাইকে সরিয়ে দিয়েছি।

—তদ্বরেণ্যম্। তুমি সত্যিই বরেণ্যম্ রঙ্গিণি।

—বেশি সময় নেই কিন্তু। মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা হচ্ছে।

—আমার ভোজনের স্পৃহা নেই রঙ্গিণি। কিন্তু বড় তৃষ্ণা।

—ও মা!—সুবর্তুল চক্ষু রঙ্গিণী মুখব্যাদান করে গালে হাত দিল। তারপর উচ্চহাসি আর চাপতে পারল না। রঙ্গিণীর দিকে এক ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি হেনে আর কালক্ষেপ করল না অকম্পন, দ্রুত সোপানশ্রেণির দিকে অগ্রসর হল।

চোখের সম্মুখে তখন তার অজস্র শেফালির মেলা।

শিল্পীঃ কুনাল বর্মণ